মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

১

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

১ম খণ্ড

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ

অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুল আযীয

সম্পাদনা ঃ অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ১৫৮

২য় প্রকাশ

রবিউস সানি	১৪২২
আষাঢ়	১৪০৮
জুলাই	২০০১

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

مولانا مودودی پر اعتراضات کا علمی جائزہ -এর বাংলা অনুবাদ

MAOLAMA MAUDUDIR BIRODDH OVEJOGAR TATTIK PORJALOCHONA by Maolana Mofti Mohammad Yousuf. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Net Price : Taka 100.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের কথা

কুরআন সুন্নাহে চিন্তা তথা ফিক্‌র ও তাফাককুরের প্রতি মুসলমানদের বিশেষভাবে তাকীদ করা হয়েছে তাই তো দেখা যায়, সর্বযুগেই মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী চিন্তাবিদদের আবির্ভাব ঘটেছে। বিশেষভাবে, প্রাথমিক হিজরী শতাব্দীগুলো ছিলো মুসলমানদের চিন্তা-গবেষণার সোনালী যুগ।

কুরআন-হাদীসকে ভিত্তি করেই সর্বযুগে চিন্তা-গবেষণা হয়েছে। সকল মুসলিম মুজতাহিদ ও চিন্তাবিদদেরই চিন্তা-গবেষণার মূল উৎস ছিলো কুরআন ও সুন্নাহ্। এ দু'টোর ভিত্তিতেই তাঁরা চিন্তা-গবেষণা করে খুটিনাটি বিষয়সমূহ এবং সমকালীন সমস্যাবলীর সমাধান দিয়েছেন।

কিন্তু দেখা গেছে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের যুগ থেকেই খুটিনাটি ও প্রাসংগিক বিষয়ের চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে আসছে। মতপার্থক্য বুনিয়াদী বিষয়ে হয়নি, হয়েছে প্রাসংগিক বিষয়ে। মতপার্থক্যের কারণে এসব খুটিনাটি বিষয়ে আমলের পার্থক্যও হয়ে আসছে সেই প্রাথমিক যুগ থেকেই।

কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণ কখনো এসব মতপার্থক্যের জন্যে কাদা ছোড়াছোড়ি করেননি। তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে বেড়াননি। বরং ইজতিহাদী মতপার্থক্যকে তাঁরা সবসময়ই কল্যাণকর (রহমত) হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ইদানিংকালে মুসলমানদের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতা হ্রাস পেয়েছে। বিগত কয়েক শতাব্দী চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে তাদের পিছিয়ে থাকাই এর মূল কারণ।

কুরআন সুন্নাহর আলোকে যুগ সমস্যার সমাধান পেশ করেছেন বর্তমান বিশ্বের সেরা ইসলামী চিন্তা নায়ক মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এ মহান কাজ করতে গিয়ে কারো কারো সাথে তাঁর মতের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এসব মতপার্থক্য নেহাতই খুটিনাটি ও প্রাসংগিক বিষয়ে। যেমনটি হয়েছিলো অতীতের বুযুর্গদের মধ্যে।

এসব মতপার্থক্যের কারণে কিছু লোক তাঁর বিরোধিতা করেছেন। কারো কারো বিরোধিতার ধরণ আবার চরম আকারে। মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের এ গ্রন্থটি থেকে বুঝা যাবে, এসব বিরোধিতার ধরণ কি?

www.pathagar.com

তাই যারা বিরোধিতার জন্যে বিরোধিতা করেন না, বরঞ্চ ইসলামের কল্যাণই তাদের কাম্য—এমন সব শিক্ষিত সমাজকে গ্রন্থটি মনযোগের সাথে অধ্যয়ন করার আবেদন রইলো। আশা করি এর ফলে তাঁরা একটা সঠিক মত প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা।
তারিখ ঃ ৮/১২/৯০ইং

www.pathagar.com

সূচীপত্র

লেখকের আরজ ১৭
আমার ঈমানী আকীদা ১৭
মৌলিক ব্যাপারে আমার মত ও পথ ১৭
ছোট খাট বিষয়ে আমার মত ও পথ ১৮
আমি একজন দেওবন্দীও বটে ১৮
জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার পরিচয় ১৯
আন্তরিক শান্তি মানসিক প্রশান্তি ২০
জামায়াতের বিরুদ্ধে দেওবন্দের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ফতওয়া ২০
অভিযোগসমূহের পর্যালোচনা ২১
অভিযোগসমূহের পর্যালোচনা কেন করা হলো ? ২১
আমি আমার শায়খদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করি না ২২
আমি সীমাতিরিক্ত মহব্বতের পক্ষপাতি নই, মহব্বতে সীমাতিক্রম করারও আমি সমর্থক নই ২৩
জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার সম্পর্ক এবং তার স্বরূপ ২৩
মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ওপর আরোপিত অভিযোগসমূহে জ্ঞানগত পর্যালোচনা প্রকাশনার উদ্দেশ্য ২৪
অভিযোগসমূহ সম্পর্কে একটি জরুরী ব্যাখ্যা ২৬
উলামায়ে কিরামের প্রতি আমার আবেদন ২৭
ওহুদের যুদ্ধ ২৭
একক প্রচেষ্টা ২৮
সর্বশেষ আবেদন ২৮

আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নীতিমালার ভূমিকা ৩১
প্রথম নীতি ঃ হেদায়াত ও গোমরাহীর মাপকাঠি ৩১
দ্বিতীয় নীতি ঃ জমহুরদের বিরোধী হওয়া ৩১
তৃতীয় নীতি ঃ দলীলের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান ৩২
চতুর্থ নীতি ঃ অস্পষ্টকে স্পষ্টকরণ ৩২
পঞ্চম নীতি ঃ যে বিষয়ে ইজতিহাদ ছাড়া কোনো নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা ৩২
ভূমিকা ৩৫
মতপার্থক্যের সীমা ৩৬

www.pathagar.com

সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর মতভেদ ৩৭

প্রথম অধ্যায়

নবী আলাইহিস সালাম মাসুম বা নিষ্পাপ হওয়া ৩৯

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ৩৯

নিষ্পাপ হওয়া দু' প্রকার ৪০

গোনাহ্ থেকে নিষ্পাপ হওয়া ৪০

মিথ্যা ও কুফর থেকে পবিত্র থাকা ৪০

ইচ্ছাপূর্বক সমস্ত কবীরা গোনাহ্ করা থেকে পবিত্র ৪০

নবীগণ ভুলক্রমে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে পবিত্র ৪১

সগীরা বা ছোট ছোট গোনাহ্ থেকে পবিত্র হওয়া ৪২

উপরোল্লেখিত বাক্যের সারমর্ম ৪৩

পদস্খলন থেকে পবিত্র থাকা ৪৪

উসূলবিদদের ব্যাখ্যাসমূহ ৪৫

ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে 'যাল্লাত' শব্দের প্রয়োগ ৪৬

'যাল্লাত' বা ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি সগীরাহ্ গোনাহের অন্তর্ভুক্ত কিনা ? ৪৭

সদরুশ শরীয়াও কি আহলে সুন্নাত দলের বহির্ভূত ? ৪৮

মোদ্দাকথা ৫০

উপরোল্লেখিত আলোচনার সারমর্ম ৫০

তাফহীমাতের বাক্য ৫১

বাক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ৫২

পর্যালোচনা ৫২

পর্যালোচনা ৫৩

কুরআন ও হাদীসের পথনির্দেশনা ৫৩

দলীল ৫৪

পর্যালোচনা ৫৫

একটি অভিযোগ ও তার জবাব ৫৬

পর্যালোচনা ৫৮

হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সমালোচনা ৫৯

বিভিন্ন অংশে ভাগ ৫৯

মতপার্থক্যের কারণসমূহ ৬২

আপত্তি ৬৪

জবাব ৬৫

প্রথম উদাহরণ ৬৬

দ্বিতীয় উদাহরণ ৬৬

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অংশের পর্যালোচনা ৬৯
তৃতীয় অংশের পর্যালোচনা ৭১

দ্বিতীয় অধ্যায়
হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা ৭২
তাফহীমুল কুরআনের বাক্য ৭২
আপত্তির সারমর্ম ৭৩
নবুয়াতের মান ও রিসালাতের মর্যাদা সম্পর্কে মাওলানা
মওদূদীর উচ্চ ধ্যাণ-ধারণা ৭৪
মাওলানার দৃষ্টিতে নবুয়াতের তাৎপর্য ৭৬
নবীদের অসাধারণ যোগ্যতা ও পবিত্র প্রকৃতি ৭৭
নবীদের ওপর আল্লাহর বিশেষ দৃষ্টি ৭৭
নবুয়াত নবীর মানবীয় সত্তার অমূল্য সম্পদ তার ব্যক্তি সত্তার
সাথে সংযুক্ত নয় ৭৮
নবীদের ইজতিহাদী পদস্খলন এবং তার বিশ্লেষণ ৭৯
আগে অগ্রসর হয়ে তিনি আরো লিখেছেন ৭৯
উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের সারমর্ম ৮০
অভিযোগের জবাব ৮২
প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে দু'টি স্বীকৃত কথা ৮৬
ইমাম বাগাবী এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় তাফসীরকারদের ব্যাখ্যা ৮৭
হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের রাগ হওয়ার প্রথম ব্যাখ্যা ৮৮
'কওমের ওপর রাগ করার জন্যে' এ কারণটি যুক্তিসংগত নয় ৮৯
দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এবং রাগ হওয়ার কারণ ৮৯
তৃতীয় ব্যাখ্যা ৯০
তাফসীরের ইমামদের তিনটি ব্যাখ্যার সারমর্ম ৯১
রাগের কারণ ৯১
হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের চলে যাওয়া কি আল্লাহর
নির্দেশ মুতাবেক ছিলো ? ৯৫
উপরোক্ত আলোচনার ফলাফল ৯৭
মাওলানা কাযী মাযহার হুসাইন সাহেব এবং অন্যান্য
অভিযোগকারীদের কাছে একটি প্রশ্ন ৯৯
এটাই কি ইনসাফ ভিত্তিক দাবী ১০১
নবীর অসতর্ক হওয়া অপরাধ ও গোনাহ নয় ১০১

www.pathagar.com

আল্লামা আলুসী এবং ইমাম মুজাহিদও কি ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী ? ১০২
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ১০৩
প্রথম জবাব ১০৫
দ্বিতীয় জবাব ১০৬
তৃতীয় জবাব ১০৮
নবীদের যথাযোগ্য মর্যাদা ১১২
হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ১১৩
উল্লেখিত রেওয়াতেসমূহের সারমর্ম ১১৪
আপত্তির শেষাংশ ও তার জবাব ১১৬
দলীল সম্পূর্ণ করার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১১৭
দুনিয়ার আযাবের জন্যে একটি আইনানুগ শর্ত ১১৮
নূহ আলাইহিস সালামের কওমের উপর আযাব ১১৮
মিসরের ফেরাউনের ওপর আযাব ১১৯
লূতের কওমের ওপর আযাব ১২১

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সশরীরে উর্ধাকাশে উঠিয়ে নেয়া এবং এ বিষয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা ১২৫
তাফহীমুল কুরআনের বাক্য ১২৭
একটি ধারণার অপনোদন ১২৯
কাদিয়ানীদের প্রশ্ন ও তার জবাব ১৩৩
সশরীরে উত্থানের তাৎপর্য ও তার শরয়ী মর্যাদা ১৩৪
একটি জরুরী ব্যাখ্যা ১৩৫
সশরীরে উত্থান বিষয়ের অংশসমূহ ১৩৬
কুরআনে যেসব অংশের স্পষ্ট উল্লেখ আছে ১৩৭
কুরআনে যেসব অংশের স্পষ্ট উল্লেখ নেই ১৩৮
দ্বিতীয় অভিযোগের জবাব ১৩৮
উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম ১৪১
প্রথম দলীল ১৪১
দ্বিতীয় দলীল ১৪২
তৃতীয় দলীল ১৪২

www.pathagar.com

চতুর্থ দলীল ১৪২
তাফহীম লেখকের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ১৪৩
চতুর্থ অধ্যায়
সমালোচনা এবং সত্যের মাপকাঠি ১৪৫
বিতর্কিত বিষয় ঃ সাহাবীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত না ব্যক্তিগত উক্তিসমূহ ১৪৬
'তান্‌কীদ' শব্দের অর্থ ১৪৬
তান্‌কীদ-এর শরয়ী মর্যাদা ১৪৮
কুরআনের দৃষ্টিতে তানকীদ ১৫০
সর্বাবস্থায় রসূলদের অনুসরণ অপরিহার্য ১৫২
উম্মতের স্থান ১৫২
কুরআন ও হাদীস একমাত্র মানদণ্ড হওয়ার প্রথম দলীল ১৫৩
দ্বিতীয় দলীল ১৫৫
হাদীসের দৃষ্টিতে তানকীদ করা ১৫৬
মিরাসের ব্যাপারে হযরত আবু মূসার উপর তানকীদ ১৫৭
হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু কর্তৃক
হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তানকীদ ১৬০
হযরত সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ঘটনা ১৬১
কিনতারের মাসয়ালা ১৬৩
পায়খানা-পেশাব করার সময় কিবলামুখী হওয়ার প্রসংগ ১৬৫
উভয় সাহাবীদের মতের ওপর হানাফীদের তানকীদ ১৬৭
জুমাআ ও ঈদ একত্রিত হওয়া ১৬৭
এ মত কি তানকীদের উর্ধে ১৬৯
দু' ঈদ একত্রিত হওয়া অবস্থায় ইমাম শাফেয়ীর অভিমত ১৭১
মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রায় ১৭৩
এটা কি সাহাবীদের ওপর তানকীদ করা নয় ১৭৫
তানকীদ করার জন্যে সমতার শর্ত দুর্বল অভিমত ১৭৬
দুর্বলতার কারণসমূহ ১৭৬
তানকীদ প্রসংগে আরো ব্যাখ্যা ১৮০
আহকাম ১৮১
সাহাবাদের তাকলীদ প্রসংগ ১৮৪
সাহাবাদের কথা ও উক্তির প্রকারভেদ ১৮৪
মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব ১৮৬
হাম্বলী ও মালেকী মাযহাবের দলীলসমূহ ১৮৭
ইমাম শাফেয়ী রহামাতুল্লাহ আলাইহির অভিমত ১৯২

www.pathagar.com

ইমাম শাওকানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রায় ১৯৬
হানাফীদের অভিমত ১৯৭
ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মাযহাব ২০২
হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানী
রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ব্যাখ্যা ২০৪
আরো কতিপয় ইমামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ২০৯
ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ব্যাখ্যা ২১১
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ব্যাখ্যা ২১১
শায়খ ইবনে হুমামের ব্যাখ্যা ২১২
তানকীদ প্রসংগের সারমর্ম ২১২
মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ব্যাখ্যা ২১৬
মাওলানা আমীন আহসান ইসলামীর ব্যাখ্যা ২১৭
সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড হওয়ার অর্থ কি ২২৫

পঞ্চম অধ্যায়

দাজ্জাল সম্পর্কিত প্রশ্ন ২২৭
দাজ্জাল শব্দের অর্থ ২২৭
দাজ্জালের অস্তিত্ব ও পরিচয় চিহ্ন ২২৮
দাজ্জালের স্বাতন্ত্র ২৩৪
ইবনে সাইয়াদ ২৩৬
দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তি ২৩৮
রেওয়ায়েতে মতবিরোধিতার পরিণতি ২৩৯
মুহাদ্দিসগণের অভিমত ২৪০
মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যাসমূহ ২৪১
দাজ্জালে আকবার মানুষ নয় বরং একটি শয়তান ২৪৫
আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী
রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দৃষ্টিভংগী ২৪৬
উপরোল্লেখিত তিনটি মতের ব্যাখ্যা ২৪৭
সর্বাধিক সহীহ রেওয়াতসমূহের অবস্থা ২৪৯
দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আরো একটি অভিমত ২৫০
একটি জটিলতা ও তার সমাধান ২৫৩
দাজ্জালের আবির্ভাবের স্থান ও কাল ২৬০
বিগত আলোচনার সারমর্ম ২৬৩
মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতবাদ ২৬৪

www.pathagar.com

কাজী মাজহার হুসাইন সাহেবের প্রথম আপত্তি ২৭১
ব্যাখ্যা ২৭২
দ্বিতীয় আপত্তি ২৭৫
পর্যালোচনা ২৭৫
তৃতীয় অভিযোগ ২৭৬
চতুর্থ অভিযোগ ২৭৬
পর্যালোচনা ২৭৭
পঞ্চম আপত্তি ও তার জবাব ২৮০

পরিশিষ্ট-১

অভিযোগ ও জবাব স্পর্কীয় ২৮৩
প্রথম অংশের বিশ্লেষণ ২৮৪
জবাব ২৮৪
কুরআনের তাফসীরসমূহ ২৮৫
হাদীস গ্রন্থ ও তার শরাহ ২৮৬
প্রথম উদাহরণ ঃ তাফসীরুল মানার ২৮৭
দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ ফয়যুল বারী ২৮৮
তৃতীয় উদাহরণ ঃ আল আরাফিশ শাজি ২৮৯
একটি অবরোহমূলক সমাধান ২৮৯
ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অংশ ২৯১
জবাব ২৯১
গ্রন্থখানার সঠিক মর্যাদা ২৯১
ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানের মান-মর্যাদার হিফাযত ২৯২
ত্রুটি অনুসন্ধান করার অভিযোগের জবাব ২৯৪
এক ঃ অস্বীকৃতিমূলক জবাব ২৯৪
দুই ঃ স্বীকৃতিমূলক জবাব ২৯৭
ব্যাখ্যার তৃতীয় অংশ ২৯৮
ব্যাখ্যা ২৯৮
জবাব ২৯৯
পাল্টা অভিযোগমূলক জবাব ৩০০
বিশ্লেষণমূলক জবাব ৩০২
ইসমত রহিত করার প্রয়োজনীয়তা ৩০৩
দ্বিতীয় দলীল ৩০৪
তৃতীয় দলীল ৩০৫

www.pathagar.com

উল্লেখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বুনিয়াদ ৩০৬
সর্বশেষ বিষয় ও তার জবাব ৩০৭
প্রথম জবাব ৩০৮
দ্বিতীয় জবাব ৩০৯
শাফায়াতে কুবরার হাদীস ৩১০
পরিশিষ্ট-২
আপত্তি ও জবাবসমূহ প্রসংগ ৩১১
প্রশ্ন ৩১২
জবাব ৩১২
মুহতারাম মাওলানাকে অপর একটি প্রশ্ন করা হয়েছিলো ৩১৪
প্রশ্ন ৩১৪
জবাব ৩১৫

www.pathagar.com

লেখকের আরজ

আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের উপর দরূদের পর ঃ

আজ থেকে ১৬ বছর আগে আমি সোয়াত রাজ্যের বিচার বিভাগের একজন কর্মচারী হিসেবে সম্পৃক্ত ছিলাম, বুনীর এলাকায় অবস্থিত আমার পৈত্রিক গ্রাম (বাচাকটাহ্) তহশীলের হেড কোয়ার্টার। এলাকার লোকজন বিচারের আশায় এক সরকারী অফিসারের (তহশীলদার) স্মরণাপন্ন হয়। বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে আমিও সেখানে প্রায় তিন বছর পর্যন্ত বিচার সংক্রান্ত কর্তব্য সম্পাদন করেছি। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠার দরুন আমাকে বিচার বিভাগ থেকে বরখাস্ত করা হয়।

আমার ঈমানী আকীদা

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَانَبِىَّ بَعْدَهٗ ـ

এ আকীদার মধ্যে ঈমানিয়াতের যেসব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সেগুলোর প্রতি আমার অটল বিশ্বাস আছে এবং আমার বিবেক-বুদ্ধি সেগুলোর সত্যতার স্বাক্ষ্য দিচ্ছে।

মৌলিক ব্যাপারে আমার মত ও পথ

মৌলিক বিষয়সমূহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রথম থেকে যে মত ও পথ অনুসরণ করে আসছেন সেটিই আমার মত ও পথ। উদাহরণ স্বরূপ আমার মতে আলমে বরযখে মুনকীর নকীরের সওয়াল, কবরের আযাব, হাশর, আমল বা ভাল-মন্দ কাজের ওজন, আল্লাহর দিদার, আমল অনুসারে শাস্তি বা পুরস্কার লাভ সবই সত্য। মু'মিন কবীরা গোনাহ করলে কাফের হয়ে যায় না কিংবা ইসলামের গণ্ডী থেকেও বেরিয়ে যায় না। নবী ও রাসূলদের সবাই মা'সুম বা নিষ্পাপ এবং 'ইসমত' বা নিষ্পাপ হওয়া তাদের বিশেষ গুণ। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস শরয়ী বিধানের দু'টি মৌলিক উৎস। সাহাবাগণ উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব। কুরআন ও হাদীসে সাহাবাদের যে প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো তাদের জন্যে সর্বজন স্বীকৃত, আমি দ্বিধাহীন চিত্তে তা স্বীকার করি। তাদের ইজমা পর্যায়ের সিদ্ধান্তসমূহ আমার

দৃষ্টিতে অকাট্য দলীল। তবে সেগুলো মুতাওয়াতের বা পরস্পরগতভাবে আমাদের কাছে পৌঁছতে হবে। অন্যথায় সেগুলো দলীলে জন্নী হিসেবে গণ্য হবে। ইজতিহাদী বিষয়সমূহে সাহাবীদের ব্যক্তিগত রায় যদি কুরআন ও হাদীস বিরোধী না হয় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর বিরোধী হলে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনো ইজতেহাদী বিষয়ে সাহাবাদের ফায়সালা ও ফতওয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে অগ্রাধিকার দলের নীতি অনুসরণ করা হবে। যার ফতওয়া ও ফায়সালা কুরআন-হাদীসের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল হবে সে ফতওয়ার ওপরে আমল করা হবে। কিন্তু কাউকে অসম্মান বা খাটো করা জায়েয হবে না বরং ব্যতিক্রমহীনভাবে হারাম ও নাজায়েয।

ছোটখাট বিষয়ে আমার মত ও পথ

ছোটখাট মাসয়ালার ক্ষেত্রে আমি হানাফী মতাবলম্বী। আমি হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মযহাবের অনুসারী। ছোটখাট মাসয়ালার বিষয়ে আমি তাঁর মত অনুসরণ করে থাকি।

আমি একজন দেওবন্দীও বটে !

আমার মতে একজন মু'মিনের জন্যে গৌরব করার মতো যদি কোনো সম্পদ থেকে থাকে তবে তা হবে শুধু 'আবদিয়াত' বা আনুগত্যের সম্বন্ধ। এর অর্থ হলো, মু'মিন হবে জাহের ও বাতেন উভয় দিক থেকে সত্যিকার দাসত্বের মূর্তপ্রতীক এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীন, ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ নিজেদের জীবনে এ শিক্ষারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তবে আকীদা, মত ও পথ এবং মযহাবের ব্যাপারে যেহেতু আমি আমার সম্মানিত ওস্তাদবৃন্দ এবং দেওবন্দের বড় বড় ব্যক্তিত্বের সাথে ঐকমত্য পোষণ করি এবং তাদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেছি। ছাত্র হিসাবেও সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সম্পর্কের কারণে আমি নিজেকে দেওবন্দীও বলে থাকি। যদিও আমার কাছে এটা কোনো স্থায়ী সম্পর্ক নয় বরং উপরোল্লেখিত বস্তুত্রয়ের সমষ্টিমাত্র এবং তদনুযায়ী সঠিক পন্থায় কাজ করারই নামান্তর।

হযরত মাওলানা মুফতী কিফায়াত উল্লাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমার হাদীসের উস্তাদ।

সম্ভবত ১৩৫০ হিজরী সনে পূর্ণাংগ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আমি এখান থেকে দিল্লী রওয়ানা হই। সেখানে পৌঁছে দিল্লীর আমিনীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হই; পুরো সাতটি বছর সেখানে ইলমে দ্বীন অধ্যয়নে নিয়োজিত থাকি। শিক্ষা

www.pathagar.com

জীবনের এ দীর্ঘ সাত বছর সময়ের শেষ বছরে অর্থাৎ আমার শিক্ষা জীবনের শেষ বছরে আমি এ অনন্য সাধারণ মুহাদ্দিস, জ্ঞান তাপস ও জ্ঞানের সাগর আলেমের সাহচর্যে থাকা ও উঠা-বসার সুযোগ লাভ করি। তিনিই হযরত শায়ক মুফতীয়ে হিন্দ আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াত উল্লাহ সাহেব নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাছেই আমি বুখারী ও তিরমিযী হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। হাদীসশাস্ত্রে তিনিই আমার শায়খ।

نور الله ضريحه وبرد مضجعه وجعل الجنة مثواه -

জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার পরিচয়

সোয়াত রাজ্যের বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকাকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার পরিচয় ঘটে। সেখানকার কোনো কোনো কর্মীর মাধ্যমে জামায়াতের সাথে পরিচয়ের সূচনা হয়। তারা আমাকে তাদের সহযোগী বা মুত্তাফিক বানানোর উদ্দেশ্যে আমার সাথে সাক্ষাত করতে এবং ইসলামী সাহিত্য সরবরাহ করতে শুরু করে। কিন্তু একদিকে রাজ্যের পরিবেশ একটি আন্দোলনের জন্য তা খাঁটি ইসলামী আন্দোলন হলেও—সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিলো। অপরদিকে এ জামায়াতের আকীদা-বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সংখ্যা গরিষ্ঠের আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী হয় কিনা তা নিয়ে আমি আশংকিত ছিলাম। তৃতীয়ত, বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে কোনো সংগঠনে শামিল হওয়ার অনুমতিও আমার ছিলো না। এসব কারণে আমি জামায়াতের কর্মীদের প্রতি মনে মনে বীতশ্রদ্ধ ছিলাম। তাই সহযোগী বা মুত্তাফিক হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারলাম না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি জামায়াতের সাহিত্য অধ্যয়ন অব্যাহত রাখলাম। এভাবে আমি জামায়াতের দাওয়াত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল হলাম এবং আমার মনের বীতশ্রদ্ধভাব ভালোবাসা ও হৃদ্যতায় রূপান্তরিত হলো।

ইতিমধ্যে তৎকালীন আমীরে জামায়াত মরহুম মাওলানা সাইয়েদ গুলবাদ শাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যিনি ফাযেলে দেওবন্দ এবং শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহম্মদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। হযরত শায়খুল ইসলাম সাহেবের স্বহস্তে লিখিত একখানা পত্র দেখালেন। পত্রখানাতে মাওলানা গুলবাদ শাহ সাহেবের "আমি কি জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনে শামিল হয়ে কাজ করতে পারি ?" এ প্রশ্নের জবাবে মরহুম মাওলানা মাদানী সাহেব তাঁকে অনুমতি দিয়ে লিখেছেন : "আপনি জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনে শামিল হয়ে দ্বীনের খেদমত করতে পারেন। এতে শরীয়াতের দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা নেই।"

www.pathagar.com

আন্তরিক শান্তি মানসিক প্রশান্তি

হযরত মাওলানা মাদানী সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির এ লিখিত এজাজতনামা দ্বারা জামায়াত সম্পর্কে আমার মনে এ মর্মে প্রশান্তি সৃষ্টি হলো যে, জামায়াতে ইসলামী কোনো গোমরাহ জামায়াত নয়। তখন থেকে আমি জামায়াতের সাহিত্য আরো বেশী করে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা শুরু করলাম। জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণীর কয়েক খণ্ড, কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, সত্যের সাক্ষ্য, ইসলামের হাকীকত, জিহাদের হাকীকত এবং ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ বইগুলো আমি ভালো করে পাঠ করলাম। আল্লাহকে সাক্ষী করে বলছি, এ সময়ে আমি আমার মন-মগজে একটি বিস্ময়কর বিপ্লব অনুভব করলাম। আমি স্পষ্টত অনুভব করতে পারলাম যে, আমার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা এবং মন-মানসিকতায় একটি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যদ্দরুন আমার হৃদয়ে এ আবেগও উদ্বেলিত হতে থাকে যে, জীবনে কিছু বাস্তব পরিবর্তনও সৃষ্টি করা উচিত। ধীরে ধীরে ঘটনা এতদূর গড়ালো যে, জামায়াতের দাওয়াত সম্পর্কে লোকজনের সাথে প্রকাশ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হলো। পরিণামে সি. আই. ডি. রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে চাকুরী হারাতে হলো এবং জামায়াতের কিছুসংখ্যক কর্মীকেও গ্রেফতার করা হলো।

জামায়াতের বিরুদ্ধে দেওবন্দের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ফতওয়া

আল্লাহ তায়ালার শান অতি বিস্ময়কর। সরকার আমাকে চাকুরীচ্যুত করার ২/৩ দিনের মধ্যেই আমি আকোড়া খোটকের দারুল উলুম হক্কানীয়ায় একজন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র লাভ করি। প্রায় ২/৩ বছর সেখানে বেশ নির্বিঘ্নে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলাম। হঠাৎ মাদ্রাসার পরিবেশে মতবিরোধ দেখা দিলো। জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বেশ জোরেশোরে দেওবন্দের বড় বড় আলেমদের ফতওয়া প্রচার হতে লাগলো এবং গোটা ইলমী পরিবেশ বিশৃঙ্খল অবস্থায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। এ সময়ে আমি একটি আশ্চর্য ধরনের মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অস্থিরতা ও টানাপোড়নের মধ্যে কাটালাম।

মানসিক দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার এ অবস্থা শেষ পর্যন্ত আমাকে এসব অভিযোগ ও সমালোচনা খতিয়ে দেখতে এবং সলফে সালেহীনদের জ্ঞান-গবেষণার আলোকে কার মত ও পথ শক্তিশালী এবং কার মত ও পথ দুর্বল তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে বাধ্য করলো। অধিকন্তু এ বিষয়ে ভীত হওয়া যে, এগুলো এমন কোনো মৌলিক বিষয় কিনা যার মধ্যে মতপার্থক্য হওয়াতে হিদায়াত ও

www.pathagar.com

গোমরাহীর মতো দু'টি পরস্পর বিরোধী ও বিপরীত পথের সৃষ্টি হতে পারে অথবা এগুলো খুঁটিনাটি ধরনের বিষয় যেগুলোর মধ্যে আগেও দু'টি রায় ছিলো এবং আজও হতে পারে আর এগুলোর কোনো একটিকেও গোমরাহ বলা যায় না।

অভিযোগসমূহের পর্যালোচনা

অতএব, এ উদ্দেশ্যে আমি অভিযোগসমূহের পর্যালোচনা শুরু করলাম। পরিশেষে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, বিতর্কীত বিষয়সমূহের মধ্যে কিছু বিষয় সম্পূর্ণরূপে ছোট-খাট ধরনের। এগুলো সম্পর্কে উম্মতের বড় বড় আলেম ও শায়খগণ আগেও সে একই অভিমত প্রকাশ করেছেন যা বর্তমানে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি করছেন। এখন যদি সেগুলো সম্পর্কে গোমরাহীর ফতওয়া দেয়া হয় তাহলে একই বিষয় আজ থেকে শত শত বছর আগে যেসব আলেম ও শায়খগণ হুবহু মাওলানা মওদূদীর মত সিদ্ধান্ত ও অভিমত পেশ করেছেন তারাও এ ফতওয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। এটি দীনের কোনো সঠিক খেদমত নয়। কোনো কোনো বিষয় যদিও মৌলিক কিন্তু সে বিষয়ে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অভিমত হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমতের কেশাগ্র পরিমাণও খেলাফ নয়। সুতরাং সংগত কারণেই এ অভিমতকে না গোমরাহীর কাজ বলা যেতে পারে, না সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী।

অভিযোগসমূহের পর্যালোচনা কেন করা হলো ?

আমি ভালো করেই জানি যে, যতো বুযর্গ ও মাশায়েখ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেন এবং ছোট-বড় প্রত্যেক ব্যাপারে তাদের অন্ধানুকরণ ও তাকলীদ জরুরী মনে করেন তাদের কাছে অভিযোগগুলোর পর্যালোচনার এ কাজটি খুব অপসন্দনীয় এ ব্যাপারে বুযর্গ ও মাশায়েখদের প্রকাশিত ফতওয়া বিদ্যামন এবং সেগুলোর ওপর নির্ভর করা হলো না কেন ? তাদের সমীপে আমি আরজ করবো যে, শায়খদের প্রকাশিত ফতওয়ার বর্তমানে অভিযোগসমূহের পর্যালোচনায় অবতীর্ণ হওয়া আমার জন্যে বাহ্যতঃ সংগত হয়নি। তাছাড়াও এজন্য যে পর্যায়ের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ছিলো তা আমার আসেনি। আর যে দূরদর্শীতা থাকা দরকার ছিলো আমি অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করছি যে, তাও আমার নেই। অল্পবিস্তর যে জ্ঞান ছিলো বড় বড় জ্ঞানীদের জ্ঞানের তুলনায় তা ছিলো সমুদ্রের একবিন্দু পানির সমান কিংবা সূর্যের তুলনায় একটি পরমাণুর সমান। জ্ঞানের এ দৈন্যতা নিয়ে বিতর্কিত বিষয়ের জ্ঞানগত পর্যালোচনা পেশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে মন-মানস প্রস্তুত ছিলো না। কিন্তু বিষয়টি ছিলো অত্যন্ত নাজুক। দীনের একজন নিঃস্বার্থ সেবক আলেম ও তাঁর

www.pathagar.com

পবিত্র জামায়াত সম্পর্কে দীনের গোমরাহ্ ও গোমরাহ্কারী বলে ফতওয়া দেয়ার বিষয়টি সামনে ছিলো। অথচ আর গোমরাহ ও গোমরাহ্কারী হওয়ার ব্যাপারে আমার কাছে শরীয়াতের কোনো মযবুত দলীল ছিলো না। ইল্‌ম এবং দলীল-প্রমাণ ছাড়া কোনো মু'মিনকে অথবা জামায়াতকে গোমরাহ্ ও গোমরাহ্কারী রূপে ফতওয়া দেয়া আমি আমার জন্যে পরিণতির দিক থেকে ভয়ানক ও ধ্বংসাত্মক মনে করছিলাম। এজন্যে আমি বিবেক-বুদ্ধির ফায়সালায় দীনের দায়িত্বানুভূতিতে একথাই উত্তম ও উপকারী মনে করেছি যে, আমি আমাদের বুযর্গ ও মাশায়খদের প্রকাশিত ফতওয়ার ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে নিজেই বিতর্কিত বিষয়গুলোর বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিগ্রাহ্য পর্যালোচনা করবো। আর যে মত ও পথ আমার কাছে শক্তিশালী বলে পরিজ্ঞাত হবে সেটির সাথেই একাত্মতা ঘোষণা করবো। আর যে মত ও পথ দুর্বল বলে প্রতিভাত হবে তার বিরোধিতা করবো। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ইলমের সীমা ও পরিধি অনুসারে আকীদা ও কাজের জবাবদিহি করতে হবে। অন্য কারো ইল্‌ম কারো জন্যে কল্যাণকর বা কার্যকরী প্রমাণিত হবে না। সেখানে গোত্রপ্রীতি কিংবা দলীয় সম্পর্ক কারো জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হবে না।

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلاَّ اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ-

আমি আমার শায়খদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করি না

তাই বলে এর অর্থ কখনো এটা নয় যে, আমি আমার শায়খদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করি কিংবা তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখি না। আমার শায়খদের প্রতি আমার মহব্বত এবং হৃদয়ের নেক আবেগ কতটুকু, তাদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদার কি উচ্চ ধারণা পোষণ করি তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আমি আজও নিজেকে তাদের একজন নগণ্য খাদেম এবং তাঁদের ইল্‌মী ফয়েজের একজন ফায়েজ লাভকারী বলে মনে করি। যদিও কেবলমাত্র এ একটি বিষয়েই তাঁদের সাথে মতপার্থক্য করে থাকি। তথাপি তাদের সাথে আমার রূহানী ও জ্ঞানার্জনের সম্পর্কের ওপর মতের এ ভিন্নতা কখনো কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে না। আমিই একমাত্র ব্যক্তি নই যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিজের শায়খদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করছি। তাও আবার শুধু একজন ব্যক্তি অথবা দলের ব্যাপারে। আমার আগেও এ পৃথিবীর অনেক বড় বড় আলেম এবং খ্যাতনামা মনীষী অতিবাহিত হয়েছেন যারা দীনের অনেক ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ ও ইল্‌মী গবেষণার ভিত্তিতে শায়খদের সাথে মতপার্থক্য করেছেন। কিন্তু মতের এ পার্থক্য ও বিভিন্নতা

www.pathagar.com

তাদের রূহানী ও ইল্‌মী সম্পর্কে কোনো ফাটল বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি।

আমি সীমাতিরিক্ত মহব্বতেরও পক্ষপাতি নই মহব্বতে সীমাতিক্রম করারও আমি সমর্থক নই

তবে এটা আমার চরম মুনাফেকী হবে যদি আমি স্পষ্ট করে না বলি যে, বুযর্গানে দীনের মহব্বতের অর্থ আমার কাছে এ নয় যে, ছোট-বড় সব বিষয়ে চোখ বন্ধ করে তাদের অন্ধ অনুকরণ করা আমাদের কাছে ফরয এবং দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের সাথে মতপার্থক্য করা হারাম। এরূপ কাজকে আমি সীমাতিরিক্ত মহব্বত বলে মনে করি। পরিণামের দিক থেকে এটিকে আমি অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ বলে মনে করি এবং পরিণতির দিক থেকে এটাকে আমি নিজের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করি। এ ধরনের সীমাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন এবং মাত্রাতিরিক্ত মহব্বত দ্বারা মানব চরিত্র ও আকীদা-বিশ্বাসে কি কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং ধর্মীয় দিক থেকে কতটা ধ্বংসাত্মক তথা বিষতুল্য হতে পারে তা আমার খুব ভালো করে জানা আছে। আমি এ সত্যের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখি যে, গোটা ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির ওপর কুরআনের আয়াত ঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ -

যে শক্ত অভিযোগ আরোপ করেছে তার কারণ সীমাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন এবং মাত্রাতিরিক্ত মহব্বত ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যের অনুসৃত হওয়া সর্বাধিক হকদার।

শায়খ এবং বুযর্গদের বৈধ মহব্বতকে অন্তরে স্থান দেয়া এবং মনে-প্রাণে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ধর্মীয় দিক থেকে নিজের জন্যে উত্তম ও কল্যাণকর বলে মনে করি। তবে মাত্রাতিরিক্ত তা'যীম এবং মাত্রাতিরিক্ত মহব্বত করা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকবো।

যেখানে এবং যার কথায় আমি সত্য পেয়ে যাই সেটাকেই নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় সত্য বলে দেই এবং "সত্য সর্বাগ্রে অনুসরণযোগ্য।" এ নীতির ভিত্তিতে সে সত্যটিরই অনুকরণ করি। এ ধরনের কর্মপদ্ধতির কারণে আজকের পক্ষপাত দুষ্ট পৃথিবীতে আমার অনেক কষ্ট হবে তা নিশ্চিত। তবে আমি স্বস্থানে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকবো যে, আমার দীন সব ধরনের ফিতনা থেকে নিরাপদ এবং আমি অবৈধ পক্ষপাত এবং কার্যত কপটতা থেকে মুক্ত আছি।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার সম্পর্ক এবং তার স্বরূপ

আমি একথাটি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই যে, আজ পর্যন্তও আমি জামায়াতে ইসলামীর রুকন বা কর্মী নই। তবে দীর্ঘ দিন থেকে আমি মাওলানা মওদূদীর

www.pathagar.com

রচিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে আসছি। এভাবে আমার মন-মগজে মাওলানা সম্পর্কে একটি বিশ্বাস পাথরে খোদিত নক্‌শার মতো বদ্ধমূল হয়েছে তাহলো, শুধুমাত্র পাকিস্তান ভূখণ্ডেরই নয় বরং গোটা বিশ্বে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাঁর হৃদয় খুবই উন্মুখ। এ কাজের জন্যে আরো অনেক নিঃস্বার্থ আলেমের মতো তিনিও অত্যন্ত উদগ্রীব। তিনি চান সারা বিশ্বে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইসলাম, ইসলামের আইন-কানুন কার্যকর হোক। আল্লাহদ্রোহী শক্তি ও শয়তানী আইন-কানুন জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই যেন কার্যকর না হয়। এ উদ্দেশ্যে মাওলানা মওদূদী প্রথম থেকেই যে চেষ্টা-সাধনা করে আসছেন তা খুবই প্রশংসাযোগ্য এবং এ ব্যাপারে তিনি যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন সেটাও প্রশংসার যোগ্য। এ কারণেই আমি মাওলানা সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতে বাধ্য হয়েছি এবং এটিই আমাকে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত, লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে বাধ্য করেছে। আর এ সম্পর্কের কারণেই আমাকে আজ প্রত্যেক ক্ষেত্রে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। প্রতিটি পরিবেশ এ কারণেই আমার জন্যে অজানা ও প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আমার মতে এ সম্পর্ক আল্লাহর কাছে কোনো অপরাধ নয়। বরং আমার জানামতে এটাকেই আমার নাযাতের ওসিলা মনে করছি।

মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ওপর আরোপিত অভিযোগসমূহের জ্ঞানগত পর্যালোচনা প্রকাশনার উদ্দেশ্য

ইসলাম জীবনের একটি বিশেষ বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় বিশেষ আকীদা-বিশ্বাস ও আমলমাত্র, যারা শুধু এতটুকু বিশ্বাস করে না, বরং তা একটি বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা যা জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাসূলের আনুগত্যের আলোকে বিপ্লব সাধন ও পরিবর্তন আনয়ন করতে এবং জীবনের সব বিভাগে ইসলাম বহির্ভূত আইনের প্রাধান্যের স্থলে ইসলামী আইন-কানুনের প্রাধান্য চায় তারা ভালো করেই জানে যে, এ দেশে ইসলাম কেবল তখনই কায়েম হতে পারে যদি ইসলাম বিশ্বাসী সমস্ত লোক সম্মিলিতভাবে সে জন্য প্রচেষ্টা চালায়। নিজেদের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহের অবসান ঘটায় এবং ছোটখাট বিষয় নিয়ে ঝগড়া ও কলহের অবসান ঘটায়। এ পদ্ধতি ব্যতিরেকে এককভাবে কোনো জামায়াতের প্রচেষ্টা কখনো সফলকাম ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব। বিশেষত বিরোধী শক্তিসমূহ যখন সুসংগঠিত এবং শক্তিশালীও।

আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে এ দেশে ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট লোক অনেক আছেন। এদের মধ্যে দুই ধরনের লোক আছেন যারা ইসলামের স্বীকৃত

www.pathagar.com

নীতিমালার ভিত্তিতে সম্মিলিত কর্মপন্থা নিয়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েমের জন্য একে অপরের সাথে একনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করলে পরিবেশ ইসলামী জীবন বিধান কায়েমের অনুকূলে হবে না বা দীর্ঘদিন পর্যন্ত এখানে অ-ইসলামী আইন বিধান চালু থাকবে এমন হতে পারে না। বরং ইসলামী জীবন বিধান কায়েমের পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে সংগতভাবেই আশা করা যায়। এ দু' ধরনের লোকের মধ্যে এক ধরনের লোক হলেন ঐসব উলামায়ে কেরাম যারা তাঁদের নিখাদ শিক্ষার মাধ্যমে এ দেশকে সত্যিকার অর্থে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের নিঃস্বার্থ খেদমত এবং ইসলামী শরীয়াত চালু করার জন্য তাদের সৎ প্রচেষ্টা জাতির কাছে গোপন নয়।

দ্বিতীয় ধরনের লোক হলেন তারা যারা জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট। এসব লোক ইসলামকে অন্যসব দীনের উপর বিজয়ী করার অভিপ্রায়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের যথাসর্বস্ব কুরবানী করতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। এ পথে তারা কারাগারের অসহ্য যন্ত্রণাও সন্তুষ্টচিত্তে বরদাশত করে সব কষ্টকে হাসি মুখে স্বাগত জানিয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মানিত আলেমগণ এমন কতিপয় সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলেছেন যাতে তারা মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অভিমতকে ভুল তথা বিভ্রান্তিকর রূপে দেখানোর চেষ্টা করেন। তারা আপামর সকলের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন যে, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একজন গোমরাহ লোক এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারিজ। এ পারস্পরিক মতপার্থক্যই এখানকার পরিবেশকে ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েম হওয়ার জন্যে অত্যন্ত প্রতিকূল করে তুলেছে। এদ্বারা ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহ বেশ ভালোভাবে লাভবান হচ্ছে। তাই দুই পক্ষের মধ্যে বিতর্কিত বিষয়সমূহের সঠিক অবস্থা গবেষক আলেমদের গবেষণা ও ব্যাখ্যার আলোকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হলো। এভাবে হয়তো একদিকে মতপার্থক্যের তীব্রতা হ্রাস পাবে অন্যদিকে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এসব মতবিরোধের দরুন মাওলনা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে ভুল ধারণার অবতারণা হয়েছে তার অপনোদন হবে।

আমার এ আশংকাও হয় যে, "মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির প্রতি আরোপিত অভিযোগসমূহের জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা গ্রন্থের প্রকাশনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ভুল বুঝাবুঝি আরো বেড়ে যেতে পারে বলেও আমি আশংকা করি। কারণ, কতিপয় মাসয়ালা সম্পর্কে বর্তমান যুগের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভংগি অত্যন্ত নাজুক। আবার কতিপয় মাসয়ালা আপনা থেকেই খুব জটিল। এসব মাসয়ালার বর্তমান কালের ফিতনার প্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা-

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ খুব উপকারী নয় ; বরং ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু এসব অভিযোগকে কেন্দ্র করে উল্লেখিত দু'টি দলের মধ্যে মতপার্থক্য যেহেতু একটি ফিতনার রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং তার তাৎপর্য স্পষ্ট করে তুলে ধরা জরুরী বলে মনে হয়েছে। সুতরাং এর প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ না করুন যদি এ গ্রন্থ প্রকাশের কারণে জনগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি আরো বৃদ্ধি পায় তাহলে এর সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে তাদেরকে—যারা শুধুমাত্র গোষ্ঠী প্রীতির কারণে জনগণের সামনে এসব বিষয় পেশ করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেধ সৃষ্টি করছে এবং এভাবে লোকদের মনে একটি মুসলমান দলের নেতা সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করে চলেছে।

অভিযোগসমূহ সম্পর্কে একটি জরুরী ব্যাখ্যা

এসব অভিযোগের দু'টি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করা জরুরী বলে আমি মনে করি। এক, এসব মাসয়ালাকে কেন্দ্র করে আমার সম্পর্কে কোনো মুসলমান ভাই যেন এ ভুল ধারণা অথবা বদ খেয়াল পোষণ না করেন যে, এগুলোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমি পক্ষপাত দেখিয়েছি অথবা পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিনা কারণে কারো বিরোধিতা করেছি। আল্লাহ সাক্ষী, দীনের ব্যাপারে আমি পক্ষপাতিত্ব অথবা অযথা সহযোগিতা কিংবা বিরোধিতার ওপর নির্ভরশীল কর্মপদ্ধতিকে নিজের পরিণতির জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করেছি। শরীয়াতের দৃঢ় সমর্থন ছাড়া শুধু মুরুব্বী ও উস্তাদদের গোমরাহ মনে করার কারণে কোনো ব্যক্তি বা দলকে গোমরাহ মনে করা আমি নিজের জন্য বিপজ্জনক মনে করি। এসব মাসয়ালার ব্যাখ্যায় আমি যাকিছু পেশ করেছি তা গবেষক আলেমদের গবেষণা এবং ব্যাখ্যার আলোকেই পেশ করেছি। আর নিজের পক্ষ থেকে যাকিছু পেশ করেছি তা ন্যায় ও সত্য মনে করেই পেশ করেছি। এতে কাউকে অন্যায়ভাবে সহযোগিতা করা আবার অকারণে বিরোধিতা করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সহযোগিতা বা স্বপক্ষে এ গ্রন্থে যাকিছু পাওয়া যায় তার কারণ হলো এসব মাসয়ালা এমন প্রকৃতির যে—তা তুলে ধরলে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অবস্থানের স্বপক্ষে এবং তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দেয়ার পর্যায়ে পড়ে।

দ্বিতীয় যে কথাটিকে আমি এখানে সুস্পষ্ট করা জরুরী মনে করি তাহলো —খোলার (স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো) ইদ্দত (বিচ্ছেদ পরবর্তী সময়) প্রসংগ। খোলা প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত সম্পর্কে গবেষণা লব্ধ যাকিছু পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে আমার কাছে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো জমহুরে সাহাবা এবং মুজতাহিদ ইমামদের মত। তাদের মতে এরূপ স্ত্রীলোকের ইদ্দত

www.pathagar.com

তিন হায়েজের কম নয়। এ রায়টি গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হলো—এতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। খোলা প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দত এক হায়েজের বেশী নয়—মাওলানা মওদূদী রাহ্‌মাতুল্লাহ আলাইহির রায় তার নিজস্ব। উল্লেখযোগ্য সাহাবায়ে কিরামদেরও একটি দল এ মতের সমর্থক এবং কিছু সংখ্যক মুজতাহিদ ইমামও এ মতের প্রতি আকৃষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। তাই আমি এ মতকেও ভুল বলার দুঃসাহসও দেখাতে পারি না। কেননা, এর স্বপক্ষেও যথেষ্ট দলীল পেশ করা হয়েছে।

উলামায়ে কিরামের প্রতি আমার আবেদন

দীনের একজন কল্যাণকামী এবং উলামায়ে কিরামের একজন খাদেম হিসেবে আমি সেইসব সম্মানিত আলেমদের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি, যারা মনে-প্রাণে এদেশে ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েম করতে এবং সবরকম অনৈসলামী আইন-কানুনের চির অবসান ঘটাতে চান। এখন এ সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, যারা এখানে ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েম করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সমস্ত বিরোধী শক্তি তাদেরকে উৎখাত করার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করে যাচ্ছে। যাতে ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েমে তৎপর শক্তি যেন ব্যর্থ হয়ে যায় এবং কেউই যাতে এক্ষেত্রে চেষ্টা-সাধনা করে সফল না হয়। ইসলামকে বাস্তব জীবন থেকে দূরে রাখাও তাদের লক্ষ্য। এমতাবস্থায় যদি ইসলামী শক্তিগুলো পারস্পরিক বিবাদের কারণে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে পরিণামে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো লাভবান হওয়া এবং ইসলামী শক্তিগুলোর জন্যে এটা ক্ষতিকর এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক হওয়া একেবারে নিশ্চিত।

ওহুদের যুদ্ধ

ওহুদের যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীদের মধ্যে এক মামুলী ইজতেহাদী মতবিরোধ দেখা দেয়ার কারণে যখন কতিপয় সাথী ঘাঁটি ছেড়ে চলে যায় এবং পশ্চাত দিক থেকে শত্রুরা আক্রমণ করে বসে তখন কেবলমাত্র আবদুল্লাহ বিন যুবাইর ও তাঁর অবশিষ্ট সংগীরাই শাহাদাত বরণ করেছিলেন তাই নয়, বরং বিজয়টাই পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়েছিলো। আর এ পরাজয় কোনো মামুলী পরাজয় ছিলো না। বরং এজন্য ৭০জন উৎসর্গীকৃত প্রাণ সাহাবা শহীদ হয়েছিলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহও আহত এবং দন্তমুবারক শহীদ হয়েছিলো।

তাই সেইসব সম্মানিত আলেমদের কাছে আমার আকুল আবেদন যারা কতিপয় সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা

www.pathagar.com

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। আল্লাহর ওয়াস্তে সময়ের নাজুকতা এবং আপন মহান কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ অনুধাবন করতঃ এ ধরনের সামান্য মতবিরোধকে উপেক্ষা করে ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে মিলেমিশে ইসলামেরই হিফাজত করুন এবং শরয়ী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত চেষ্টা চালিয়ে যান। কেননা, শরীয়তী বিধান কায়েমের গুরু দায়িত্ব সবার আগে আপনাদের উপরই বর্তায়।

একক প্রচেষ্টা

আপনারা একথা ভালো করে মনে রাখবেন যে, বর্তমান নাস্তিক যুগে এবং এই পাশ্চাত্য পরিবেশে দীন ইসলামের বিধান কায়েমের জন্যে একমাত্র সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সফলকাম হতে পারে। একক প্রচেষ্টা আপনাদের হোক কিংবা অন্য আর কারো হোক তা কখনো সফলকাম হতে পারে না। অতএব, এদেশে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়া যদি আপনারা মনে-প্রাণে কামনা করেন তাহলে জরুরী হলো আর সময় অপব্যয় না করে নিজেদের পারস্পরিক মতভেদের অবসান ঘটিয়ে সকলেই এক প্লাটফরমে একত্রিত হোন এবং ইসলামকে বিজয়ী করার ব্যাপক কর্মসূচী তৈরি করুন। তারপর সেই কর্মসূচী অনুযায়ী দেশব্যাপী চেষ্টা-সাধনা শুরু করুন। তবেই মনযিলে মকসুদে পৌঁছতে সক্ষম হবেন। আপনারা বিশ্বাস করুন, এরূপ কর্মসূচী ও তৎপরতা ব্যতিরেকে আপনাদের সকল চেষ্টা তদবীর ব্যর্থ হয়ে যাবে। সফল হবে একমাত্র আপনাদের বিরোধীরা আর গোটা জাতির জন্যে এমন একটি মর্মান্তিক ও বিরাট দুর্ঘটনা হবে যার খারাপ পরিণতি ও সুদূর প্রসারী প্রভাব থেকে কেউ-ই নিরাপদ থাকবে না এবং এদেশে ইসলামের তাহযীব-তমদ্দুন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সর্বশেষ আবেদন

আমার সর্বশেষ আবেদন সেইসব ব্যক্তিবর্গের কাছে যারা মতপার্থক্যে ইন্ধন যোগাতে দিনরাত সদা ব্যস্ত থাকেন। এমনকি জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করার ফলে যে ৯ মাস এর তৎপরতা প্রায় বন্ধ ছিলো এবং সমস্ত নেতৃবৃন্দ জেলখানায় বন্ধী ছিলেন সে সময়ও তারা নিজেদের লেখনীর যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন।

আপনাদের নিয়ত সম্পর্কে আমার জানা নেই। আপনাদের নিয়ত সম্পর্কে কারো সন্দেহ পোষণ করা কিংবা আক্রমণ করার অধিকারও কারো নেই। তবে এটা স্বীকৃত সত্য যে, মতপার্থক্য বৃদ্ধি করার ব্যাপারে ইন্ধন যোগাতে আপনাদের অত্যধিক নেক নিয়ত থাকলেও সামগ্রীকভাবে এর ফলাফল যে কোনো অবস্থাতেই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে কল্যাণকর নয় বরং

www.pathagar.com

ক্ষতিকরই প্রমাণিত হবে। এ দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের কেবল ক্ষতিই হবে, উপকার হবে না। এ সময়ে দেশের আরো অনেক সমস্যার দিকে আপনাদের মনোযোগ দেয়া কর্তব্য। এসব সমস্যা আপনাদের কল্যাণকর ও মূল্যবান প্রচেষ্টার উত্তম ক্ষেত্র হতে পারে। অধিকন্তু এসব ক্ষেত্রে আপনাদের গঠনমূলক প্রচেষ্টা সফলকামও হতে পারে। তাহলে আপনাদের নিজেদের চেষ্টা-সাধনার গতি মতবিরোধের ইন্ধন যোগানোর পরিবর্তে এসব বিষয়বস্তুর দিকে ফিরানো এবং এভাবে গোটা জাতির শ্রদ্ধাভাজন হওয়া কি উত্তম নয়?

هذا هو الذى ادين به عند الله ولكل امرء مانوى -

মুহাম্মদ ইউসুফ

২৯শে রযব, ১৩৮৪ হিজরী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নীতিমালার ভূমিকা

গ্রন্থের বিষয়বস্তু যদিও বিতর্কিত, তবুও সেগুলো আলোচনা করার আগে আলেমদের সর্বসম্মতভাবে গৃহীত নীতিমালা ভূমিকা শিরোনামে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে চাই। যাতে একজন পাঠককে এসব নীতিমালার আলোকে বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে সঠিক মত প্রতিষ্ঠা করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। বরং যেসব বিষয় মাওলানা মওদূদীর রায়কে কিছুসংখ্যক আলেম বিভ্রান্তিকর বলে ঘোষণা করেছেন তা কতটুকু সঠিক তা সে সহজেই বুঝতে সক্ষম হয়।

প্রথম নীতি ঃ হেদায়াত ও গোমরাহীর মাপকাঠি

শরীয়াতের নীতিমালা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিবর্গ একথা ভালো করেই জানে যে, হেদায়াত ও গোমরাহীর জন্যে শরীয়াত এবং শরীয়াত বিশারদ আলেমগণ যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন তা কুরআন ও হাদীস থেকে উৎসারিত আহকাম মাত্র অথবা যেগুলোর ওপর সমগ্র মুসলমান একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কোনো ব্যক্তি বা দল যদি জ্ঞাতসারে নিজেদের জন্যে এগুলোর বিরোধী কোনো মত এবং পথ আবিষ্কার করে নেয় অথবা বিরোধী কর্মপদ্ধতি নিজেদের জন্যে নির্ধারণ করে নেয় তাহলে এরই নাম গোমরাহী বা পথভ্রষ্ঠতা। এ নীতি ও বিধানমালা সলফে সালেহীনদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত আহলে সুন্নাতদের কাছে সমভাবে গৃহীত হয়ে আসছে। এ নীতিমালার নিরিখেই আলেমগণ খাওয়ারেজ, মু'তাযিলা, শিয়া ও অন্যান্য বাতিল ফিরকাগুলোকে গোমরাহ ঘোষণা করেছেন।

দ্বিতীয় নীতি ঃ জমহুরদের বিরোধী হওয়া

আলেমদের মধ্যে আগে থেকেই দ্বিতীয় স্বীকৃত নীতি হিসেবে প্রচলিত আছে যে, ছোটখাট ব্যাপারে যদি কোনো আলেম শরীয় দলীলের ভিত্তিতে জমহুরদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করে তাহলে তা শরীয়াতের দৃষ্টিতে নাজায়েয নয়। এ নীতিমালার ভিত্তিতেই অনেক খুটিনাটি ব্যাপারে মযহাব চতুষ্টয়ের প্রত্যেক ইমাম কোনো না কোনো বিষয়ে জমহুরের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। কেউ এটাকে নাজায়েয বলেনি। হাদীস ও ফিকাহের বড় বড় গ্রন্থসমূহে এ ধরনের মতপার্থক্যের ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। হাদীসের ব্যাখ্যায়ও এর অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। চারজন ইমাম ছাড়া তাঁদের অনুসারী আলেমগণের মধ্যে এমন অনেক আলেম আছেন যারা দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে কেবলমাত্র

www.pathagar.com

নিজেদের ইমামের সাথেই ভিন্নমত পোষণ করেননি বরং জমহুরের সাথেও মতপার্থক্য করেছেন। আর এ ধরনের কর্মপদ্ধতি আগে পরে সকলেরই নীতি হিসেবে চলে আসছে।

তৃতীয় নীতি ঃ দলীলের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান

বিজ্ঞ আলেমগণ এটাও স্বীকার করেছেন যে, কোনো ফক্হী ও ফুরুয়ী (খুটিনাটি) বিষয়ে দলীলের ভিত্তিতে যেমন জমহুরদের সাথে দ্বিমত পোষণ করা যায়। তেমনি কোনো একটি বিষয় যদি ইমামদের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে তাহলে দলীলের ভিত্তিতে এসব মতামতের কোনো একটিকে অপরটির ওপর অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। এসব বিভিন্ন মতামতের মধ্যে কোনোটির সাথে একমত পোষণ করা আবার কোনোটিকে বর্জন করা একজন গবেষক আলেমের জন্যে নাজায়েয নয়, বরং জায়েয কাজ। তবে শর্ত হলো তার বিশ্লেষণ ও দলীল গ্রহণের যোগ্যতা থাকা ও অজ্ঞ-মূর্খ না হওয়া। অধিকন্তু এতে প্রবৃত্তির অনুসরণ করাও উদ্দেশ্য হবে না। এটাও একটা স্বীকৃত নীতি যা পূর্ববর্তী আলেমগণ সবসময় অনুসরণ করে আসছেন। 'তাকলীদ' অধ্যায়ে এর বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হবে।

চতুর্থ নীতি ঃ অস্পষ্টকে স্পষ্টকরণ

গৃহীত সর্বসম্মত নীতিমালার মধ্যে চতুর্থ নীতি হলো–কোনো ব্যাপারে কোনো ব্যক্তির থেকে যখন দু' ধরনের উক্তি হয়, এক ঃ তার অস্পষ্ট উক্তি যার একাধিক অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দুই ঃ তার স্পষ্ট ও বিস্তারিত উক্তি। এরূপ হলে তার অস্পষ্ট উক্তির অর্থ করতে হবে বিস্তারিত উক্তিটির সাথে মিল রেখে যা অন্যত্র দেয়া হয়েছে। এ অর্থের বিরোধী বা বিপরীত অন্য কোনো অর্থে তা প্রয়োগ করা যাবে না। এভাবে একজনের কথার মধ্যে অহেতুক স্ববিরোধিতা এবং দ্বন্দ্ব দেখা দেয় না। এ নীতিটাও কুরআনের আয়াত ও দলীল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। 'ইসমাতুল আম্বিয়া' বা নবীদের নিষ্পাপ হওয়া প্রসংগে এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে। কুরআন থেকেই এ বিষয়ে প্রমাণ পেশ করা হবে।

পঞ্চম নীতি ঃ যে বিষয়ে ইজতিহাদ ছাড়া কোনো নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা

জীবনের অসংখ্য ঘটনা ও সমস্যার মধ্যে এমন কোনো ঘটনা ও সমস্যা যদি দেখা দেয় যার জন্যে শরীয়াতের প্রমাণিত আহকামে কোনো স্পষ্ট হুকুম পাওয়া না যায় এবং মুজতাহিদদের ইজতিহাদে এবং ফিকাহের বিধানে কোনো

www.pathagar.com

ইজতিহাদী হুকুমও পাওয়া না যায় তাহলে এমতাবস্থায় সে ঘটনা ও বিষয়ের নির্দেশ জ্ঞাত হওয়ার জন্যে ইজতিহাদ করা এবং শরীয়াতের নীতি অনুসারে তার জন্যে দলীল দ্বারা অথবা শরীয়াতের নীতিতে ইজতেহাদ ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে কোনো হুকুম উদ্ভাবন করা গবেষক আলেমদের জন্যে জায়েয। এটা এমন একটি প্রয়োজনীয় বিষয় যা অতীতে সবসময় ছিলো এবং কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মার সামনে আসতে থাকবে। ইজতিহাদ ও উদ্ভাবন ব্যতিরেকে কখনো এ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না। কোনো বুদ্ধিমান লোক এ সত্য অস্বীকার করতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। কারণ, এটা ইসলামের পূর্ণাংগ স্থায়ী এবং সার্বজনীন হওয়ার অপরিহার্য দাবী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

মুসলমানদের দুর্ভাগ্য এই যে, এ দেশের দীনি ও মযহাবী মহলে কতিপয় খুটিনাটি ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘ দিন যাবত পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক চলে আসছে। যার কারণে সাধারণ মুসলমান এবং স্বয়ং ধর্মীয় মহলও সাংঘাতিক রকমের মানসিক ও চিন্তাগত দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতায় ভুগছে এবং এ দ্বন্দ্ব অস্থিরতা কতদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে তা অজানা। আজকের এ ফিতনার যুগে 'দীনে ইসলাম' যখন সর্বদিক থেকে আক্রান্ত হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের ফেতনা-ফাসাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কেউ খতমে নবুয়াতকে অস্বীকার করছে, কেউ হাদীস অস্বীকারকারী ফেতনার নেতৃত্ব দিচ্ছে, কেউ পাশ্চাত্য সাংস্কৃতির আসক্ত আবার কেউ বস্তুবাদের সাংঘাতিক ভক্ত। মোটকথা, এ দেশে একমাত্র দীনে ইসলামই সব ধরনের বিপদ দ্বারা অবরুদ্ধ। এমন কোনো পথ ও পন্থা তার জানা নেই যা দ্বারা সে এ বিপদ থেকে বের হয়ে শান্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে এবং যে দেশ এ নামের উপর অর্জিত হয়েছিলো তার ক্ষমতাসীনদের ওপর আপন রাজত্বের পতাকা উড়ানো যায়। এমতাবস্থায় যথার্থ বরং জরুরী ছিলো সমগ্র ইসলামী দলের আপোষে মিলেমিশে সম্মিলিতভাবে ইসলাম রক্ষা করার ব্যবস্থা করা। সমস্ত খুটিনাটি বিষয়ে পারস্পরিক ঝগড়া ও বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত দীনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং নিজেদের কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে বাতিল পূজারী শক্তির কাছে এ সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা যে, আমরা ফিকহী মতভেদের কারণে খুটিনাটি ব্যাপারে একে অপরের সাথে যদিও মতপার্থক্য পোষণ করে থাকি, কিন্তু যখনই আমাদের মিলিত দীনি সম্পদের ওপর কোনো দুশমন আক্রমণ করে বসে তখন আমরা সবাই তার বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো প্রতি ক্ষেত্রে লড়তেও জানি। আমরা আমাদের দীনি সম্পদের হিফাজত করতেও সক্ষম। আমরা আমাদের পারস্পরিক ঐক্য দ্বারা একথা প্রমাণ করে দেখাবো যে, আজ থেকে প্রায় ১৪শ বছর আগে আল্লাহর এ অমিয় বাণী ঃ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا - আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছে সে শিক্ষা আজও আমাদের বুকের মাঝে সযত্নে রক্ষিত আছে এবং মন ও মস্তিস্ক থেকে এর নক্শা মুছে যায়নি।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, আমাদের দীনি মহল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ পরিহার করার অবকাশই যখন পাচ্ছেন না তখন বাইরের শত্রুর মুকাবিলা এবং দীনের হিফাজত তারা কিভাবে করবেন এবং কিভাবে তা সম্ভব হবে? সবচেয়ে বড় বিপদ হলো এসব ভদ্রলোকেরা কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে রাত-দিন ব্যস্ত থেকেও

www.pathagar.com

ক্লান্ত হয় না। আর একেই তারা দীনের উত্তম খেদমত বলে মনে করে। তারা একবারও ফিরে দেখে না যে, আমরা যে কাফেলার নেতৃত্ব দিচ্ছি সে কাফেলার ওপর কোনো দুশমন হামলা করছে না তো কিংবা কোনো ডাকাত বা লুটেরা পিছন থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করে কাফেলার মাল-সামান লুটপাট করে নিয়ে যায়নি তো অথবা কোনো জ্বীন ও মানবরূপী শয়তান কাফেলার আকীদা ও আমল-আখলাকের ওপর ডাকাতি করেনি তো? এসব বিষয়ের প্রতি প্রথমত এসব ভদ্রলোকেরা কর্ণপাতই করেন না। আর যদিবা কখনো করেন তা খুবই কম বা নামমাত্র।

এ কারণেই আজ মুসলমানদের বিভিন্ন স্তরে খৃষ্টবাদও সামান্য বাধা ব্যতিরেকেই সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠছে এবং কাদিয়ানী ও হাদীস অস্বীকারকারী ফেতনা ও মুসলমানদের মধ্যে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। অন্যদিকে নাস্তিকতা ও আল্লাহদ্রোহিতাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এরূপ নাজুক অবস্থায় দীনের রক্ষক ও পাহারাদারদের অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিতাপের বিষয় ছাড়া আর কি? ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করুন এবং তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন। অন্যথায় ভবিষ্যত বংশধরগণ আপনাদেরকে কখনো ক্ষমা করবে না।

মতপার্থক্যের সীমা

ইসলাম খুটিনাটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করার অবকাশ রেখেছে এবং মতপার্থক্য সীমা পর্যন্ত তা বরদাশতও করেছে। এ কারণেই ইসলামের সীমার অভ্যন্তরে দীনের কতিপয় সম্মানিত ইমামদের নাম যুক্ত কতিপয় ফিকাহ ভিত্তিক মযহাব দেখা যায় যা খুটিনাটি বিষয়ে ইমামদের পারস্পরিক মতভেদের কারণে সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু ইসলাম কাউকে এ অনুমতি কশ্মিনকালেও দেয়নি যে, ছোটখাটো ব্যাপারে পারস্পরিক মতভেদকে আপন গণ্ডির বাইরে নিয়ে একে অপরকে ফাসেক, গোমরাহ, কাফের ইত্যাদি বলবে। অথবা এসব খুটিনাটি বিষয়কে কেন্দ্র করে একে অপরের বিরুদ্ধে এমনভাবে শক্তিপ্রয়োগ করবে যার পরিণতিতে নিজেদের মধ্যে এমন ঝগড়ার সৃষ্টি হবে যা কখনো শেষ হওয়ার নয় অথবা স্বয়ং দীন এবং অনুসারী উভয়ের জন্যে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ সম্পর্কে ইসলামের স্পষ্ট হেদায়াত হলো:

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ -

"নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ করো। অন্যথায় তোমরা সাহস হারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাবে।"

আরো উল্লেখ আছে:

www.pathagar.com

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ـ(ال عمران :

"তোমরা সেসব লোকদের মতো হয়ো না যারা স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও মতপার্থক্য করেছে এবং বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এসব লোকদের জন্যেই প্রস্তুত রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ

সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর মতভেদ

বর্তমান সময়ে ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্যে রাজনীতি ও ধর্মীয় উভয় দিক থেকে সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর হলো মতবিরোধ। আর এ মতবিরোধই কিছুকাল যাবত চলে আসছে কতিপয় আলেম এবং জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মধ্যে এমন কতিপয় মাসয়ালা নিয়ে এ মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে যা ঐসব আলেমদের দৃষ্টিতে মৌলিক বিষয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে ঐগুলোর অধিকাংশই ফুরুয়ী বা খুটিনাটি পর্যায়ের এবং আদৌ মৌলিক হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযোগী নয়। কিন্তু কিছুসংখ্যক লোক এমন প্রকৃতির যে, তারা সেগুলোকে মৌলিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এসবের মধ্যে যেগুলো মৌলিক বিষয় সেগুলো সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অভিমত আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের অভিমত থেকে চুল পরিমাণ ভিন্ন নয়। কিন্তু এসব উলামায়ে কিরামগণ সেসব বিষয়ে অযথা মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অভিমতকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত থেকে ভিন্ন বলে অভিযোগ আরোপ করছেন। আমি মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রচিত গ্রন্থাবলী যতোটুকু অধ্যয়ন করেছি তাতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মৌলিক বিষয়সমূহের কোনো একটি বিষয়েও মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত ও পথ থেকে ভিন্ন কোনো আবিষ্কার করেননি। বরঞ্চ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসৃত পথই মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সমস্ত চিন্তা ও কর্ম প্রচেষ্টার রাজপথ।

যেসব মাসয়ালায় কতিপয় সম্মানিত আলেম মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে মতানৈক্য পোষণ করে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ব্যক্তিত্বকে তিরস্কার ও নিন্দাবাদের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছেন সেসব মাসয়ালার সবগুলোই আমি সরাসরি অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করেছি। তারপর পূর্ববর্তী আলেমদের রচনাবলীর সাথে সেগুলোকে মিলিয়েও

www.pathagar.com

দেখেছি। অবশেষে অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তাহলো—ঐসব মাসয়ালার অধিকাংশ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহির গবেষণা আগেকার আলেমদের ইলমী গবেষণার হুবহু প্রতিধ্বনি কতিপয় মাসয়ালায় যদিও তাঁর বিশ্লেষণ ও ইজতিহাদ জমহুরদের ইলমী গবেষণা ও ইজতেহাদী রায় থেকে ভিন্নতর তথাপি এ বিভিন্নতার পশ্চাতেও রয়েছে মযবুত ও যুক্তিসংগত দলীল। আর দলীলের ভিত্তিতেই ইল্মী মাসয়ালায় জমহুরদের রায় থেকে ভিন্নমত পোষণ করা কোনো নতুন কথা নয়। এ ধরনের মতবিরোধকে শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে নাজায়েয অথবা ফাসেক কিংবা গোমরাহ বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন বলা জায়েয নয়। বরং এ ধরনের কর্মপদ্ধতি হলো উলামায়ে হকের সর্বকালের নীতি। আমি এখানে বিতর্কিত মাসয়ালাগুলো ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করতে চাই। তাই এগুলোকে আমি দু' ভাগে বিভক্ত করবো। মৌলিক বিষয় হিসাবে খ্যাত বিষয়গুলোর উল্লেখ থাকবে প্রথম অংশে। আর যেগুলো খুটিনাটি বিষয়ের মাসয়ালা হিসেবে পরিগণিত সেগুলোর উল্লেখ হবে দ্বিতীয় অংশে।

---

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

নবী আলাইহিস সালাম মাসুম বা নিষ্পাপ হওয়া

মৌলিক বিষয়াবলীর মধ্যে প্রথম বিতর্কিত বিষয় হলো নবী আলাইহিস সালামদের নিষ্পাপ হওয়া প্রসংগ। 'তাফহীমাত' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কাহিনী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী আনুসংগিকভাবে যে একটি বাক্য সংযোজন করেছেন তার ওপর ভিত্তি করেই এ প্রসংগে মাওলানাকে দোষারোপ করা হয়েছে। এ বাক্যকে সামনে রেখেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, "তিনি নবীদের মাসুম বা নিষ্পাপ হওয়া স্বীকার করেন না, বরং তা অস্বীকার করেন। তিনি নবী আলাইহিস সালামদেরকে নিষ্পাপ মনে করেন না বরং গোনাহে লিপ্ত মনে করেন। এটা একটা মৌলিক বিষয়। এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সবসময়ের আকীদা-বিশ্বাস হলো নবীগণ গোনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। মাওলানা মওদূদী এ আকীদার সমর্থক নন। সুতরাং তিনি এবং তাঁর দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারিজ।"

প্রকৃত বিষয়ের তাৎপর্য স্ববিস্তারে আলোচনা করার আগে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমদের ইল্‌মী বিশ্লেষণের আলোকে নবীদের নিষ্পাপ হওয়া প্রসংগটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করা করা জরুরী মনে করি। তারপর এ আলোকেই দেখা যাবে যে, তাফহীমাতের উল্লেখিত বাক্যে এমন কোনো নতুন বিষয় আছে কিনা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসৃত মত ও পথের বিরোধী। অথবা আজ পর্যন্ত সমগ্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত যা স্বীকার করে আসছেন হুবহু সেটাই তাফহীমাতের বাক্যে পেশ করা হয়েছে কিনা।

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

নবী-রাসূলগণ মাসুম বা নিষ্পাপ-নিষ্কলংক। নিষ্পাপ-নিষ্কলংক হওয়া তাদের বিশেষ গুণ। তাদের এ গুণের মধ্যে অন্য কোনো মানুষ শরীক নেই একথার ওপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সম্পূর্ণ একমত। এ ব্যাপারে তাদের দ্বিমত নেই। বরং একমাত্র নবী-রাসূলগণই নিষ্পাপ হওয়া এ গুণটি যে একান্তভাবেই নবীদের এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

তবে নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাখ্যাদানে তাঁরা একমত নয়। অর্থাৎ যেসব বস্তু দ্বারা নবীদের নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হয় সেগুলো সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। মাসয়ালাটির তাৎপর্য সহজে বুঝার জন্যে নবীদের

www.pathagar.com

নিষ্পাপ হওয়ার সাথে সম্ভাব্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশদ উল্লেখ করা প্রয়োজন। এভাবে বিষয়টির সব অংশের পূর্ণ ব্যাখ্যা অবহিত হওয়া যাবে এবং প্রতিটি অংশের পৃথক পৃথক হুকুমও জানা যাবে।

নিষ্পাপ হওয়া দু' প্রকার

যেসব জিনিসের সাথে নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কিত সেগুলো দু' ভাগে বিভক্ত। এক ঃ গোনাহ এবং দুই ঃ ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি। সুতরাং সেই হিসাবে ইসমত বা নিষ্পাপিতাও দু' ভাগে বিভাজ্য। এক ধরনের ইসমত হলো গোনাহ ও পাপ থেকে আর দ্বিতীয় প্রকার ইসমত হলো যাল্লাত বা ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে। নীচে এ দু'টি বিষয় সম্পর্কে যথাক্রমে আলোচনা পেশ করা হলো।

গোনাহ থেকে নিষ্পাপ হওয়া

উপরোল্লেখিত দু' প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকার হলো "গোনাহ ও পাপ থেকে পবিত্র থাকা।" পাপ-পংকিলতার বিভিন্নতা ও পার্থক্যের দরুন প্রথম প্রকারটিও যেহেতু এমন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় যা আহকামের নিরিখে একটি অপরটি থেকে ভিন্নতর। অতএব নীচে আমরা সেগুলোর হুকুমসহ পৃথক করে উল্লেখ করছি।

মিথ্যা ও কুফর থেকে পবিত্র থাকা

গবেষক আলেমগণ এ বিষয়ে তাদের গ্রন্থাবলীতে যেসব সারগর্ভ আলোচনা করেছেন তাতে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের' যে অভিমত জ্ঞাত হওয়া যায় তাহলো নবীগণ নবুয়াত প্রাপ্তির পর মিথ্যা ও কুফরী থেকে সর্বসম্মত মতে পবিত্র। তাঁরা ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিংবা ভুলক্রমে কখনো এরূপ গোনাহ করেননি। অর্থাৎ নবীগণ নবুয়াত ও রিসালাতের পদমর্যাদায় একবার অধিষ্ঠিত হয়ে গেলে তারপর কোনো অবস্থাতেই তাদের দ্বারা কুফরী কাজ হতে পারে না। দীনের তাবলীগে অথবা অন্যান্য ব্যাপারে তাদের মিথ্যা কথা বলাও অসম্ভব। নবীদের জন্যে এ ধরনের পবিত্রতা গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কাছে সর্ব সম্মতভাবে স্বীকৃত ও প্রমাণিত। কোনো আলেমই এতে দ্বিমত পোষণ করেননি।

কুফরী ও মিথ্যা ছাড়া কবীরা ও সগীরা সব ধরনের গোনাহ প্রসংগে বিজ্ঞ আলেমগণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ইচ্ছাপূর্বক সমস্ত কবীরা গোনাহ করা থেকে পবিত্র

কুফরী ও মিথ্যা ছাড়া আরো যেসব কবীরা গোনাহ রয়েছে সে সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমদের অভিমত হলো ইচ্ছাকৃতভাবে নবীগণ এসব গোনাহ করা

www.pathagar.com

থেকেও পবিত্র। তাঁদের দ্বারা এসব কবীরা গোনাহও ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সংগঠিত হওয়া সম্ভব নয়। বরঞ্চ কুফরী ও মিথ্যার ন্যায় এ থেকেও তাঁরা পূতঃপবিত্র। আল্লামা সাইয়েদ আলুসী فَعَصَى اَرَهٗ رَبَّهٗ فَغَوٰى আয়াতের তাফসীরে আদম আলাইহিস সালামের গোনাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

ظاهر الاية يدل على ان ماوقع منه كان من الكبائر وهو المفهوم من كلام الامام - فان كان صدوره بعد البعثة تعمداً من عيرنسيان ولا تاويل اشكل على ما اتفق عليه المحققون من الائمة المتقنين من وجوبب عصمة الانباء بعد البعثة عن صدور مثل ذالك منهم على ذالك الوجه - (روح المعانى ج ١٦ ص ٢٧٤)

"আদম আলাইহিস সালাম দ্বারা যা সংগঠিত হয়েছিলো তা ছিলো কবীরা গোনাহ একথা আয়াত দ্বারা আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়। একথা ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উক্তি দ্বারাও বুঝা যায়। যদি এর গোনাহ নবুয়াত প্রাপ্তির পর ভুল এবং তাবিল ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে হয়ে থাকে, তাহলে গবেষক আলেম ও চিন্তাবিদ ইমামগণের জন্যে একথা মেনে নেয়া দুষ্কর হবে। কারণ, নবুয়াত প্রাপ্তির পর নবীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গোনাহ থেকে পবিত্র এবং এ ধরনের কীবরা গোনাহ থেকে তাঁদের পবিত্র থাকা ওয়াজিব ও জরুরী।"

আল্লামা সাইয়েদ আলুসী তাঁর নিজের ভাষায় বিজ্ঞ আলেম ও আইন রচয়িতা ইমামদের অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে নবুয়াত প্রাপ্তির পর নবীগণ ইচ্ছাপূর্বক কবীরা গোনাহ করতে পারে না এবং তাঁরা এমন গোনাহ থেকে অবশ্যই পবিত্র। এ বিষয়ে তাঁরা সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

নবীগণ ভুলক্রমে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে পবিত্র

নবীগণ কর্তৃক ভুলক্রমে কবীরা গোনাহ হওয়া প্রসংগে যদিও আলেমগণ মতবিরোধ করেছেন তবুও এ ধরনের গোনাহ থেকেও তাঁরা পাক-পবিত্র এ মতই স্বতঃসিদ্ধ। যদিও অধিকাংশ আলেমদের মতে নবীগণ ভুলক্রমে কবীরা গোনাহ করা থেকে পবিত্র নয় এ ব্যাপারে আল্লামা আলুসী স্বীয় গবেষণা এভাবে পেশ করেছেন ঃ

وان كان صدوره بعد البعثة سهواً اشكل ايضاً عند بعض دون بعض فقد قال عضد الملة فى المواقف ان الا كثرين جوزوا صدور الكبيرة

ماعدا الكفر والكذب سهوا وعلى سبيل الخطأ منهم وقال العلامة الشريف المختار خلافه اهـ (ج ١٦ ص ٢٧٤)

"নবুয়াত প্রাপ্তির পরও যদি আদম আলাইহিস সালাম দ্বারা ভুলক্রমে এ গোনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে তথাপি কারো কাছে এটা জটিল ও দুরূহ ব্যাপার। কেননা 'মাওয়াকিফ' গ্রন্থে ইজদুল মিল্লাহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছিলো যে, কুফরী ও মিথ্যা ছাড়া অন্যান্য কবীরা গোনাহ ভুলক্রমে নবীগণ কর্তৃক সংঘটিত হওয়া যদিও অধিকাংশের মতে সম্ভব তবুও তাঁদের দ্বারা এ ধরনের গোনাহ নাজায়েয হওয়ার অভিমতকে মীর সাইয়েদ শরীফ গৃহীত ও স্বীকৃত বলে ঘোষণা করেছেন।"

অধিকাংশ আলেমের মতে নবী-রাসূলগণ কুফরী ও মিথ্যা ছাড়া অন্যান্য কবীরা গোনাহে ভুলক্রমে লিপ্ত হতে পারেন। আল্লামা আলুসী মাওয়াকিফের উদ্ধৃতি দিয়ে এখানে একথা ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য মীর সাইয়েদ শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে গৃহীত ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের গোনাহও তাঁদের দ্বারা সংঘটিত হওয়া জায়েয নয়।

(টীকা ঃ) ভুলক্রমে নবীগণ কর্তৃক কবীরা গোনাহ হয়ে যাওয়া অধিকাংশ আলেমের মতে জায়েয ও স্বীকৃত। এ বিষয়টি এ বাক্য দ্বারা দিবালোকের মতো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। মীর সাইয়েদ রাহমাতুল্লাহর সনদ যদিও এ মতকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অভিমতের বিরোধী বলে ঘোষণা করেছেন। তথাপি আলেমদের এ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে কেউ শুধুমাত্র তাঁদের এ আকীদা (ভুলক্রমে নবীগণের কবীরা গোনাহ করা জায়েয এবং এ ধরনের গোনাহ থেকে তাঁরা পবিত্র নয়) পোষণ করার কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারিজ হিসেবে গণ্য করেনি। তবে পরিতাপের বিষয় হলো, আজকের দুর্ভাগ্য যুগে নিছক ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কেন্দ্র করে একে অপরকে ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ করে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। আরো মজার ব্যাপার হলো, একেই দীনের সর্বোত্তম খেদমত বলে মনে করা হয় ঃ

فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة
وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم

"যদি তুমি না জানো তবে এ না জানাটা একটা মুসিবত, আর যদি জানো তাহলে সেটা সবচেয়ে বড় মুসিবত হয়ে দাঁড়ায়।"

সগীরাহ বা ছোট ছোট গোনাহ থেকে পবিত্র হওয়া

আগেকার সবিস্তার আলোচনাটা ছিলো কবীরা গোনাহ থেকে পবিত্র থাকা প্রসংগে। এখনকার প্রসংগ সগীরা গোনাহ। সগীরা গোনাহের ব্যাপারটা কবীরা

www.pathagar.com

গোনাহ থেকে কিছুটা ভিন্নতর। নবীগণ অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলক্রমে সগীরা গোনাহের কাজ করতে পারেন বলে ইমাম ও মুজতাহিদগণ সর্বসম্মত রায় দিয়েছেন। তবে বিজ্ঞ আলেমদের মতে এমনটি হয়ে থাকলে তাঁদেরকে আল্লাহর তরফ থেকে অবশ্যই সতর্ক করে দেয়া হয়। তাঁদেরকে বলে দেয়া হয়, আপনার দ্বারা যা কিছু হয়ে গেছে তা ভুল ও ক্রটি-বিচ্যুতির পর্যায়ে পড়ে এবং তা কোনোক্রমেই অনুসরণ যোগ্য নয়। এভাবে সতর্কীকরণের উদ্দেশ্য হলো, গোটা উম্মত যেন এমন কাজে নবীকে অনুসরণ না করে যা অনুসরণ যোগ্য নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে নবীদের সগীরাহ গোনাহ করা সম্পর্কে যদিও মতপার্থক্য রয়েছে তথাপি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে ইচ্ছাপূর্বক নবীগণ কর্তৃক সগীরাহ গোনাহও হওয়া সম্ভব তবে তা কখনো নীচু পর্যায়ের হবে না। আল্লামা আলুসী এ প্রসঙ্গে নিজের অভিমত এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

وذهب كثير الى ان ماوقع من ادم صغيرة والاهر عليه هيِّن۔ فان الصغائر الغير المشعرة بالخسة يجوز صدورها منهم عمدا بعد البعثه عند الجمهور على ما ذكره العلامة الثانى فى شرح العقائد۔ ويجوز صدورها سهواً بالاتفاق لكن المحققين اشترطوا ان ينبهوا عليه فينتهوا اهـ (روح المعانى ج ١٦ ص ٢٤٧)

> "হযরত আদম আলাইহিস সালাম যা কিছু করেছিলেন অনেক আলেমের মতে তা ছিলো সগীরাহ গোনাহ। ব্যাপারটি তার জন্য সহজ ও নগণ্য এ কারণে যে, জমহুরের বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে নবুয়াত প্রাপ্তির পর নবীগণ কর্তৃক এ ধরনের সগীরা গোনাহ ইচ্ছাপূর্বক সংঘটিত হতে পারে। তবে কাজটি গর্হিত না হওয়া চাই। আল্লামা তাফতাযানী শরহে আকায়েদে নসফীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ভুলক্রমে সগীরা গোনাহ হয়ে যাওয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। তবে এ বিষয় বিশেষজ্ঞদের মতে নবীদেরকে তাঁদের সে কাজ সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে অভিহিত করা জরুরী।"

অর্থাৎ নবীদের জীবন যেহেতু তাদের উম্মাতের জন্যে উত্তম আদর্শের মর্যাদা রাখে। সুতরাং সগীরা গোনাহ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে সতর্ক করা দরকার। যাতে নবীদের ভুলক্রমকৃত কার্যাবলী উম্মতের জন্যে অত্যাবশ্যকভাবে অনুসরণীয় না হয়ে দাঁড়ায়।

উপরোল্লেখিত বাক্যের সারমর্ম

উপরোক্ত বাক্যে আল্লামা সাইয়েদ আলুসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সগীরা গোনাহ সম্পর্কে উলামাদের যে অভিমত বর্ণনা করেছেন তার সারকথা হলো ঃ

www.pathagar.com

নীচু ও নগণ্য ধরনের কাজ না হলে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ছোটখাটো গোনাহের কাজে লিপ্ত হতে পারেন, এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। কেউ এটাকে জায়েয মনে করেন না। তবে জমহুরদের মতে এটা জায়েয এবং নিষ্পাপ হওয়ার জন্যে কোনো অন্তরায় নয়। অনিচ্ছা ও ভুলক্রমে সগীরা গোনাহ হয়ে যাওয়া সর্বসম্মতিতে জায়েয। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। তবে বিজ্ঞ আলেমদের মতে নবীদের দ্বারা সগীরা গোনাহ হয়ে গেলে সে বিষয়ে আল্লাহর তরফ থেকে সতর্কবাণী পাওয়া জরুরী। যাতে উম্মতগণ নবীদের ভুল ও অনিচ্ছাকৃত কাজকে অনুসরণ করা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। আলোচনার সূচনায় (ইসমত) নিষ্পাপ হওয়াকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ঃ গোনাহ থেকে পবিত্র থাকা, দুই ঃ পদস্খলন ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র থাকা। এ পর্যন্ত 'গোনাহ থেকে পবিত্র থাকা' নামে ইসমতের প্রথম প্রকার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এবার ইসমতের দ্বিতীয় প্রকার পদস্খলন থেকে পবিত্র থাকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হচ্ছে।

এ প্রসংগে স্বনামধন্য আলেমদের রচিত কিতাবে বিস্তারিত যে আলোচনা পাওয়া যায় তা আমরা নিম্নে প্রদান করলাম।

পদস্খলন থেকে পবিত্র থাকা

যাল্লাত একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ পদস্খলন যা ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি। নবীদের পদস্খলন থেকে পবিত্র থাকা সম্পর্কে বিজ্ঞ উলামাগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমতের যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সারমর্ম নীচে দেয়া হলো ঃ

নবীগণ 'যাল্লাত' বা পদস্খলন থেকে নিরাপদ ও পবিত্র নয় এ বিষয়ে প্রায় সমগ্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত একমত। তাঁদের যে পদস্খলন হতে পারে শুধু তাই নয় বরং কার্যাবলীতে বিদ্যমান। এটা এমন একটা সিদ্ধান্ত বা বিষয় যে সম্পর্কে সমগ্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ঐকমত্য পোষণ করেন। এতে কেউ দ্বিমত করেছেন বলে উল্লেখ নেই। এ ব্যাপারে যদি আলেমদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য থেকে থাকে তবে সেটা শুধুমাত্র দু'টি বিষয়ে। প্রথম কথা হলো, 'যাল্লাত' শব্দটিকে কি পদস্খলন অর্থে প্রয়োগ করা হবে অথবা শালীন ভাষায় 'তরকে আফজাল' বা উত্তম বিষয়টি পরিত্যাগের পরিভাষা ব্যবহার করা হবে? দ্বিতীয় কথা হলো, এ যাল্লাত বা পদস্খলন কি সগীরাহ গোনাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত—না সগীরা গোনাহের বহির্ভূত? তবে নবীগণের কাজের মধ্যে পদস্খলন পাওয়া যায় এবং তাঁরা এমন পদস্খলন থেকে মাসুম নয়, একথার ওপর উভয় দল ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ ব্যাপারে আমি উসূলে ফিকার ২/৩জন আলেমের ব্যাখ্যার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

www.pathagar.com

উসূলবিদদের ব্যাখ্যাসমূহ

ফিকাহ্ শাস্ত্রের উসূলবিদদের রচিত গ্রন্থাবলীতে নবীদের ক্রটির ব্যাপারে এ ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায় যে, তাদের কার্যাবলীতে 'লগজল' বা ক্রটি থাকতে পারে এবং তাঁরা এ ক্রটির ক্ষেত্রে মাসুম নন। আল্লামা আবদুল আযিয বুখারী স্বরচিত প্রসিদ্ধ কিতাব 'সাইয়াতুত তাহকিক শরহুল হুস্যামীতে' সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিখছেন ঃ

انهم عصموا من الكبائر عند عامة العلماء والمسلمين ومن الصغائر عند اصحابنا خلافا لبعض الاشاعره وان لم يعصموا من الزلات - اهـ (ج ١ ص ١٩٨)

"সকল আলেম ও মুসলমানদের মতে নবী আলাইহিস সালামগণ কবীরা গোনাহ থেকে মাসুম ও নিরাপদ। এমনিভাবে আমাদের (হানাফী) ইমামদের মতে তাঁরা সগীরাহ গোনাহ থেকেও মাসুম। তবে কোনো কোনো আশয়ারী আলেম এ মতের বিরোধী। তবে তারা যাল্লাত বা ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে মাসুম বা পবিত্র নন।"-(খঃ ১ পৃঃ ১৯৮)

যেহেতু বিজ্ঞ আলেমদের মতে নবীদের ক্রটির ব্যাপারে সতর্কবাণী পাওয়া জরুরী। সুতরাং আল্লামা আবদুল আযিয বুখারী এ ব্যাখ্যাও প্রদান করেন যে ঃ

والزلة لاتخلوا عن قتران ببيان انها زلة اما عن الفاعل كقوله تعالى اخبارا عن موسى عليه السلام حين وكزا القبطى فقتله - هذا من عمل الشيطن - اومن الله تعالى كما قال عز وجل - وعصى ادم ربه فغوى اهـ (ص ١٩٨)

"নবীগণ কর্তৃক ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে সে সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে সতর্কবাণী অবশ্যই থাকতে হবে যে, এটা ক্রটি বা প্রমাদমূলক কাজ। এটি খোদ বিচ্যুতির শিকার নবীর পক্ষ থেকেও হতে পারে, যেমন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কিবতীকে হত্যা করার সময় নিজেই বললেন যে, এটা শয়তানের কাজ কিংবা এর উল্লেখ আল্লাহর তরফ থেকে হতে হবে। যেমন—'আদম আলাইহিস সালাম গোনাহ করলো সুতরাং সে গোনাহগার হয়ে গেলো। আদম আলাইহিস সালামের বিচ্যুতির উল্লেখ আল্লাহ তায়ালা এভাবে করলেন।"

নবীদের কার্যাবলীতে ক্রটি-বিচ্যুতি পাওয়া যায় এবং তারা এ থেকে পবিত্র নয়, একথা দরসে নিযামীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল হুস্যামীতে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে লেখা আছে ঃ

www.pathagar.com

وفيها قسم اخر وهو الزلة ولا يخلو عن الاقتران ببيان انها زلة-١هـ)

"নবীদের কাজের এক ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। তবে কাজটি যে ভ্রমাত্মক এ বিশ্লেষণ অবশ্যই থাকবে।"

নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কার্যাবলী সম্পর্কে সদরুশ শরীয়াহ্ বলেন ঃ

فمنها ما يقتدى به وهو مباح وواجب وفرض وغير المقدى به اما مخصوص به وامازله ١ هـ (التوضيح)

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসব কাজ অনুসরণযোগ্য সেগুলো ফরয, ওয়াযিব ও মুবাহ্র অন্তর্ভুক্ত। আবার যেসব কাজ অনুসরণযোগ্য নয়, সেগুলো নবীর নিজের জন্যে নির্দিষ্ট অথবা সংঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতি।"-(আত তাওজীহ)

উপরে কতিপয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা হলো। উসূলে ফিকাহের বিরাটকায় গ্রন্থগুলো এ ধরনের বিস্তারিত বর্ণনায় ভরপুর। আপনি যে কোনো গ্রন্থের পাতা উল্টাতেই এ ধরনের ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন। নবী আলাইহিস সালামদের কার্যাবলীতে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে বলে সবাই সর্বসম্মত মতে স্বীকার করেছেন এবং তারা ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত নন। এ বিষয়টি এসব গ্রন্থের মাধ্যমে আপনার কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে এসব ত্রুটিকে যাল্লাত বলা জায়েয কিনা কিংবা আদবের কারণে উত্তম বিষয় পরিত্যাগ করা বলা হবে কিনা এ প্রশ্ন থেকে যায়। অধিকন্তু এসব বিচ্যুতি সগীরাহ গোনাহ কিনা সে প্রশ্নও আসে। এ বিষয়ে জানার জন্য আলেমদের নিম্নবর্ণিত অভিমতগুলো পাঠ করুন।

ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে 'যাল্লাত' শব্দের প্রয়োগ

এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। বোখারার আলেমগণ এটিকে জায়েয বলে স্বীকার করেছেন। সমরকন্দের আলেমগণ নবীদের ত্রুটির ক্ষেত্রে উত্তম বিষয় পরিত্যাগ পরিভাষা ব্যবহারের কথা বলেছেন। 'মাদাবেকুত তাস্যিল' গ্রন্থের রচয়িতা فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন ঃ

وهذا دليل على انه يجوز اطلاف اسم الزلة على افعال الانبياء عليهم كما قال مشايخ بخارى-

www.pathagar.com

"নবীদের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে 'যাল্লাত' বা ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি শব্দের ব্যবহার যে জায়েয এ আয়াতটি তারই প্রমাণ। বোখারার আলেমগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।"

وقال مشائخ سمر قند لاتطلق اسم الزلة على افعالهم كما لاتطلق المعصية وانما يقال فعلوا الفاضل وتركوا الافضل فعوتبوا عليه - ١هـ (ج ا ص ١٠٦)

তবে "সমরকন্দের আলেমগণ বলেন, নবীদের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে 'যাল্লাত' শব্দ প্রয়োগ করা জায়েয নয় তেমন তাঁদের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে গোনাহ শব্দের ব্যবহারও জায়েয নয়। বরং তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বলা যাবে যে, তাঁরা উত্তম কাজটি না করে জায়েয কাজটি করেছেন, তাই তাঁদেরকে আল্লাহর তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হয়েছে।"

ব্যাখ্যা ঃ সমরকন্দ ও বোখারার আলেমদের মধ্যে বিরাজমান মতবিরোধ শুধুমাত্র শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবে নবীদের কার্যাবলীতে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে এবং এ থেকে তাঁরা মাসুম নয় এ ব্যাপারটা কেউই অস্বীকার করেন না। মাদারিক রচয়িতার ভাষ্যে বুঝা যায় যে, উভয় মতের মধ্যে বোখারার আলেমদের মতটি অগ্রগণ্য। فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ আয়াতটি অগ্রাধিকার দেয়ার দলীল। কেননা আয়াতে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামের ত্রুটিকে 'যাল্লাত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'মাদারিক' রচয়িতাও এ মত পোষণ করেন বলে মনে হয়।

'যাল্লাত' বা ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি সগীরাহ গোনাহের অন্তর্ভুক্ত কিনা ?

ত্রুটির ক্ষেত্রে 'যাল্লাত' শব্দের প্রয়োগ নিয়ে আলেমদের মধ্যে যেভাবে মতপার্থক্য আছে তেমনি ত্রুটি-বিচ্যুতি সগীরাহ গোনাহের অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নিয়েও আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কিছুসংখ্যক আলেমের মতে নবী-রাসূলদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সগীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। তবে নবীগণ যেহেতু ইচ্ছাকৃতভাবে এ ভুল করেন না সুতরাং নবীদের মাসুম হওয়ার ব্যাপারে তা কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে না। সদরুশ শরীয়াও একই মত পোষণ করেন। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-তাওদীহ'-এ 'যাল্লাত' শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

وهو فعل من الصغائر يفعله من غير قصد ولا بدان ينبه عليه ١هـ (توضيح)

www.pathagar.com

"ক্রটি-বিচ্যুতি সগীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত যা সংকল্প ও ইচ্ছা ছাড়াই সংগটিত হয়। তবে এ ভুলের জন্য সতর্ক বাণী থাকবেই।".

সদরুশ শরীয়াও কি আহলে সুন্নাত দলের বহির্ভূত ?

গভীরভাবে দেখলে প্রতীয়মান হবে যে, নবীদের কার্যাবলীতে যে ছোটখাটো ক্রটি-বিচ্যুতি পাওয়া যায় তা সদরুশ শরীয়া তাঁর পূর্বোদ্ধৃত বাক্যে বিশ্লেষণ করেছেন। এখন এ বাক্যে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ছোটখাটো ক্রটিও সগীরা গোনাহের অন্তর্গত। এ দু'টি বাক্য এক সংগে মিলিয়ে পড়লে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে তাহলো সদরুশ শরীয়ার মতে নবী-রাসূলগণ কর্তৃক সগীরা গোনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভব এবং এ ক্ষেত্রে তাঁরা মাসুম নন।

অথচ সদরুশ শরীয়া নিজে হানাফী এবং হানাফী মতাবলম্বীদের অন্তর্ভুক্ত। নবীগণ সগীরা থেকেও মাসুম বা পবিত্র হানাফী মযহাবের এ রায় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'গায়াতুত তাহকীক' গ্রন্থের পূর্বোক্ত বাক্যে এ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সদরুশ শরীয়ার মতে নবীগণ সগীরাহ গোনাহ থেকে মুক্ত নন শুধু এ মত পোষণের পরিপ্রেক্ষিতে কি আমরা তাঁকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারিজ মনে করবো ? এখন যদি সদরুশ শরীয়াতের বিরুদ্ধে কারো ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকে অথবা দলীয় পক্ষপাত ও গোড়ামীর কারণে মনের মধ্যে তার বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করে তাহলে সে সদরুশ শরীয়াত থেকে অতি সহজে একথা বলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে বের করে দিতে পারে যে, তিনি ছোটখাটো ক্রটি-বিচ্যুতিকে সগীরা গোনাহ হিসেবে গণ্য করে নবীদের দ্বারা তা সংঘটিত হতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন। আর এরূপ করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইসমত সম্পর্কীয় স্বীকৃতি ও গৃহীত অভিমতের বিরোধী কাজ করেছেন। অতএব সদরুশ শরীয়াতও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারিজ। এ ধরনের আকীদা হানাফী আলেমরাও পোষণ করেন না। সুতরাং তিনি হানাফী হওয়া থেকেও খারিজ হয়ে গেছেন।

বরং আমি এতটুকু বলতে পারি যে, সদরুশ শরীয়ার বাক্য মাওলানা মওদূদীর তাফহীমাতে লিখিত বাক্য থেকে অধিকতর আপত্তিকর বলে মনে হয়। সদরুশ শরীয়া ছোটখাটো ক্রটি-বিচ্যুতিকে গোনাহ স্বীকার করে নিয়ে নবীদের সাথে তা সংশ্লিষ্ট করেছেন। আর মাওলানা মওদূদী ছোটখাটো ক্রটি-বিচ্যুতিকে নবী-রাসূলদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন বটে কিন্তু সেটাকে গোনাহ স্বীকার করে নয়। যদি আমরা সদরুশ শরীয়াকে আহলে সুন্নাত দল থেকে বের করে দিতে চাই তাহলে তার এ উক্তিই সে জন্যে যথেষ্ট। অতিরিক্ত কোনো অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। তবে যেহেতু এ প্রবণতা চতুর্দশ হিজরী

www.pathagar.com

সনের সৃষ্ট এবং আগের আমলের লোকেরা এর সাথে পরিচিত ছিলো না, এ কারণে সদরুশ শরীয়াকে মাওলানা মওদূদীর মতো আহলে সুন্নাত দল থেকে বের করে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আজ পর্যন্ত কেউ চিন্তাও করেনি। বরং অন্যদিকে তার উক্তির এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যেহেতু এসব পদস্খলন বা ভ্রম সগীরাহ গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও গর্হিত বা নীচু ধরনের কোনো কাজ নয়, সুতরাং নবীদের মাসুম হওয়ার ব্যাপারে এর কোনো প্রভাবও নেই। এছাড়া নবীগণ কর্তৃক এগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয় না। অতএব পদস্খলন বা ভুল হয়ে গেলে নবীগণের নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষতায় কোনো ধরনের পার্থক্য সূচিত হয় না।

যাহোক, 'যাল্লাত' সম্পর্কে সদরুশ শরীয়ার মত হলো তা সগীরা গোনাহের তালিকাভুক্ত। অপরদিকে, অন্যান্য আলেমদের ধারণা মতে নবীদের এসব পদস্খলন বা ভ্রম মূলত গোনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এ ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি নবীদের ক্ষেত্রে গোনাহ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। সুতরাং এগুলো তাদের নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। বরং এর তাৎপর্য হলো তাঁদের একটি সর্বোত্তম কাজ পরিত্যাগ করে একটি শুধুমাত্র ভালো বা জায়েয কাজ করা, নেক কাজের পরিবর্তে বদ কাজ না করা। সদরুশ শরীয়া ঐসব আলেমদের অভিমত এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وذكر بعض العلماء ان زلة الانبياء هى الزل من الا فضل الى الفاضل ومن الا صوب الى الصواب لاعن الحق الى الباطل ومن الطاعة الى المعصية - اهـ

"কিছুসংখ্যক আলেম উল্লেখ করেছেন যে, নবীদের পদস্খলন বা ভ্রম হলো কোনো অধিকতর উত্তম কাজ পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র ভালো এবং জায়েয কাজ করা। সত্য ও আনুগত্যের স্থলে অসত্য ও অবাধ্য হওয়া নয়।"

এটি শাসমুল আয়েম্মা সারাখসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তালবীহ নামক গ্রন্থেও এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। নবীগণের পদস্খলন বা ভ্রম গোনাহের মধ্যে শামিল নয়। বরং সর্বোত্তমকে বাদ দিয়ে শুধু ভালোকে গ্রহণ করা আল্লামা সারাখসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং তাঁর সমমনা আলেমদের এ দাবী প্রমাণ করার জন্যে তারা দলীল পেশ করে বলেছেন যে, কোনো কাজ গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে তিনটি জিনিস থাকতে হবে। এক ঃ কাজটিই হারাম হওয়া। দুই ঃ হারাম জেনেও কাজটি করা। তিন ঃ কাজটি করার ইচ্ছা ও নিয়ত থাকা। এ তিনটি জিনিস একত্রিত হয়ে কোনো কাজকে গোনাহের কাজ বানিয়ে দেয়। বিষয়টি অন্য ভাষায়

www.pathagar.com

এভাবে বলা যায়। যে কাজ মূলত হারাম এবং হারাম জেনে শুনেই ইচ্ছাপূর্বক করা হয় এমন সব কাজই গোনাহ ও নাফরমানী। এছাড়া কোনো কাজ গোনাহ বা নাফরমানী কাজ নয়। 'যাল্লাত' বা পদস্খলন মূলত ইচ্ছাও থাকে না নিয়তও থাকে না। সুতরাং এমন ধরনের কাজ গোনাহ বা নাফরমানী হতে পারে না। নিম্নেবর্ণিত কথাটিই এর দলীল ঃ

قال السرخسي اما الزلة فلا يوجد فيها القصد الى اصل الفعل واما المعصية فهى فعل حرام يقصد الى عينه مع العلم بحرمة ١ هـ (تلويح)

"ইমাম সারাখসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন ঃ 'যাল্লাত' বা পদস্খলনে মূল কাজটি করার ইচ্ছা বর্তমান থাকে না। অথচ গোনাহ হলো এমন হারাম কাজ যা হারাম জেনেই ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়।"

মোদ্দাকথা

উসূলে ফিকাহের আলেমদের উপরোল্লেখিত বিশ্লেষণে এ সত্য সুস্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, নবীদের কার্যাবলীতে পদস্খলন বা ছোটখাটো ভুল-ক্রটি আছে বলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে এ ধরনের ভুল বা পদস্খলনের দরুন আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের দৃষ্টিতে স্বীকৃতি নবীদের 'ইসমত' বা নিষ্পাপ হওয়ার ক্ষেত্রে কণামাত্র পার্থক্য সূচিত হয় না।

উপরোল্লেখিত আলোচনার সারমর্ম

এ বিষয়টির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উপরে যাকিছু আলোচনা করা হয়েছে তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ (আগামীতে আমাদেরকে এ আলোচনার আলোকে আমরা তাফহীমাতের ভাষ্য এবং সে সম্পর্কে কতিপয় বুর্যগের সমালোচনার মূল্যায়ণ করবো।)

এক ঃ নবীগণ নিসন্দেহে মাসুম, বা নিষ্পাপ ও নিষ্কলংক। আহলে সুন্নাত কর্তৃক নবীদের যে 'ইসমত' বা পবিত্রতা স্বীকৃত তাহলো গোনাহ থেকে 'ইসমত' বা পবিত্রতা ছোটখাটো ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে নয়।

দুই ঃ আম্বিয়ায়ে কেরামগণ কুফরী ও মিথ্যায় লিপ্ত হওয়ার গোনাহ থেকে সর্বসম্মত মতে মাসুম। ইচ্ছা-অনিচ্ছা কোনোভাবে এ গোনাহ করতে পারেন না। ইচ্ছাপূর্বক অন্যান্য কবীরাহ গোনাহ থেকেও তারা সর্বসম্মতিক্রমে মাসুম। ভুলক্রমে তাঁদের কবীরাহ গোনাহ করার ব্যাপারে যদিও মতবিরোধ আছে তথাপি স্বীকৃত মতানুযায়ী তাঁরা ভুলক্রমেও কবীরা গোনাহ করা থেকে পবিত্র। 'আল্লামা শরীফ" এ মতের সমর্থন করে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

www.pathagar.com

তিন ঃ যদি অনিচ্ছা ও ভুলক্রমে সগীরা গোনাহ্ সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে তা সংঘটিত হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। এ ধরনের সগীরা গোনাহ্ থেকে তাঁরা সর্বসম্মত মতে মাসুম নন। জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার মতে নবীদের ইচ্ছাপূর্বক সগীরা গোনাহ করার বিষয়ও জায়েয। তবে শর্ত হলো কাজটির নীচু ও নগণ্য না হওয়া। শরহে আকায়েদে আল্লামা সা'দ উদ্দীন তাফসানী এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন।

চার ঃ নবীগণ কর্তৃক 'যাল্লাত' বা পদস্খলন কিংবা ছোটখাটো ক্রটি-বিচ্যুতি হওয়া শুধু যে সম্ভব তাই নয় বরং নবীগণের কর্যাবলীতে তার প্রমাণও বিদ্যমান। এ ধরনের ভুল বা ক্রটি থেকে তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে মাসুম নন। অবশ্য বিজ্ঞ আলেমদের মতে এরূপ ক্ষেত্রে তাঁদেরকে সতর্কবাণী পাওয়া জরুরী। যাতে ক্রটিযুক্ত কাজে উম্মতগণ নবীদেরকে অনুসরণ করা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এটাই 'ইসমতে আম্বিয়া' বা নবীদের নিষ্পাপ হওয়া বিষয়ক মাসয়ালার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। এ সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমদের রচিত গ্রন্থসমূহে বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়। তবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে সেসব বিবরণের সবকিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই এ সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

এরপর আমরা চাই, বিষয়টির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার আলোকে মাওলানা মওদূদীর তাফহীমাত গ্রন্থে উল্লেখিত বক্তব্যের সমালোচনায় শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহাম্মাদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যা বলেছেন এবং মাওলানা মওদূদী যা লিখেছেন তার মূল্যায়ন করা।

যাতে করে জানা যায় যে, উভয়ের মধ্যে কার মত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের রায়ের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। নীচে আমরা প্রথমে মাওলানা মওদূদীর বাক্যের উল্লেখ করছি, তারপর মাওলানা মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সমালোচনার উল্লেখ করবো।

তাফহীমাতের বাক্য

তাফহীমাত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় মাওলানা মওদূদী সাইয়েদুনা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কাহিনী সম্পর্কে সমকালীন আলেমদের কতিপয় ব্যাখ্যার বিবরণ দিতে গিয়ে নিজের পক্ষ থেকেও একটি ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন। সে ব্যাখ্যায় নবীদের সম্পর্কে পরোক্ষভাবে একথারও উল্লেখ হয়েছে যে,"তাদের দ্বারা কোনো কোনো পদস্খলন সংঘটিত হয়েছে।" বাক্যটি এরূপ ঃ

"তবে এসব ব্যক্তিরা সম্ভবতঃ এ বিষয়ে মোটেই ভেবে দেখেননি যে, 'ইসমত' বা দোষমুক্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে নবীদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য নয়। বরং নবুয়াতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছোটখাট ভুল-ত্রুটি এবং পদস্খলন থেকে হিফাজত করেছেন। অন্যথায় আল্লাহর হেফাজত সামান্য সময়ের জন্যেও যদি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সাধারণ মানুষের যেভাবে ভুল-ত্রুটি হয় সেভাবে নবীগণেরও ভুল-ত্রুটি হতে পারে। এটা একটা সূক্ষ্ম বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছাপূর্বক প্রত্যেক নবীর থেকেই কোনো না কোনো সময় নিজের হিফাজত উঠিয়ে নিয়ে দু' একটি পদস্খলন সংঘটিত হতে দিয়েছেন। যাতে মানুষ নবীদেরকে খোদায়ী আসনে সমাসীন মনে না করে বরং মনে করেন যে, তাঁরা মানুষ, খোদা নন।"-(২য় খণ্ড, পৃ-৪৩)

এ বাক্যকে কেন্দ্র করে রটানো হয়েছে যে, নবীগণ গোনাহ থেকে মাসুম বা মুক্ত নয়। মাওলানা মওদূদী গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত বিরোধী এমন আকীদা নবীদের সম্পর্কে পোষণ করে থাকেন। এ বাক্যটির কারণেই মাওলানা আবুল আলা মওদূদী ও তার জামায়াতকে নীচু গলায় ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ করে দেয়া হয়েছে।

বাক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ

পক্ষপাতহীন মানসিকতা নিয়ে যদি এ বাক্যটির বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয় তাহলে বিষয়বস্তুর বিচারে নিম্নবর্ণিত ৪টি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। পর্যালোচনা সহ এ চারটি বিষয় পাঠকবর্গের সামনে সংক্ষেপে পেশ করছি।

[ক] "তাফহীমাতের বাক্যে যে ইসমতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং পদস্খলন এর অর্থ নাফরমানী বা গোনাহ নয়। বরং এখানে সেটা আদৌ আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।"

পর্যালোচনা

এ দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসাবে বাক্যের পূর্বাপর ইংগিতই যথেষ্ট। তাই বাক্যের মধ্যে উল্লেখিত ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি এবং পদস্খলন শব্দই বলে দিচ্ছে এখানে আলোচ্য বিষয় এমন কিঞ্চিত ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং পদস্খলন, নাফরমানী বা গোনাহ নয়। আর পূর্বেও ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বলা হয়েছে তাই এর পূর্বের বাক্যে মাওলানা বলেছেন ঃ "মানুষ এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে শুধু মাত্র এ কারণে দ্বিধাবোধ করেছে যে, নবীদের প্রতি এ ধরনের

www.pathagar.com

ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলনের বিষয় আরোপ করা ইসমতে আম্বিয়ার বিরোধী বলে মনে হয়।"

এখানেও লগযিশ বা ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলন শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। আগে পরে উভয় ক্ষেত্রে যখন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং গোনাহ শব্দটির উল্লেখ আদৌ করা হয়নি তখন এখানে আলোচ্য বিষয় এমন গোনাহ যা 'যাল্লাত' বা ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি বা পদস্খলনের পর্যায়ে পড়ে।

খ "এ ইসমত' বা নিষ্পাপ হওয়ার গুণটি (দোষমুক্ত হওয়া) নবীদের ব্যক্তি সত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং নবুয়াত ও রিসালাতের সাথে সম্পৃক্ত।"

পর্যালোচনা

নবীদের ব্যক্তি সত্ত্বা মর্যাদা এবং নবুয়াত ও রিসালাত মর্যাদা এ উভয় মর্যাদার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি নেই যখন উভয় মর্যাদা একই কিনা এ বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া এ অংশের পর্যালোচনার জন্যে যথাযথ এবং জরুরী বলে মনে হয়।

কুরআন ও হাদীসের পথনির্দেশনা

এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস থেকে যে পথনির্দেশনা পাওয়া যায় তাহলো নবীদের পবিত্র সত্ত্বা যদিও সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এমন যোগ্যতা বৈশিষ্ট্যের ধারক যা অনান্য মানুষের মধ্যে মোটেই দেখা যায় না। তাঁরা এমন যোগ্যতা ও পূর্ণতা দ্বারা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হন যে, অন্য মানুষের জন্য তা কল্পনাও করা যায় না। এ সমস্ত মানবীয় পূর্ণতা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ছিলেন মানুষ। তাদের এ বিশেষ গুণাবলী ও যোগ্যতা বাদ দিয়ে যদি তাদেরকে বিচার করা হয় তাহলে তাঁদের মানবীয় সত্ত্বা এবং অন্যান্য মানুষের মানব সত্ত্বার মধ্যে মানবসুলভ মৌলিকতার দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য সূচিত হয়েছে তাঁদের নবুয়াত ও রিসালাতের কারণে এসব বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা একমাত্র নবীগণ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ তথা সাধারণভাবে সব মানুষের মধ্যে বর্তমান নেই।

কুরআনের একাধিক জায়গায় বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে এ সত্যটিই পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। হাদীসেও এ বিষয়ের ওপর বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ থেকে আরো জানা যায় যে, নবীদের পবিত্র সত্তায় যদিও প্রথম থেকেই সেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী যা নবুয়াত ও রিসালাতের জন্যে ভিত্তি স্বরূপ। তথাপি তাঁদের ব্যক্তি সত্তার মর্যাদা এবং নবুয়াতি ও রিসালাতের মর্যাদা দু'টি স্বতন্ত্র বিষয়। এ কারণেই নবুয়াত প্রাপ্তির আগে তাঁদেরকে কার্যত

www.pathagar.com

নবী ও রসূল বলে স্বীকার করা হয়নি যদিও তখনও তারা পরোক্ষভাবে নবুয়াত ও রিসালাতের বিশ্লেষণে বিশেষিত ছিলেন।

এ বাস্তব সত্যকে সামনে রেখে যদি আমরা তাফহীমাতের এ বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করি ঃ (এই 'ইসমত' দোষমুক্ত হওয়া নবীদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য নয় বরং নবুয়াত ও রিসালাতের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য অন্যতম) তাহলে পরিষ্কারভাবে যে অর্থ ও তাৎপর্য মানসপটে ভেসে আসে এবং এছাড়া অন্য কোনো তাৎপর্য ও অর্থ করার অবকাশ মোটেই নেই তা এই যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের পবিত্র সত্তা শত সহস্র পূর্ণতা ও লাখ লাখ গুন বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তাঁরা মানুষ। আর মানুষ স্বীয় মানবসুলভ দিক থেকে অনিবার্যভাবে ভুল ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মাসুম থাকতে পারে না। এ কারণে নবীদের সত্ত্বার সাথে 'ইসমত' (দোষমুক্ত থাকা) আবশ্যক হতে পারে না। বরং এ 'ইসমত' নবুয়াত ও রিসালাতের অবিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য হবে। এটা এমন একটি কথা যাকে সত্য বলে স্বীকার করতে কোনো মুসলমান সংকোচবোধ করতে পারে না।

দলীল

এর স্পষ্ট প্রমাণ হলো নবীগণের জীবনে সবসময়ই দু'টো অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। একটি অবস্থা নবুয়াত প্রাপ্তির আগের। এ অবস্থায় তাদেরকে বাস্তবে নবুয়াত ও রিসালাতের গুণে ভূষিত করা হয় না। দ্বিতীয় অবস্থা নবুয়াত প্রাপ্তির পরে। এ অবস্থায় তাঁরা বাস্তবের নবুয়াত ও রিসালাতের পদমর্যাদায় সমাসীন হন। তাঁদের ব্যক্তি সত্ত্বা উভয় অবস্থায় সমভাবে পাওয়া যায়। এখন 'ইসমত' যদি তাদের সত্তার জন্যে আবশ্যিক স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে 'ইসমত' উভয় অবস্থায় সমভাবে প্রমাণিত হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জরুরী হবে। কেননা নবুয়াত সত্তা উভয় অবস্থাতেই সমভাবে পাওয়া যাবে। যেখানে সত্তা থাকবে সেখানে তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ও সংশ্লিষ্ট থাকবে। অন্যথায় আবশ্যিক আর আবশ্যিক থাকে না। অথচ অধিকাংশ[১] আহলে সুন্নাতগণ নবুয়াত প্রাপ্তির আগে নবীদেরকে মাসুম বলে স্বীকার করেন না। অস্বীকারকারীদেরকে কোনো দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে বহিষ্কার করেনি। এ পরিপেক্ষিতে স্বীকার করতে হয় যে, 'ইসমত' নবীদের সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং নবুয়াত ও রিসালাতের জন্যে অপরিহার্য বিষয়।

---

১. অধিকাংশ এ জন্যে বলা হয়েছে যে, কেউ তাদেরকে নবুয়াত প্রাপ্তির আগেও মাসুম বলে স্বীকার করেন এবং এটাকে সঠিকও বলে থাকেন। ثم هذه العصمة الانبياء قبل النبوة وبعدها على الاصح মোল্লা আলী কারী প্রণীত 'শরহে ফিকহে আকবার' হয় তাহলে সাধারণ মানুষের মতে তাদের দ্বারাও ভুল-ত্রুটিও পদস্খলন হয়ে যেতে পারে।

www.pathagar.com

এটা এমন একটি সুস্পষ্ট সহজবোধ্য সত্য যা বুঝার জন্যে কোনো জ্ঞানী মানুষের কোনো প্রকার জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু জানা নেই, কোনো মহান বরং গোপন উদ্দেশ্যে বুযর্গগণ বিষয়টিকে যারপর নাই গোপনীয় ও তাত্ত্বিক করে ছেড়েছেন যার কারণে উভয় পক্ষের বলা এবং লিখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

আলেমদের সাথে বিরোধিতা ও বৈরিতা থেকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হেফাজতে ও আমানতে রাখুন। এসব ভদ্রলোকগণ যখন কারো বিরোধিতা ও শত্রুতায় কোমর বেঁধে লাগে তখন ইমাম গাযালী ও ইবনে তাইমিয়ার মতে ইমামগণও তাদের ফাসেক ও গোমরাহ হওয়ার ফতওয়া থেকে নিষ্কৃতি পান না। অধিকন্তু সহজ-সরল সুস্পষ্ট সত্যকেও তারা ইল্‌মী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু বানিয়ে সন্দেহ যুক্ত ও জটিল করে তোলেন।

বাক্যের তৃতীয় অংশ হলো ঃ

গ 'এ ইসমত' দানকৃত বস্তু। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দান করেছেন। যদি সামান্য সময়ের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালার হেফাজত তাদের থেকে উঠে যায় তবে সাধারণ মানুষের মতো তাদেরও ভুল-ক্রটি এবং পদস্খলিত হতে পারে।"

পর্যালোচনা

এ অংশটুকুকে যখন আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও দলীল-প্রমাণের আলোকে দেখি তাহলে তা অস্বীকার করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ আমরা খুঁজে পাই। কারণ, কিছুক্ষণ আগে দ্বিতীয় অংশের পর্যালোচনায় একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, 'ইসমত' নুবয়াত ও রিসালাত বিশেষ গুণ অবিচ্ছেদ্য অংশ। নবুয়াত ও রিসালাত উভয় বস্তুই আল্লাহ প্রদত্ত যা নবুয়াত প্রাপ্তির সময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবীদেরকে দান করা হয়। নবুয়াত ব্যক্তিগত ও সৃষ্টিগত বস্তু নয়। নবুয়াত যখন দানকৃত নেয়ামত হিসেবে স্বীকৃতি পেলো তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ইসমতকেও নিজস্ব আবশ্যিক বস্তুর মতো আল্লাহ কর্তৃক দানকৃত বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকার করা হবে না কেন? কুরআন শরীফও এ সত্যের দিকে ইংগিত করেছে।

وَلَوْ لَآاَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلاًۙ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا (بنى اسرائيل : ٧٤-٧٥)

"আর আমরা যদি তোমাকে মযবুত না রাখতাম তাহলে অসম্ভব ছিলো না যে, তুমি তাদের প্রতি কিছু না কিছু ঝুঁকে পড়তে। কিন্তু যদি তুমি এরূপ

www.pathagar.com

করতে তাহলে আমরা তোমাকে দুনিয়ায়ও দ্বিবিধ আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতাম এবং আখেরাতেও দ্বিবিধ আযাব দিতাম তারপর আমার মুকাবিলায় তুমি কোনো সাহায্যকারী পেতে না।-(বনী ইসরাঈল ঃ ৭৪-৭৫)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ط

"যদি তোমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ না হতো এবং তাঁর রহমত তোমার কল্যাণে শামিল না হতো তাহলে তাদের মধ্য হতে একটি দল তোমাকে ভুলের মধ্যে প্রায় নিমজ্জিত করেই ফেলেছিলো।"(সূরা আন নিসা ঃ ১১৩)

তবে আল্লাহ্ তায়ালাই নিজ অনুগ্রহে রাসূলকে ভুলে নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন এবং নবীদেরকে ভুল ইচ্ছা পূরণ হতে দেননি। কুরআনে এ ধরনের অনেক আয়াত আছে যাদ্বারা এ তত্ত্ব দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, নবীদেরকে আল্লাহ তায়ালাই মাসুম ও নিরাপদ রেখেছেন। যদি সামান্য সময়ের জন্যে আল্লাহর হেফাজত উঠে যায় তাহলে তাদের ভুল বা স্খলন হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তাছাড়া বিশেষজ্ঞ আলেমগণ নিজেদের রচিত কিতাবে এ বিশ্লেষণও করেছেন যে, নবীদের 'ইসমত' (দোষমুক্ত থাকা) তাদের ব্যক্তিগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নয় যে, তাদের সত্ত্বা থেকে কোনো সময়ই ছিন্ন হতে পারে না। বরং এটা আল্লাহর দেয়া নেয়ামত যা নবুয়াত প্রাপ্তির পর নবীগণ পেয়ে থাকে। আল্লামা সাইয়েদ আলুসী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি রূহুল মায়ানীর ১৩শ খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় وَاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

والمراد هـهنا طلب الثبات والدوام على التوحيد والعبد عن عبادة الاصنام والافا لانبياء معصومون عن الكفر وعن عبادة غير الله اهـ

"এখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ দোয়া করার উদ্দেশ্য হলো তাওহীদের ওপর মযবুত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকা এবং মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাকার প্রার্থনা করা অন্যথায় নবীগণ কুফর ও গাইরুল্লাহর ইবাদাত করা থেকে সত্যিই পাক পবিত্র মাসুম।"

একটি অভিযোগ ও তার জবাব

আয়াতের উল্লেখিত তাফসীর ও ব্যাখ্যার ওপর ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তারপর নিজের পক্ষ থেকে তার একটি জবাবও দিয়েছেন। আল্লামা আলুসী প্রশ্ন ও জবাব উভয়ই এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

www.pathagar.com

واعترض عليه الامام بانه لما كان من المعلوم انه سبحانه وتعالى يثبت الانبياء على الاحتناب فما الفائده فى سواك التثبيت ؟

"ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ ব্যাখ্যার উপর অভিযোগ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা নবীদেরকে শিরক থেকে বাঁচিয়ে তাওহীদের ওপর দৃঢ় রাখেন একথা যখন জানা তখন সে বিষয়ের জন্যে দোয়া করার ফায়দা কি হতে পারে ?"

ثم قال والصحيح عندى فى الجواب انه وان كان يعلم ان اللّه يعصمه عن عبادة الاصنام الا انه ذكر ذالك هضما لنفسه واظهارً اللحاجة والفاقة الى فضل اللّه عز وجل فى كل المطالب ـ ١هـ

"তারপর তিনি বলেছেন ঃ আমার মতে এর সঠিক জবাব হলো— ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যদিও জানা ছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে মূর্তি পূজা থেকে হিফাজত করবেন, তবুও তিনি মনের বিনয় এবং সমস্ত উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে সদাসর্বদা তাঁর অনুগ্রহ লাভের একান্ত মুখাপেক্ষী একথা প্রকাশ করার নিমিত্তে ইসমতের দোয়া করেছেন।"

এ প্রশ্ন এবং জবাব উভয়ই ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এরপর আল্লামা সাইয়েদ আলুসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ অভিযোগের জবাব এভাবে দিয়েছেন ঃ

والجواب الصحيح عندى ما قيل ان عصمة الانبياء ليس لامر طبيعى فيهم بل بمحض توفيق اللّه تعالى اياهم وتفضله عليهم ولذالك صح طلبها ـ ١هـ (ج ١٣ ص ٢٣٤)

"আমার মতে অন্যসব আলেমগণের জবাব সঠিক। অর্থাৎ নবীদের ইসমত তাদের প্রকৃতিগত ও জন্মগত বৈশিষ্ট্য নয় (যা তাদের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না)। বরং এটা আল্লাহর তরফ থেকে একটা খাঁটি তাওফীক যা অনুগ্রহ ও ইহসান হিসেবে নবীদেরকে দান করা হয়েছে। অতএব তাঁর দোয়া করা ও চাওয়া সঠিক হয়েছে।"–(খণ্ড ১৩ পৃঃ ২৩৪)

এ জবাবের মধ্যে আল্লামা সাইয়েদ আলুসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একটা সত্য উদ্ঘাটন করেছেন এবং সেটাকে সঠিক বলেও ঘোষণা করেছেন যে, নবীদের ইসমত তাদের জন্মগত গুণ নয় যা সত্তার সাথে আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান থাকে এবং কোনো সময় কোনো অবস্থায়ই বিচ্ছিন্ন হয় না। বরং এটা তাদেরকে আল্লাহর দেয়া একটি বৈশিষ্ট্য যা নবুয়াত ও রিসালাত প্রাপ্তির পর

www.pathagar.com

নবীগণ পেয়ে থাকেন। আল্লাহরতায়ালা নিজ অনুগ্রহ ও রহমত দ্বারা নবীদেরকে ইসমতের নেয়ামত দান করেন। এ ইসমত যখন জন্মগত ও সত্তাগত গুণ হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত হিসেবে স্বীকৃত তখন একথা স্বীকার করতেই হবে যে, যদি আল্লাহ তায়ালা সামান্য সময়ের জন্যে তাঁর হিফাজত উঠিয়ে নেন, তাহলে তাদের দ্বারা ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়।

তাফহীমাতের ভাষ্যের পর্যালোচনার শেষ ও চতুর্থ অংশ হলো এই ঃ

ঘ "আল্লাহ্ তায়ালা কোনো না কোনো সময় প্রত্যেক নবীর থেকে নিজের হেফাজত উঠিয়ে নিয়ে দু' একটি ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যাবার অবকাশ দেন।"

পর্যালোচনা ঃ

মাওলানার বাক্যের এ অংশবিশেষ নিয়ে ইলমী মহলে যদিও অনেক হৈচৈ করা হয়েছে তবুও ইসমতে আম্বিয়ার ব্যাপারে উপরে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তার আলোকে এটাকে বিচার করলে এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, মাওলানা মওদূদী এ কয়টি কথা বলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমতের প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র। কেননা এ বাক্যে বড়জোর যে দাবী করা হয়েছে তাহলো "নবীদের দ্বারা দু' একটি ভুল বা পদস্খলন সংঘটিত হয়েছে।" ইসমতে আম্বিয়া প্রসংগে বেশ কিছুসংখ্যক ইমামের দ্বারা একথা প্রমাণিত করা হয়েছে যে, নবীদের কার্যাবলীতে পদস্খলন পাওয়া যায় এবং তারা এ থেকে মাসুম নয়। এ বিষয়ে আহলে সুন্নাতদের সবাই একমত। এ বিষয়টি যখন ইজমা ভিত্তিক এবং গোটা আহলে সুন্নাত গোড়া থেকেই এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে আসছেন তখন এ একটি কথা বলা ও লেখার কারণে মাওলানা মওদূদীকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বা ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ করে দেয়া হচ্ছে কেন তা বুঝা আমাদের সাধ্যাতীত। অথচ একথা কুরআন-হাদীস সমর্থিত এবং গোটা আহলে সুন্নাত বরং সমগ্র আহলে ইসলাম একথার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। "নবীগণ কর্তৃক দু' একটি ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে" শুধু একথা বলার কারণে যদি মাওলানা মওদূদীকে আহলে সুন্নাত অথবা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে যে সমস্ত আলেম দু' একটি পদস্খলনের কথা নয় বরং অসংখ্য ভ্রম বা পদস্খলন সংঘটিত হওয়ার সমর্থক তাদের সাথে কি আচরণ করা হবে? বস্তুত নবীদের কাজের সাথে দু' একটি ভ্রম বা পদস্খলন সম্পর্কিত করলে মানুষ ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী হয় না এবং আহলে সুন্নাত দল থেকেও খারিজ হয়ে যায় না।

উদ্দেশ্য বিশ্লেষণের নিমিত্তে তাফহীমাতের ভাষ্যের ওপর এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হলো। নিম্নে তাফহীমাতের বাক্যের ওপর লিখিত হযরত

www.pathagar.com

মাওলানা হুসাইন আহম্মদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সমালোচনা পেশ করা হচ্ছে। অতপর তাঁর ওপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাও পেশ করা হবে যাতে একজন পাঠকের জন্যে এমত প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয় যে, মাওলানা মরহুমের এ সমালোচনা কতটুকু সত্য ও সঠিক। এবং এ প্রসংগে মাওলানা মওদূদীকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তাতে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কতটুকু ন্যায় ও সত্যাবলম্বী ?

فيا حسرةً على العباد لايزالون مختلفين حتى تاتيهم الساعة -

["মানুষের জন্যে বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সৃষ্টির লয় পর্যন্ত মতবিরোধ করেই চলছে।"]

হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সমালোচনা

তাফহীমাতের উপরোল্লেখিত বাক্যের ওপর হযরত শাইখ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিম্নলিখিত সমালোচনা করেছেন ঃ

"এবার বলনু যে, প্রত্যেক নবী সম্পর্কে যার মধ্যে জনাব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও শামিল আছেন উপরোল্লেখিত আকীদা (যা তাফহীমাতের বাক্যে উল্লেখ আছে) উসূল ও ইসলামের আকায়েদের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যশীল যার মধ্যে প্রত্যেক নবী থেকে ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নেয়া এবং ইচ্ছাপূর্বক তাদের দ্বারা পদস্খলন ঘটিয়ে নেয়া স্বীকার করা হয়েছে ? এমতাবস্থায় তো কোনো নবীই সত্যের মানদণ্ড থাকতে পারে না। এবং কোনো নবীর ওপর সদা সর্বত্র নির্ভরও করা যায় না। যে আদেশই আসবে তা ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নেয়ার সময়ের নয় তো, এমন সন্দেহ থেকে যাবে। এবার বলুন, এ মতপার্থক্য মৌলিক না আংশিক এবং ইসলামী জামায়াতও এর প্রতিষ্ঠাতা মুসলমান কি অমুসলমান ?-(মওদূদী গঠনতন্ত্র)

এটা ধ্রুব সত্য যে, মরহুম মাওলানা মাদানী সাহেব সমকালীন ইলমে শরীয়াতের শুধুমাত্র একজন অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও গবেষক আলেমই ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন শরীয়াতের গোপন রহস্য ও ইলমে তাসাউফের কামেল শাইখ ও স্বীকৃতি ইমাম। তাঁর সততা ও নিঃস্বার্থতা গোটা ইলমী ও ইসলামী মহলে ছিলো স্বীকৃত ও অবিসম্বাদিত। ভয় ও আল্লাহ ভীতিতে তাঁর একনিষ্ঠতা ও পরহেযগারী ছিলো অনন্য সাধারণ। ইসলামী জীবন চরিত ও সুদৃঢ় কার্যাবলীর প্রেক্ষপটে মাওলানা মরহুমের ব্যক্তিত্ব ইসলামী বিশ্বের সর্বোত্তম দীনি ব্যক্তিত্বসমূহের অন্যতম হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত ছিলো। সুতরাং

www.pathagar.com

এদিক থেকে মাওলানা মরহুমের সমালোচনা সম্পর্কে এ চিন্তাও করতে পারি না যে, তিনি মহৎ উদ্দেশ্য ও দীনি আকর্ষণের পরিবর্তে ফিতনা-ফাসাদ ও খারাপ উদ্দেশ্যে লিখে থাকবেন। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে তা মাওলানা মরহুমের এ সমালোচনার ওপর মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ করা যথার্থ ছিলো না। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ ইসমতে আম্বিয়া প্রসংগে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে আলোকে যখন আমরা মাওলানা মরহুমের এ সমালোচনার ওপর চিন্তা-ভাবনা করি তখন আমরা এটাকে মাওলানার একটি কলমী লেখার ক্ষেত্রে পদস্খলন বলে মনে করি এ ক্ষেত্রে তিনি নিজে মাসুমও ছিলেন না। এ পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ শ্রদ্ধাবজায় রেখে মাওলানা মরহুমের সমালোচনার ওপর মত প্রকাশের উদ্দেশ্যে পাঠকদের সামনে কিছু কথা পেশ করা হচ্ছে। والله اعلم بما فى صدور العلمين

তবে সমালোচনার সম্পর্কে মতামত প্রকাশের জন্যে এটা উপকারী বলে মনে হচ্ছে যে, প্রথমত মাওলানা মরহুমের সমালোচনার বিষয়বস্তুকে ভাগ ভাগ করে পরে প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্রভাবে যথার্থ পর্যালোচনা করা হবে। নিম্নে আমরা একে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে পেশ করছি।

বিভিন্ন অংশে ভাগ

মাওলানা মরহুমের সমালোচনার আলাদা আলাদা ভাগ করলে নিম্নলিখিত তিনটি জিনিস আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠে ঃ

(ক) "প্রত্যেক নবী সম্পর্কে এ আকীদা রাখা যে, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছাপূর্বক নবীদের থেকে ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নিয়ে পদস্খলন বা ভ্রম করার অবকাশ দিয়েছেন এমন কথা ইসলামী আকীদা ও নীতি বিরোধী।"

(খ) "কেননা এমতাবস্থায় কোনো নবী না সত্যের মানদণ্ড হতে পারেন না তাঁর ওপর নির্ভর করা যায়। কারণ, এমতাবস্থায় প্রত্যেক হুকুমে এ সন্দেহ বিদ্যমান থাকে যে, হুকুমটি নবী থেকে ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নেয়ার সময় নয় তো?"

(গ) "এ বিষয়ে মতপার্থক্যটি মৌলিক, আংশিক নয়। জামায়াতে ইসলামী ও এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদী উভয়ই মুসলমান নয়।" (العياز بالله ممن) (ذالك (আল্লাহর কাছে একথা বলা থেকে আশ্রয় চাই)।

হযরত শায়খের ইলমী মর্যাদা, বিষয়গত গভীরতা অপূর্ব সততা ও আদর্শ মানের তাকওয়া সামনে রেখে যখন আমরা তার এ সমালোচনা সম্পর্কে চিন্তা করি আল্লাহ সাক্ষী তখন আমাদের বিস্ময়ের কোনো সীমা থাকে না। মন-

www.pathagar.com

মস্তিষ্ক এ আবর্তে আটকে যায় যে, হযরত শায়খের মত একজন বিজ্ঞ গভীর জ্ঞানের অধিকারী মুত্তাকী, আল্লাহভীরু আলেমের মুখে ও কলমে সমালোচনার জন্যে এ ধরনের শব্দও বের হতে পারে কি পারে না। আর বের যদি হয়েই থাকে তাহলেও কিভাবে ? অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর অবশেষে একথায় আশ্বস্ত ও স্বস্তি লাভ করা যায় যে, আশ্চর্যান্বিত ও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, মানুষের বৈশিষ্ট্যই হলো, তার ভুল ও পদস্খলন হবে। সৌভাগ্য এটাই যে, (ইজতিহাদী খাতা) গবেষণার ক্ষেত্রে ভুল সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হলে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ان الحاكم اذا اجتهدنا خطا فله اجر- واذا اصاب فله اجران -(بخارى)

"কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ইজতিহাদ করে ভুল করলে একটি প্রতিদান লাভ করবে আর সঠিক হলে লাভ করবে দু'টি প্রতিদান।"

এ প্রেক্ষাপটে মাওলানা মরহুমের সমালোচনার অংশ বিশেষের সাথেও আমার ঐকমত্য নেই, বরং সঠিকভাবে রয়েছে দ্বিমত ; তবুও তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা হলো তিনি সৎ উদ্দেশ্যে এ সমালোচনা করেছেন। সুতরাং রসূলের উপরোক্ত বাণী অনুযায়ী আল্লাহর কাছে তার সাওয়াব পাওয়া বিচিত্র নয়। যদি ধরে নেয়া যায় সাওয়াব পাবেন না, তবে জবাবদিহি করতে হবে না এটাতো সহজেই আশা করা যায়। তবে মাওলানা মরহুমের সমালোচনাকে কেন্দ্র করে যারা আজ অবৈধভাবে ফায়দা লুটছে অথবা মুসলমানদেরকে মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে বদ ধারণার বশবর্তী করে তোলার মানসে তাফহীমাতের উল্লেখিত বাক্যকে বিকৃত করে পেশ করে অথবা এর ভুল অর্থ করে লোকদেরকে বলে, দেখো ! মওদূদী পয়গাম্বরদেরকেও গোনাহগার মনে করে থাকে অথবা নবীদেরও দোষ চর্চা করে, যেমন কোনো বুযর্গের মুখে আমি নিজেই শুনেছি আবার কিছু লোকের মাধ্যমেও শোনা গেছে। এমন প্রকৃতির লোকদের জন্যে এছাড়া আর কি বলা যেতে পারে যে, তাদের হৃদয়ে হয় আল্লাহভীতির কোনো স্থান নেই নতুবা আখেরাতে জবাবদিহি করার অনুভূতি একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। অথবা তারা নিজেদের সম্পর্কে এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে রেখেছে যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মত আমাদেরও এ সুসংবাদ মিলে গেছে যে, افعلوا ماشئتم فانى قد غفرت لكم (তোমরা যা ইচ্ছা করতে থাকো, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি।)

এসব ভদ্রমহোদয়গণ গাউস, কুতুব, কাযী, মুফতী, আমীরুল মু'মিনীন, আল্লামা যেই হোন না কেন তাদের কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে জবাব দেয়ার কথা চিন্তা করা দরকার।

www.pathagar.com

অতপর আমরা নিম্নে মাওলানা মরহুমের সমলোচনার পর্যালোচনা করবো এবং যেসব কারণে তাঁর সাথে একমত হতে পারিনি সেগুলো পেশ করবো।

মতপার্থক্যের কারণসমূহ

'ক' অংশের পর্যালোচনা

এ অংশ প্রসংগে আমরা মরহুম মাওলানার সাথে ঐকমত্য পোষণ করতে পারছি না। কারণ, তাঁর এ অভিমত গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জায়ামাতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা ইসমতে আম্বিয়া সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছি তা থেকে পরিষ্কারভাবে জানা গেছে যে, গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে নবীদের কাজে যাল্লাত বা ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি পাওয়া যায় এবং নবীগণ তা থেকে মাসুম নন। তাহলে মরহুম মাওলানার একথা কিভাবে সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় যে, "আল্লাহ তায়ালা নবীদের থেকে ইচ্ছাপূর্বক ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নিয়ে লগযিশ বা পদস্খলন সংঘটিত হওয়ার অবকাশ দেন।" প্রত্যেক নবী সম্পর্কে এ ধরনের আকীদা পোষণ করা ইসলামী আকীদা ও নীতি বিরোধী নয় কি ? ইসলামী আকীদা ও মূলনীতি যে আকীদা তাহলো, "আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নিয়ে ছোট অথবা বড় গোনাহ ইচ্ছাকৃতভাবে হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। নবীদের থেকে ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নিয়ে যাল্লাত বা ছোটখাটো ত্রুটি হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।"—এমন আকীদা পোষণ করা কখনো ইসলামী আকীদা মূলনীতি বিরোধী নয়। বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সর্বসম্মতভাবে এ আকীদা পোষণ করে আসছে। আজও তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীতে লিখিত আকারে সেগুলো পাওয়া যায়। ইসমতে আম্বিয়া প্রসংগের ব্যাখ্যায় 'যাল্লাত বা পদস্খলন থেকে ইসমত বা নিষ্পাপ হওয়া আলোচনায় আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। তবে মাওলানা মওদূদী যদি বলতেন বা লিখতেন যেমন, 'নবীগণ গোনাহ থেকে মাসুম নয়' তাহলে মাওলানা মরহুমের উত্থাপিত অভিযোগ ঠিক হতো। কিন্তু মাওলানা মওদূদীর সমগ্র বই পুস্তকের পাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও আপনি একথা পাবেন না যে, 'নবীগণ গোনাহ থেকে মাসুম নয়।'

তাফহীমাতের আলোচ্য বাক্যের সূত্র ধরে মাওলানা মওদূদীকে "নবীগণ গোনাহ থেকে মাসুম একথার সমর্থক নয়"-বলাটা আমাদের মতে ঠিক নয়। কেননা, তাফহীমাতের এ বাক্যে তাঁকে একথায় জড়ানোর মূলত কোনো অবকাশ নেই। কারণ, বাক্যে যাকিছু উল্লেখ করা হয়েছে তাহলো "নবীগণ কর্তৃক দু' একটি পদস্খলন বা ভ্রম সংঘটিত হয়েছে।" নবীগণ কর্তৃক গোনাহ

সংঘটিত হয়েছে এমন কথার উল্লেখ কোথাও নেই। পদস্খলন যুক্ত করলেই কেউ ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারীরূপে পরিগণিত হতে পারে না। আর এ সম্বোধন করা ইসলামী আকীদা ও নীতি বিরোধী হতে পারে না। বরং এভাবে সম্বোধন করা গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে স্বীকৃত এবং জায়েয। আমাদের মতে তাফহীমাতের বাক্য পাঠ করে যে অর্থ ও তাৎপর্য মন-মস্তিষ্কে আসে তাহলো, মাওলানা বলছেন ঃ "নবীগণ গোনাহ্ থেকে তো স্বতই পবিত্র ; প্রশ্ন হলো, 'লগযিশ' বা পদস্খলন নিয়ে। এ থেকেও তাঁরা সাধারণভাবে মাসুম ও নিরাপদ। তবে মানব সুলভ যে পদস্খলন ঘটে গেছে তার সংখ্যা এক-দুয়ের বেশী নয়।" এ কারণেই ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নেয়ার ফলশ্রুতিতে মাওলানা মওদূদী গোনাহের পরিবর্তে পদস্খলন হওয়ার কথা সংযোজন করেছেন। অতএব, তিনি লিখেছেন ঃ "এটা একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার যে, আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছাপূর্বক প্রত্যেক নবী থেকে কোনো না কোনো সময়ে নিজের হিফাজত ব্যবস্থা উঠিয়ে দু' একটি পদস্খলন বা ভুল-ত্রুটি হতে দিয়েছেন।" মাওলানা মওদূদী এ বাক্যে নবীদের গোনাহ্ থেকে মাসুম হওয়ার বিষয় অস্বীকার করেছেন, এ অবকাশ এমন সুস্পষ্ট বাক্য থেকে কেমন করে বের হতে পারে ? কেননা, এখানে বাক্যের আগে বা পরেও গোনাহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং পদস্খলনেরই উল্লেখ আছে। এতে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এখানে পদস্খলন থেকে মাসুম হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। গোনাহ্ থেকে মাসুম হওয়ার প্রসংগে নয়। তারপর আলোচ্য বাক্যে হিফাজত উঠিয়ে নেয়ার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় 'লগযিশ' বা পদস্খলন সংঘটিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, গোনাহর নয়। এ কারণে তাফহীমাতের এ বাক্য আদৌ সমালোচনার পাত্র এবং অভিযোগের উৎস হতে পারে না এবং এ বাক্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতবিরোধী কোনো বিষয় পাওয়া যায় না। বরং আমাদের মতানুযায়ী ইসমতে আম্বিয়া সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর এ অভিমত খুব প্রশংসা ও অধিক স্তুতির যোগ্য। কারণ, তিনি গোনাহ্ থেকে সাধারণভাবে নবীদের মাসুম হওয়ার সমর্থক তো বটেই ; পরন্তু পদস্খলন বা 'ভ্রম দুয়ের বেশী না হওয়ার সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। অথচ সাধারণ আহলে সুন্নাতগণ সর্বসম্মত মতে নবীদের দ্বারা গোনাহের কাজ হওয়া পর্যন্ত জায়েয বলে স্বীকার করেন। তবে শর্ত হলো কাজটি নীচু ধরনের না হওয়া। গোনাহ্ সগীরা হওয়া এবং তা অনিচ্ছা ও ভুলক্রমে হওয়া। আর অধিকাংশ আহলে সুন্নাতগণ তো ইচ্ছাপূর্বক সগীরা গোনাহ্ করাকেও জায়েয বলে মেনে নিয়েছেন। ইসমতে আম্বিয়া প্রসংগে সগীরা গোনাহর ক্ষেত্রে মাসুম' শিরোনামের অধীনে আল্লামা সাইয়েদ আলুসী পূর্বোদ্ধৃত বাক্যে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

فان الصغائر الغير المشعرة بالخسة يجوز صدورها منهم عمداً بعد البعثة عند الجمهور على ما ذكره العلامة الثانى فى شرح العقائد ويجوز صدروها سهوا بالاتفاق -(روح المعانى ج ص ٢٧٤)

"জমহুরের (অধিকাংশ) মতে নবুয়াত প্রাপ্তির পরও নবীগণ কর্তৃক ইচ্ছাপূর্বক এমন সগীরা গোনাহ সংঘটিত হতে পারে যা নীচু ধরনের কাজ নয়। আল্লামা তাফতাযানী শরহে আকায়েদে একথার উল্লেখ করেছেন। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে সগীরা গোনাহ হয়ে যাওয়া তো সকলের মতেই জায়েয।-(রূহুল মায়ানী, পৃ-২৭৪)

তাছাড়া আহলে সুন্নাতগণ পদস্খলনের কোনো সীমারেখা টানেননি। বরং নবীগণ কর্তৃক সাধারণভাবে তা সংঘটিত হওয়া জায়েয বলে স্বীকার করেছেন। মাওলানা মওদূদী শুধুমাত্র দু'টি পদস্খলন বা ভ্রম হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। এর অতিরিক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেননি। এমনিভাবে মাওলানা মওদূদীর ইসমতে আম্বিয়ার আকীদায় অন্যান্য আহলে সুন্নাতদের তুলনায় অধিকতর সতর্কতা পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং মাওলানার ইসমতে আম্বিয়ার এ আকীদার খুব প্রশংসা করাই যথার্থ ছিলো। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, ইসমত সম্পর্কে এরূপ উত্তম আকীদা পোষণ করার কারণে তাঁকে আহলে সুন্নাত থেকেই শুধু নয় বরং ইসলাম থেকেই বের করে দেয়া হয়েছে। তাঁর এ পবিত্র আকীদাকে ইসলামের আকীদা ও নীতির বিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। জানি না এর পেছনে যুক্তি ও দর্শন কি?

আপত্তি

মাওলানা মওদূদীর তাফহীমাতের ভাষ্য থেকে একথা বুঝার কোনো অবকাশ নেই যে, মাওলানা ইসমতে আম্বিয়ার সমর্থক নয়। আমাদের এ রায়ের ওপর কোনো পণ্ডিত বুযর্গের এ আপত্তি উত্থাপন সম্ভব যে, তাফহীমাতের বাক্যের মধ্যে 'ইসমত ও হিফাজত' শব্দকে গোনাহ থেকে ইসমত এবং 'লগযিশ' শব্দকে গোনাহ পর্যায়ের 'লগযিশ' হিসেবে ধরে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এভাবে নবীদের ক্ষেত্রে দু' একটি লগযিশ প্রমাণ করে। নবীদের মাসুম হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মাওলানা মওদূদী নবীদের ইসমত বা নিষ্পাপ হওয়ায় বিশ্বাস করেন না। কেননা এভাবে তাফহীমাতের এ বাক্যের এ অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নিয়ে দু' একটি পদস্খলন বা গোনাহ করার অবকাশ দিয়েছেন। আর এমন আকীদা

www.pathagar.com

অবশ্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতামতের বিরোধী। এমনিভাবে তাফহীমাতের এ বাক্যের দ্বারা মাওলানা মাদানী মরহুমের এ সিদ্ধান্ত বৈধতা ও যুক্তি লাভ করবে যে, মাওলানা মওদূদী ইসমতে আম্বিয়া বা নবীদের নিষ্পাপ হওয়া অস্বীকার করেছেন।

জবাব

এ অভিযোগের জবাবে আমরা প্রথমত, একথা বলবো যে, তাফহীমাতের বাক্যের এরূপ ব্যাখ্যা করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা বাক্যের আগে পরে কোথাও গোনাহ্ শব্দের উল্লেখ নেই। বাক্যের মধ্যে এমন কোনো শব্দও নেই যা থেকে এরূপ ইশারা ইংগিত পাওয়া যেতে পারে যে, এখানে ইসমতের অর্থ গোনাহ থেকে ইসমত, আর 'লগযিশ' শব্দের অর্থ হলো গোনাহের মত লগযিশ। তাছাড়া ইসমত ও লগযিশ শব্দ দ্বারা যদি উল্লেখিত অর্থ উদ্দেশ্য হতো তাহলে লগযিশ শব্দের উল্লেখ করার কি প্রয়োজন ছিলো ? বরং স্পষ্টভাবে একথা বলা উচিত ছিলো যে, "আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবী থেকে কোনো না কোনো সময় নিজের হেফাজত উঠিয়ে নিয়ে দু' একটি গোনাহ্ করার অবকাশ দেন।" দ্বিতীয়, আমরা আরয করবো যদি লগযিশ শব্দের অর্থ গোনাহ্ ধরে নেয়া হয় তবুও বাক্যে অন্তত একথা বলার সুযোগ রয়েছে যে, গোনাহ দ্বারা সগীরা গোনাহ বুঝানো হয়েছে। আর সংঘটিত হওয়ার অর্থ হলো অনিচ্ছা ও ভুলক্রমে সংঘটিত হওয়া। এ অর্থে গ্রহণ করার জন্যে পূর্বাপর ইংগিতও আছে। আর সে ইংগিতের জন্যে শব্দ হলো 'ভুল-ত্রুটির' আর এ শব্দটিও ভুল ও ত্রুটি-বিচ্যুতি অর্থে প্রয়োগ হয়। এমতাবস্থায় বাক্যের অর্থ হবে "আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে হিফাজত উঠিয়ে নিয়ে দু' একটি সগীরা গোনাহ্ অনিচ্ছা ও ভুলক্রমে সংঘটিত হতে দেন।" এভাবে ব্যাখ্যা করলেও এ আকীদা আহলে সুন্নাতের আকীদার পরিপন্থী হবে না। আবার ইসলামী আকীদা ও মূলনীতি বিরোধীও হবে না। কেননা, নবীগণ কর্তৃক ভুলক্রমে ও অনিচ্ছায় সগীরা গোনাহ্ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ ধ্বংসের কাজ অর্থাৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে নবীগণ মাসুম নন। আল্লামা আলুসীর পূর্বোদ্ধৃত বাক্যে এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ আকীদাকে ইসলামী আকীদাহ ও মূলনীতির পরিপন্থী বলা এমন একটি কাজ যা সত্যই আমাদের বোধগম্য নয়। তবে 'লগযিশ' শব্দটি দ্বারা যদি কবীরা গোনাহ্ অর্থ করা হয় এবং সংঘটিত হওয়ার অর্থ ইচ্ছাপূর্বক সংঘটিত করা হয়, তাহলে এ বাক্য আপত্তিকর ও সমালোচনার যোগ্য। তখন মাওলানা মওদূদীর ওপর হযরত মাদানী মরহুমের এ অভিযোগ আরোপ সঠিক হবে। অর্থাৎ তিনি এ বাক্যে ইসমতে আম্বিয়ার কথা অস্বীকার করেছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা আরয করবো তাফহীমাতের বাক্যকে এ অর্থে প্রয়োগ করার কোনো অবকাশ এখানে নেই। কেননা তাহলেই অন্যান্য বই পুস্তকে মাওলানা মওদূদী ইসমতে আম্বিয়ার যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করেছেন এটি তার বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, যদি কোনো বক্তার বক্তব্যে এমন দু'টি শব্দ পাওয়া যায় যার মধ্যে একটি অস্পষ্ট ও অন্যটি স্পষ্ট তাহলে অস্পষ্ট শব্দটিকে এমন অর্থে প্রয়োগ করতে হবে যার ব্যাখ্যা অন্যত্র দেয়া আছে। যাতে উভয় শব্দের মধ্যে অকারণে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়। কিতাব ও সুন্নাতে এর অসংখ্য উদাহরণ আছে। এখানে কুরআন থেকে মাত্র দু'টি উদাহরণ পেশ করছি। এ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ নীতি স্বস্থানে সঠিক ও যথার্থ।

প্রথম উদাহরণ

কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ "মৃত জন্তু ও রক্ত তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে।"

এখানে (দম) রক্তের উল্লেখ যদিও অস্পষ্ট ও সাধারণভাবে করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনেরই অন্যত্র 'দম' শব্দটিকে 'মাসফুহান' (প্রবাহিত) শব্দ দ্বারা শর্তাধীন করা হয় এবং أَوْدَمًا مَسْفُوْحًا (অথবা প্রবাহিত রক্ত) বাক্য দ্বারা অস্পষ্ট শব্দটির ব্যাখ্যা হয়ে গেছে। গোটা আলেম সমাজের স্বীকৃত ফায়সালা হলো—প্রথম আয়াতে অস্পষ্ট ও সাধারণভাবে বর্ণিত 'দম' শব্দ দ্বারা দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত أَوْدَمًا مَسْفُوْحًا বা প্রবাহিত রক্তই বুঝানো হয়েছে। হারাম হওয়ার নির্দেশ এ প্রবাহিত রক্তের সাথেই সম্পর্কিত। অন্য ধরনের রক্ত এতে শামিল নেই। এভাবে জানা গেলো যে, একজন বক্তার বক্তব্য যখন স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দু' ধরনের শব্দ পরিদৃষ্ট হবে তখন অস্পষ্ট শব্দটিকে এমন অর্থে প্রয়োগ করতে হবে যার ব্যাখ্যা অনত্র করা হয়েছে যাতে একজন বক্তার দু'টি বক্তব্যের মধ্যে অকারণে দ্ব্যর্থতার সৃষ্টি না হয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ

কুরআন মজীদের এক জায়গায় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, তিনি একবার কোনো ক্ষেত্রে তাঁর রবের কাছে মৃতদের জীবিত করার স্বরূপ দেখার জন্য এভাবে দরখাস্ত করেন رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى "হে প্রভু কিভাবে তুমি মৃতদেরকে জীবিত কর তা আমাকে দেখাও।"

এ ধরনের প্রশ্ন করার কারণ বাহ্যত অজানা হতে পারে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এখনও পর্যন্ত মৃতদের জীবিত করা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসস্থাপন

www.pathagar.com

করতে পারেননি। ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করার অভিপ্রায়ে তিনি এ প্রশ্ন করেছিলেন সাথে সাথে এ সম্ভাবনাও ছিলো যে, আল্লাহর মহান কুদরতের দলীল দ্বারা মৃতদের জীবিত করণের ওপর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান আগে থেকেই ছিলো। তবে প্রত্যক্ষভাবে দেখা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা যে প্রত্যায় ও বিশ্বাস অর্জন করা যায় তার জন্যই তিনি এ প্রশ্ন করেছিলেন।

উল্লেখিত দু'টি সম্ভাবনার মধ্যে প্রথম সম্ভাবনার ভিত্তিতে হযরত ইবরাহীম আলাইহি সালামকে প্রশ্ন করা হলো ঃ ? اَوَلَمْ تُؤْمِنْ "এখনো কি তোমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়নি ?" জবাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দ্বিতীয় সম্ভাবনার বিশ্লেষণ করে আরয করলেন ঃ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ 'হ্যাঁ ঈমান ও ইয়াকীন তো অবশ্যই আছে, তবে প্রত্যক্ষভাবে দেখে মনের প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা হাসিল করাই এর উদ্দেশ্যে।" প্রশ্ন করার কারণ সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজেই যখন ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, প্রশ্ন করার কারণ পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাসের অভাব নয় বরং প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা দৃঢ় প্রত্যয় হাসিল করা। এভাবে জানা গেলো যে, اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى এ প্রশ্ন করার কারণ ও উদ্দেশ্য আগ থেকেই এটা ছিলো, ঈমান ও বিশ্বাসের অভাব এর কারণ ছিলো না।

এ বিশ্লেষণের পরও যদি কেউ জিদ করে বলে যে, اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ? এ প্রশ্ন করার কারণ ছিলো ঈমানের অভাব এবং মৃতকে জীবিত করণ সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঈমান ও বিশ্বাসে দৃঢ়তার অভাব। তাহলে যে সাংঘাতিক ভুলের শিকার হবে বলা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। বরং প্রথম থেকেই প্রশ্নের প্রকৃত কারণ ও উদ্দেশ্য সেটাই সাব্যস্ত করা হবে যার ব্যাখ্যা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজেই দিয়েছেন। এ উদাহরণের মাধ্যমেও এ মূলনীতি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, অস্পষ্ট ও স্পষ্ট অর্থের মধ্যে শুধুমাত্র যে ব্যাখ্যাকৃত সুস্পষ্ট অর্থই গ্রহণযোগ্য হবে। এ বিধিকে সামনে রেখে যদি আমরা সামান্য সময়ের জন্যে এটা মেনেও নেই যে, তাফহীমাতের বাক্যের মধ্যে লগযিশ শব্দের দ্বারা কবীরা গোনাহ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সংঘটিত হওয়া' বুঝানো হয়েছে তবুও নবীদের সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অন্যান্য কিতাবে সুস্পষ্ট ভাষায় যে আকীদা ঘোষিত হয়েছে অর্থাৎ তাঁরা গোনাহ থেকে মাসুম এবং ইসমত তাঁদের বিশেষ গুণ। তাই আমরা তাফহীমাতের এ বাক্য এমন অর্থে কখনো প্রয়োগ করতে পারি না যাতে এ বাক্য অন্যান্য সকল ব্যাখ্যার পরিপন্থী হয়ে যায় এবং মাওলানা তাঁর অন্যান্য বই-পুস্তক ও লেখায় 'ইসমত' সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট আকীদার কথা উল্লেখ করেছেন তার ওপর কোনো আঘাত লাগে।

www.pathagar.com

এখন নীচে মাওলানা মওদূদীর সেইসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করা যাচ্ছে যাদ্বারা 'ইসমতে আম্বিয়া' সম্পর্কে মাওলানার আকীদা ও অভিমত জানা যেতে পারে। তাফহীমাতের আলোচ্য বাক্য সম্পর্কে জানতে চেয়ে এক ব্যক্তি মাওলানাকে এভাবে প্রশ্ন করেন ঃ "নবীগণ কি সবরকম গোনাহ থেকে মাসুম বা নিষ্পাপ নয় ? নবী হওয়া সত্ত্বেও যদি নবীর ইসমত রহিত হওয়া সম্ভব হয় তাহলে তাঁর নবুয়াত ও নবুয়াতী শিক্ষার ওপর কিভাবে পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করা যায় ?"

এর জবাবে মাওলানা যা বলেছেন আমরা তা নিম্নে উল্লেখ করছি, যাতে তাফহীমাতের রচয়িতা তাফহীমাতের বাক্য দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন তা জানা যায়। মাওলানা বলেছেন ঃ

"নবীগণের ইসমত নিসন্দেহে একটি মৌলিক বস্তু। তাদের নির্ভরতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমার ও আপনার চেয়ে তাঁকে প্রেরণকারী আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে অধিক সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু আল্লাহই তার পবিত্র কালামে কিছুসংখ্যক নবীর ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও উল্লেখ করেছেন এবং সে সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দিয়েছেন। সে প্রতিপালকই স্বীয় কিতাবে আমাদরেকে একথা বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, নবীদেরকে কখনো কোনো সামান্যতম পদস্খলন বা ভুলের ওপর বহাল থাকতে দেননি। বরং যথাসময়ে তা সংশোধনও করে দিয়েছেন। উসূলবিদ আলেমগণ নিজেদের কিতাবে একথাই বর্ণনা করেছেন যে, নবীগণ কর্তৃক পদস্খলন হওয়া এবং মত প্রকাশে ভুল হওয়া সম্ভব। তবে তাদের পদস্খলন ও ভুলের ওপর বহাল থাকা সম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদের সংশোধন করার দায়িত্ব নিয়েছেন।-(দ্রষ্টব্য উসূলে সারাখসী খঃ ১ পৃঃ ৩১৮ খঃ ২ পৃঃ ৫, ৮৬, ৯৬)

এ সত্যটি আপনার সামনে থাকলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, নবীদের ঐসব ত্রুটির কথা উল্লেখ করাতে তাঁদের নির্ভরযোগ্যতার ওপর বিন্দু পরিমাণ ত্রুটিও সৃষ্টি হয় না। অবশ্য তাতে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে ভালোরূপে পার্থক্য নির্ণিত হয়ে যায় এবং এ বিপদের আশংকা অবশিষ্ট থাকে না যে, এ সমস্ত উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের প্রতি কেউ 'উলুহিয়্যাত' (আল্লাহ হওয়ার যোগ্য) বিশেষণের সম্বোধন করে বসবে।-(তরজুমানুল কুরআন খ ঃ ৪৬, পৃ, ৩ রযমান-১৩৭৫ হিজরী)

অন্য একটি প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেছেন ঃ

"জামায়াতে ইসলামী সমগ্র বুযর্গনে দীনকে সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের মহত্ত্বের স্বীকৃতিকে জরুরী মনে করে। তবে নবীগণ ছাড়া আর কাউকে মাসুম বা নিষ্পাপ মনে করে না।"-(কিয়া জামায়াতে ইসলামী হক পর হ্যায় ? পৃঃ ২৮৮)

www.pathagar.com

উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যা দু'টি দ্বারা 'ইসমতে আম্বিয়া' সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর আকীদা ও অভিমত দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাঁর সে স্বচ্ছ, আরশিসম অভিমত হলো ঃ

"নবী আলাইহিস সালামগণ মাসুম। তাঁদের ইসমত বা নিষ্পাপ হওয়ার আকীদা ইসলামে মৌলিক গুরুত্ব বহন করে এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এ ইস-মতের ব্যবস্থা করেছেন যাতে তাদের বিশ্বস্ততা প্রতিষ্ঠা হয়। অধিকন্তু এ ইসমত নবীদের বিশেষ গুণ। কোনো মানুষই এ বৈশিষ্ট্যে তাঁদের সাথে শরীক নয়। তাঁদের দ্বারা সংঘটিত দু' একটি পদস্খলন তাঁদের ইসমতের ওপর আদৌ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

ইসমতে আম্বিয়া সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর এ আকীদা ও অভিমত প্রথম থেকেই গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত ও প্রচলিত হয়ে আসছে। বই-পুস্তকে আজও সে আকীদার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তবে পরিতাপের বিষয় হলো হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীকে কলমের এক খোঁচায়ই এমন একটি আকীদা পোষণ করার কারণে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত হওয়ার ফতওয়া দিলেন যা গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত আকীদা ও স্বীকৃত অভিমত হিসেবে চলে আসছে।

غفر الله له وتجاوز عن زلاته وتغمده برحمته وجعل الجنة مثواه - امين

দ্বিতীয় অংশের পর্যালোচনা

হযরত শায়খ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সমালোচনার সাথে আমাদের মতবিরোধের দ্বিতীয় কারণ হলো তিনি তাফহীমাতের বাক্য থেকে গৃহীত ফলাফলে দ্বিতীয় অংশে এভাবে বলেছেন ঃ

"এতে নবীর ওপর নির্ভরতা থাকতে পারে না। কারণ, নবীর প্রত্যেক নির্দেশের মধ্যে এ সন্দেহ করার অবকাশ থাকে যে, হুকুমটি ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নেয়ার সময়ের নয় তো।"

এ অংশ প্রসংগে আমরা সশ্রদ্ধভাবে এ আরজ করবো যে, নবীদের দ্বারা দু' একটি পদস্খলন হয়ে গেছে। তাফহীমাতের বাক্যে এতোটুকু উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর এ বাক্য সম্পর্কে যখন মাওলানাকে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি জবাবে বললেন ঃ

"নবীদেরকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপর টিকে থাকতে দেয়া হয়নি। বরং যথাসময়ে তাদেরকে সংশোধন করা হয়েছে।"

www.pathagar.com

বাক্যের এ সারমর্মের প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে বিস্মিত হতে হয় যে, নবীগণের দ্বারা সংঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতির সংখ্যা সারা জীবনে যখন দু' একটির বেশী নয় ; আবার ত্রুটি দু'টিরও জবাব জানা আছে এবং তাও আবার যথাসময়ে সংশোধিতও হয়ে গেছে ; তখন নবীগণের অবশিষ্ট আহকাম ফায়সালায় এ সন্দেহ কোত্থেকে সৃষ্টি হলো যে, এ হুকুম সে সময়ের যখন নবীদের থেকে ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে ? সে দু' একটি ত্রুটি তো জানা আছে সেগুলোর ক্ষেত্র এবং প্রেক্ষাপটও নির্দিষ্ট। এগুলো সম্পর্কে নবী ও উম্মত সকলকে অবহিত করা হয়েছে এবং যথাসময়ে সেগুলোর সংশোধনও হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও এ জানা পদস্খলন এবং নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত স্থান ছাড়া নবীদের অন্যান্য সমস্ত আহকামে এ সন্দেহ কেমন করে সৃষ্টি হলো যে, এসব হুকুমেও নবীদের ত্রুটি হয়েছে অথবা ইসমত ও হিফাজত উঠে গেছে এবং এভাবে নবী থেকে নির্ভরতা উঠে গেছে এবং তাঁদের সমস্ত হুকুম ও ফায়সালা নির্ভরযোগ্য থাকেনি ?

তাফহীমাতের ভাষ্যে নবীগণ কর্তৃক সাধারণভাবে পদস্খলন হওয়ার দাবী করা হলে এবং সেসব স্খলনের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত না হলে এ সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারতো। এর সাথে নবীদেরকে এসব ভ্রম বা ত্রুটির ওপর যদি প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেয়া হতো এবং সময় মতো তাদেরকে সংশোধন করা না হতো তাহলে নিশ্চিতভাবে এ সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারতো যে, প্রত্যেক হুকুমেই নবীগণের ত্রুটি হয়েছে এবং ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু তাফহীমাতের ভাষ্যে এ ধরনের কোনো দাবী করা হয়নি। এবং এ দ্বারা এ অর্থও বুঝা যায় না। সুতরাং তাফহীমাতের বাক্য থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, এর রচয়িতা নবীদের গোনাহ্ থেকে মাসুম না হওয়ার আকীদা পোষণ করেন। অধিকন্তু এ বাক্যের প্রেক্ষাপটে কোনো নবী সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না। কেননা তাদের প্রত্যেক ফায়সালা ও হুকুম তাদের থেকে ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নেয়ার সময়ে হওয়ার সন্দেহ বিদ্যমান থাকে এরূপ কথা বলা সঠিক ও নির্ভুল ইজতিহাদ নয়। বরং কলমের একটি স্খলন এবং মানব প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী প্রকাশ যা থেকে কোনো আলেম এমনকি মুজতাহিদও মাসুম বা নিরাপদ নয়, সে যত বড় ব্যক্তিত্বই হোক না কেন। আমাদের মতে তাফহীমাতের ভাষ্যে মাওলানা মওদূদী ইসমতে আম্বিয়া সম্পর্কে পেশকৃত আকীদা গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতেরই আকীদা। উভয় আকীদার মধ্যে কেশাগ্র পরিমাণ পার্থক্য নেই। যেসব লোক মাওলানা মওদূদীকে এ বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী বলে সাব্যস্ত করেছেন, এ অভিযোগ সঠিক প্রমাণ করার জন্যে তাদের কাছে কোনো নির্ভুল ও মযবুত

www.pathagar.com

দলীল নেই। এ প্রসংগে তারা যাকিছু পেশ করেছেন যুক্তির কষ্টিপাথরে তার কোন মূল্য নেই।

তৃতীয় অংশের পর্যালোচনা

এ অংশের পর্যালোচনা করার জন্য অতিরিক্ত কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। শুধু এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট যে, যেহেতু এ অংশের ভিত্তি হলো মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী উভয়েরই বিরুদ্ধে ইসমতে আম্বিয়া অস্বীকার করার প্রমাণহীন অভিযোগ। বরং মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী ইসমতে আম্বিয়ার সমর্থক এবং তাদের অভিমত হুবহু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমতের অনুরূপ বলে প্রমাণিত।

অতএব, "মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথে আলেমদের মতবিরোধ মৌলিকভাবে, খুটিনাটি বিষয়ে নয়। এবং মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী কেউই মুসলমান নয়।" বর্ণিত অভিযোগের ভিত্তিতে এ দাবী আপনা থেকেই ভুল প্রমাণিত হবে। সঠিক কথা হলো, যাকিছুই মতপার্থক্যের সবটাই খুটিনাটি বিষয়ে, মৌলিক বিষয়ে নয়। আর মাওলানা মওদূদী শুধু একজন নির্ভুল আকীদা সম্পন্ন আলেম ও মুসলমান নন এবং তিনি ইসলামের একজন খাটি ও নিষ্ঠাবান সেবক ও মুজাহিদ। নবীদের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী তিনি আল্লাহর পথের একজন আহ্বানকারী মাত্র নন বরং একজন কর্ণধারও বটে। লোকেরা দলীয় গোড়ামি কিংবা অন্যান্য কারণে তাকে যতই পথভ্রষ্ট ও সত্য থেকে বিচ্যুত এবং নানা ধরনের ফতওয়া দিয়ে জর্জরিত করুক না কেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা

যেসব মৌলিক বিষয়ে মাওলানা মওদূদীকে কলুষিত ও বদনাম করার হীন চেষ্টা করা হয়েছে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা সেসব বিষয়ের অন্যতম।

তাফহীমুল কুরআনের বাক্য

তাফহীমুল কুরআনের ২য় খণ্ডে ৩১২ পৃষ্ঠায় ৯৯ নম্বর টীকায় হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনার ওপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী লিখেছেন ঃ

'কুরআনের তিন জায়গায় এ ঘটনার প্রতি শুধু ইংগিত দেয়া হয়েছে, কোনো বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়নি। সুতরাং দৃঢ়তার সাথে বলা সম্ভব নয় যে, আযাব আসার ফায়সালা হওয়ার পর কারো ঈমান তার জন্য উপকৃত হতে পারে না।' আল্লাহর এ বিধান হতে এ জাতিকে কোনো বিশেষ কারণে বাদ দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কুরআনের ইশারা-ইংগিতে এবং হযরত ইউনুস আলাইহিস সাল্লামের সহীফার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ওপর চিন্তা-গবেষণা করলে এতটুকু কথা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কিছুটা ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গিয়েছিলো এবং সম্ভবত সময় আসার আগেই তিনি অধৈর্য হয়ে স্বস্থান ত্যাগ করেছিলেন এ কারণে অবিশ্বাসীরা যখন আযাবের নিদর্শন দেখলো তখন তারা তাওবা করলো ও ক্ষমা প্রার্থনা করলো। আল্লাহ্ তায়ালাও তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। কুরআনে আল্লাহর বিধানের যে নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে একটা স্থায়ী ধারা হলো আল্লাহ তায়ালা ইতমামে হুজ্জত বা দলীল পূর্ণ করার আগে কোনো জাতিকে আযাব দেন না। কিন্তু যখন রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করতে গিয়ে নবী আলাইহিস সালামের ত্রুটি হয়ে গেলো এবং আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগেই নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারেই স্থান ত্যাগ করলেন তখন আল্লাহর ইনসাফে সে জাতির ওপর আযাব পাঠানো সমীচীন মনে হয়নি। কেননা দলীল পুরো করার যে আইনানুগ শর্ত তা তাদের বেলায় পূর্ণ হয়নি।

এ বক্তব্যের ওপর হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একজন অনুমোদিত খলীফা নিম্ন বর্ণিত আপত্তি উত্থাপন করেছেন।

www.pathagar.com

এখানে মওদূদী সাহেব হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের সাথে তিনটি কথা সম্পৃক্ত করেছেন ঃ (১) রিসালাতের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তাঁর কিছুটা ক্রটি হয়ে গিয়েছিলো। (২) আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের আগেই তিনি নিজে অধৈর্য হয়ে স্বস্থান ত্যাগ করেছিলেন। (৩) তিনি জাতির ওপর দলীল পূর্ণ করতে পারেননি। অথচ এ তিনটি অভিযোগই ভুল। কারণ, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের জানামতে আল্লাহ তায়ালা কোনো সময় নির্ধারণ করে দেননি। পয়গাম্বর অধৈর্য হয়ে পরীক্ষাস্থল ত্যাগ করেন না এবং তারা হলো পরিপূর্ণ সবর ও ধৈর্যের প্রতীক। আর যদি নবী রিসালত ও নবুয়াতের দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় করতে না পারেন তাহলে তাকে মাসুম ঘোষণা করা যায় না। অধিকন্তু তাঁর দ্বারা নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়ে যায়। কেননা, দলীল পূরণ করণের জন্যে নবীদেরকে পাঠানো হয়। খোদ কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে ঃ

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

অর্থাৎ নবীদেরকে শুভ সংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে পাঠানো হয়েছে যাতে তাদের প্রেরণের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে লোকেরা কোনো প্রমাণ দাঁড় করাবার সুযোগ না পায়। অতএব মওদূদী সাহেবের এ বক্তব্য ভুল যে, দলীল পূরো করার আইনগত শর্ত পূরণ করা হয়নি। এ কারণে জাতি আযাব থেকে বেঁচে গেছে।–(মওদূদী জামায়াতকে আকায়েদ ও নজরিয়াত পর এক তানকিহী নযর।–পৃঃ ৮৩)

উক্ত বইয়ের ৮৪ পৃষ্ঠায় বলা আছে ঃ

কোতাহী (ঢিলেমী) ও লগযিশ (পদস্খলন) নবী কর্তৃক সংঘটিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নবীর থেকে ঢিলেমী হওয়া অসম্ভব। আহলে হকদের কোনো নির্ভরযোগ্য আলেম এমন কথা লিখেননি। কেননা তাতে তাঁদের রিসালাতই সন্দেহ যুক্ত হয়ে দাঁড়ায় নাউযুবিল্লাহ।"

আপত্তির সারমর্ম

উপরোল্লেখিত আপত্তি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্ন বর্ণিত চারটি সারমর্ম জানা যায় ঃ

(ক) রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হযরত ইউনসু আলাইহিস সালামের কোনো ক্রটি হয়নি। কেননা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে নবী কর্তৃক ঢিলেমী হওয়া অসম্ভব এবং কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমই এ ধরনের কোনো কথা লিখেননি।

www.pathagar.com

(খ) নবী কর্তৃক রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করতে গিয়ে নবী কর্তৃক বিচ্যুতি ঘটা অন্যায় এবং গোনাহ যা থেকে নবীগণ মাসুম ও নিরাপদ। নবীদের সম্পর্কে যারা এ ধরনের আকীদা পোষণ করেন যে, তারা এ ধরনের ত্রুটি করতে পারেন তারা ইসমতে আম্বিয়া অস্বীকারকারী এবং আহলে সুন্নাত থেকে খারিজ।

(গ) হযরত ইউনসু আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগে অধৈর্য হয়ে স্থান ত্যাগ করেননি। কেননা পয়গাম্বর অধৈর্য হয়ে পরীক্ষা স্থল ত্যাগ করেন না বরং তারা হলেন পরিপূর্ণ ধৈর্যের প্রতীক।

(ঘ) মাওলানা মওদূদীর একথা ভ্রান্ত যে, ইউনুস আলাইহিস সালামের কওমের ওপর দলীল পূর্ণ করার আইনানুগ শর্ত পূরণ হয়নি। কেননা এভাবে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যেই ব্যাহত হয়ে যায়। কারণ, কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী দলীলের পূর্ণতা ছাড়া নবী প্রেরণের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়।

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

এ চারটি বস্তু উপরোল্লেখিত অভিযোগের সারমর্ম। নবীদের সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা অপূর্ণাংগ এবং নবুয়াতির স্থান ও রিসালাতের মর্যাদা সম্পর্কে তার ধারণা ভুল আলেমদের পক্ষ থেকে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এ জঘন্য প্রচারই যেহেতু এ ধরনের অভিযোগের মূল কারণ। তাই অভিযোগের জবাবদানের আগে নবুয়াতের মান ও রিসালাতের মর্যাদা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা ও খেয়াল পেশ করা আমার ইচ্ছা। কারণ, অনেক অভিযোগ এ ভুল বুঝার ওপর ভিত্তি করে আরোপ করা হয়েছে।

নবুয়াতের মান ও রিসালাতের মর্যাদা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর উচ্চ ধ্যান-ধারণা

নবুয়াতের মান ও রিসালাতের মর্যাদা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা অপূর্ণাংগ অথবা ভ্রান্তিমূলক—যারা তাঁর ওপর এ দোষারোপ করে বেড়ায় তাদেরকে আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যে, হয় তারা মাওলানা মওদূদীর এসব বিষয় সম্বলিত গ্রন্থরাজি পাঠ করেননি। অথবা পাঠ করা সত্ত্বেও যখন এ ধরনের অপবাদ ও অপপ্রচারের ধৃষ্টতা দেখায় তখন তাদের অন্তরে আল্লাহ-ভীতিতো নেই-ই অধিকন্তু আখেরাতের জবাবদিহি অনুভূতি পর্যন্ত তারা হারিয়ে ফেলেছে। অন্যথায় তারা কখনো এ ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতো না। কেননা, নবুয়াতের মান ও রিসালাতের মর্যাদা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর বিভিন্ন গ্রন্থে দীর্ঘ যেসব প্রবন্ধ বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় সেগুলো যদি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা যায় তাহলে একজন আল্লাহভক্ত ও আখেরাতে জবাবদিহি অনুভূতি

www.pathagar.com

সম্পন্ন লোকের কাছে এ সত্য উদঘাটিত হয়ে যাবে যে, নবুয়াতের মান ও রিসালাতের মর্যাদা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা অত্যন্ত উন্নত ও উত্তম। রিসালাতের মর্যাদা সম্পর্কে এর চেয়ে উন্নত কোনো চিন্তা-ভাবনা আর হতে পারে না। তাফহীমাতের ১ম খণ্ডের একটি প্রবন্ধের কতিপয় অংশ নীচে পেশ করা হলো। এর ওপর চিন্তা করে আপনি নিজেই ফায়সালা করুন যে; নবুয়াতের মান ও রিসালাতের মর্যাদা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর এ চিন্তাধারা থেকে অধিক উত্তম ও উন্নত কোনো চিন্তাধারা হতে পারে কিনা ?

গোলাম আহমদ পারভেজের একটি দীর্ঘ পত্রের জবাবে মাওলানা তাফহীমাতের প্রথম খণ্ডে "রিসালাত ও তার আহকাম" শিরোনাম দিয়ে রিসালাতের মর্যাদার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে আলেমদের বিভিন্ন মতামত ও চিন্তাধারা পেশ করেছেন। তারপর রিসালাতের মর্যাদা সম্পর্কে নিজের চিন্তাধারা এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও রিসালাতের মর্যাদা যদিও স্বতন্ত্রভাবে নির্ণীত তবুও অস্তিত্বের দিক থেকে উভয়ই এক ও অভিন্ন তাদের মধ্যে বাস্তবে কোনো পার্থক্য নেই।" 'রিসালাতের আসন' পার্থিব পদমর্যাদার মতো কোন আসন নয় যে, যতক্ষণ আসনে সমাসীন থাকবে ততক্ষণ মর্যাদাশীল আর আসন চ্যুতি হলেই একজন সাধারণ মানুষ বরং রসূল যে সময় থেকে রিসালাতের পদমর্যাদায় সমাসীন সে সময় থেকে আমৃত্যু তিনি প্রতি মুহূর্তের জন্য রসূল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপদ যে সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি করে তাকে পাঠানো হয়েছে সে সাম্রাজ্যের পলিসির খেলাফ কোনো কাজ তিনি করতে পারেন না। তাঁর ইমাম কিংবা আমীর হওয়ার মর্যাদা, বিচারক কিংবা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষক হওয়ার মর্যাদা, একজন নাগরিক কিংবা একজন স্বামী, পিতা, ভাই, বন্ধু আত্মীয় হওয়ার সবকিছুর ওপর তাঁর রিসালাতের মর্যাদা এমনভাবে ছেয়ে আছে যে, এক মুহূর্তের জন্য তা তাঁর যুক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। এমনকি যখন তিনি নির্জনে আপন স্ত্রীর সাথে থাকেন তখনও তিনি আল্লাহর রসূল, ঠিক তেমনি মসজিদে নামায পড়ার সময় তিনি আল্লাহর রসূল।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যাকিছু করেন তা আল্লাহর হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েই করেন। সবসময় তাঁর ওপর আল্লাহর দৃষ্টি থাকে যার অধীনে তিনি আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যেই চলতে বাধ্য হন। যদি তাঁর সামান্যতম পদস্খলনও ঘটে তবে তাকে তৎক্ষণাৎ সাবধান করে দেয়া হয়। কেননা তাঁর ভ্রম শুধুমাত্র তারই ভ্রম নয় বরং একটি পুরো জাতির ভ্রম। সুতরাং ভুল ও স্খলন হতে তাঁর নিরাপদ থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে করে পূর্ণ নির্ভরতার সাথে তাকে

www.pathagar.com

অনুসরণ ও অনুকরণ করা যায় এবং তাঁর কথা ও কাজকে সঠিকভাবে ইসলামের শিক্ষা ও ইসলামিয়াতের মানদণ্ড ঘোষণা করা যায়।

মাওলানার দৃষ্টিতে নবুয়াতের তাৎপর্য

আরো অগ্রসর হয়ে নবুয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনার কথা উল্লেখ করে মাওলানা বলেছেন ঃ

"কুরআন মজীদে নবীদের অবস্থা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা দেখে নবুয়াতির তাৎপর্য সম্পর্কে আমার এরূপ মনে হয়নি যে, আল্লাহ তায়ালা আচমকা কোনো পথচারীকে ধরে নিয়ে নিজের কিতাব লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা কোনো ব্যক্তিকে নিজের পয়গাম্বরীর জন্যে এমনভাবে নির্দিষ্ট করেছেন যে, তিনি আর দু' দশটা কাজের সাথে পয়গাম্বরীর দায়িত্বও পালন করবেন। বরং আমি দেখছি, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতির কাছে নবী পাঠানোর ইচ্ছা করেন তখন বিশেষভাবে একজন লোককে নবুয়াতের দায়িত্ব পালন করার জন্যে সৃষ্টি করেন। তাঁকে মানবতার এমন সব উন্নত গুণাবলী এবং উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি দান করেন যা এ গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা সামলানোর জন্যে প্রয়োজন। জন্মের সময় থেকেই বিশেষভাবে তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং যত্ন নিয়েছেন। নবুয়াত প্রদানের আগেও তাকে চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি, ভুল ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁকে এমন পরিবেশে লালিত-পালিত করেছেন যেখানে তাঁর নবুয়াতের যোগ্যতা উন্নতি লাভ করে বাস্তবায়িত হওয়ার দিকে ধাবিত হয়েছে। তারপর যখন তিনি সম্পূর্ণতায় পৌঁছে গেছেন তখন তাকে নিজের কাছ থেকে ইল্‌ম ফায়সালা করার শক্তি এবং হেদায়াতের আলো দিয়ে নবুয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। যাতে তিনি ভুল না করেন। সে জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সযত্ন তত্ত্বাবধান করা হয়েছে। প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে তাঁকে কঠোরভাবে হেফাজত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়কে তাঁর মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি ও ইজতিহাদের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরং যেখানেই আল্লাহর নির্ধারিত সরল রেখা থেকে তিনি চুল পরিমাণ সরে গিয়েছেন সেখানেই তাঁকে ভুল দেখিয়ে সোজা করে দেয়া হয়েছে। কেননা তাঁকে সৃষ্টি ও প্রেরণ করার উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর বান্দাদেরকে সহজ-সরল পথে পরিচালিত করা। যদি তিনি এ রেখা থেকে চুল পরিমাণ লাইনচ্যুত হয়ে যান তাহলে সাধারণ লোক তা থেকে আরো দূরে চলে যাবে। আমি এখানে যাকিছু বললাম কুরআন তার প্রতিটি অক্ষরের সাক্ষী।"

www.pathagar.com

নবীদের অসাধারণ যোগ্যতা ও পবিত্র প্রকৃতি

নবীদের অসাধারণ যোগ্যতা ও পবিত্রতম স্বভাব-প্রকৃতির উল্লেখ করতে গিয়ে মাওলানা বলেন ঃ

"এভাবে যাদের সৃষ্টি তাঁরা সাধারণ মানুষের মত নন। বরং অসাধারণ যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের প্রকৃতি হয় অত্যন্ত পবিত্র। তাদের মস্তিষ্কের গঠন এমন যে, তা থেকে সহজ-সরল কথাই বের হয়। ভুল এবং বক্রতার লেশমাত্র প্রবণতা তাতে থাকে না প্রকৃতিগতভাবে তাদেরকে এমন করে তৈরি করা হয় যে, ইচ্ছা এবং কোনো রকম চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র মেধা ও স্মৃতিশক্তির বলে এমন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, অন্যান্য লোকেরা চিন্তা-ভাবনার পরও যেখানে পৌঁছতে পারে না। তাদের জ্ঞান অর্জিত নয় বরং প্রকৃতি প্রদত্ত ও দানকৃত। হক ও বাতিল, নির্ভুল ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি তাঁরা স্বভাবগতভাবেই লাভ করে থাকে। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই নির্ভুল চিন্তা করেন। সত্য ও সঠিক বলেন এবং সঠিক কাজ করেন।"

আরো আগে মাওলানা এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কুরআনেরই বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করে একথা প্রমাণ করেছেন যে, নবীগণ নিজেদের গুণাবলী, পূর্ণতা ও জ্ঞান গরিমায় কখনো সাধারণ মানুষের মতো হন না। এবং তাদের চেয়ে নবীগণ অনেক বেশী উন্নত ও উত্তম মর্যাদার অধিকারী হন।

নবীদের ওপর আল্লাহর বিশেষ দৃষ্টি

নবীদর ওপর আল্লাহর বিশেষ দৃষ্টি ও তত্ত্বাবধান সম্পর্কে মাওলানা লিখেছেন ঃ

"তারপর কুরআন মজীদ আমাদেরকে বলছে যে, আল্লাহ তায়ালা নবীদেরকে শুধুমাত্র কৌশল, ফায়সালা করার শক্তি এবং অসাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিই দান করেননি বরং এর সাথে আল্লাহর একটি বিশেষ দৃষ্টিও সবসময় তাঁদের ওপর থাকে। ভুল-ক্রটি থেকে তাদেরকে হেফাজতও করেন। গোমরাহী থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। সে গোমরাহী মানুষের প্রভাবাধীন হোক কিংবা শয়তানের প্রতারণাধীন হোক অথবা তাদের আপন প্রবৃত্তি থেকেই সৃষ্টি হোক। এমন কি যদি তাঁরা মানুষ হওয়ার কারণে ইজতিহাদে ভুল করেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে তাদেরকে সংশোধন করে দেন।"

www.pathagar.com

নবুয়াত নবীর মানবীয় সত্তার অমূল্য সম্পদ তাঁর ব্যক্তি সত্ত্বার সাথে সংযুক্ত নয়

মানব সত্ত্বার সাথে নবুয়াত অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত এবং নবীর মানবত্ব ও নবুয়াত দু'টি স্বতন্ত্র বস্তু অথবা তাঁর নবী সত্ত্বা ও মানব সত্ত্বা। নবুয়াত তাঁর পূর্ণ সত্তার মূল উপাদান। যা জন্মলগ্ন থেকেই নবুয়াতের যোগ্যতা সহ সৃষ্টি করা হয়। এ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মাওলানা বলেন—"নবীর মানবীয় সত্তার সাথে নবুয়াত কোনো অস্থায়ী গুণ হিসাবে সংযুক্ত হয় এবং এ সংযুক্তির পর নবীর মানবত্ব ও নবুয়াত দু'টিহি আলাদা আলাদা থাকে। এমনকি আমরা নবীর জীবনকে দু' ভাগে বিভক্ত করে নবুয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অনুসরণ ও অনুকরণের জন্যে নির্বাচন করে থাকি। কুরআন থেকে নবুয়াতের তাৎপর্যের ওপর যে আলোকপাত হয় তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, নবীগণ যদিও মানুষ এবং মানব প্রকৃতির জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন নবীগণও সে সীমাবদ্ধতায় বাঁধা। কিন্তু এ সীমার ভিতরেও তাদের মানবত্বও চরম ও পরম পর্যায়ের। একজন মানুষের পক্ষে যত সঠিক শক্তি অর্জন সম্ভব নবীগণ চরম মাত্রায় সে শক্তি লাভ করে থাকেন। তাদের অনুভূতি এতো সূক্ষ্ম যে, কোনো রকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই আপন মেধা শক্তি দিয়ে (فالهمها فجورها وتقوىها) আয়াতের মধ্যে ফুজুরও তাকওয়ার ইলহামে ইলাহীর ইশারা করা হয়েছে তা তারা লাভ করতে পারেন। এই প্রকৃতি এতোই নির্ভুল যে, কোনো বাহ্যিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া শুধুমাত্র স্বভাবগত প্রবণতা দ্বারা পাপ পংকিলতার পথ ত্যাগ করে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির পথ গ্রহণ করেন। তাঁর হৃদয়-মন এতোই সহজ-সরল ও নিষ্কলুষ যে, প্রত্যেক ব্যাপারে তিনি আল্লাহর হেদায়াত ঠিকভাবে বুঝতে পারেন। এটাই পূর্ণাংগতর মানবতা। এটা সহজে সঠিক অর্থে আল্লাহর খলীফা হয়ে থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আরো জ্ঞানের আলো লাভ করে তারা সিরাজে মুনীর বা আলো ঝলমল প্রদীপে রূপান্তরিত হন। মানুষের সাধারণ কল্যাণের জন্যে শিক্ষা ও আল্লাহর হুকুম আহকামের অবতরণ ক্ষেত্র বলে ঘোষিত হন এবং পরিভাষায় রিসালাত ও নবুয়াত নামে আখ্যায়িত হয়। সুতরাং এটা মনে করা ঠিক নয় যে, নবুয়াত একটি অস্থায়ী বস্তু যা একটি বিশেষ সময়ে নবীর মানব সত্তার মূল উপাদানের সাথে সংযুক্ত হয়। বরং প্রকৃত সত্য হলো নবুয়াত পূর্ণাংগ মানবতার জন্যে একটি অমূল্য বস্তু যা নবুয়াতের যোগ্যতা দিয়েই সৃষ্টি করা হয়। এবং বাস্তবতার দিকে উন্নতি করতঃ অবশেষে নবুয়াতের মর্যাদায় পৌছিয়ে দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে নবুয়াত একটি জন্মগত বস্তু এবং নবীর ব্যক্তিসত্তাই তার নবী সত্তাও বটে। যদি কোনো পার্থক্য থেকে থাকে তবে তাহলো এতটুকু যে, নবুয়াত প্রাপ্তির আগে তাঁরা পরোক্ষ নবী আর নবুয়াত প্রাপ্তির পর তাঁরা বাস্তব নবী।"

www.pathagar.com

নবীদের ইজতিহাদী পদস্খলন এবং তার বিশ্লেষণ

সর্বশেষে নবীদের ইজতিহাদী ত্রুটি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে মাওলানা লিখেছেন ঃ

"নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য নবীদের ত্রুটিও সে সম্পর্কে আল্লাহর সতর্কীকরণের যে বিবরণ কুরআনে এসেছে তাতে নবীদের ওপর থেকে লোকদের নির্ভরতা উঠে যাওয়া কখনো উদ্দেশ্য নয়। বরং কুরআনের বিবৃতি দ্বারা এটাও ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তায়ালা নবীদেরকে প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে অথবা নিজের রায় এবং মানবসুলভ ইজতেহাদের ওপর চলার জন্যে স্বাধীন করে ছেড়ে দেননি। বরং সদাসর্বদা তাঁর হেদায়াতের অনুসরণ করা এবং জীবনের ক্ষুদ্রতম কাজেও তাঁর মর্জির খেলাফ কাজ না করার বাধ্য-বাধকতা নবীদের ওপর আরোপ করেছেন।

আগে অগ্রসর হয়ে তিনি আরো লিখেছেন

"নবুয়াত ও রিসালাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে নবীর ইজতিহাদও অহীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অহীয়ে খফীর (পরোক্ষ অহী) ইশারা ইংগিত না বুঝে যদি তিনি ইজতিহাদের ক্ষেত্রে চুল পরিমাণও আল্লাহর মর্জির খেলাফ করেন, তাহলে অহীয়ে জলী (প্রত্যক্ষ অহী) দ্বারা তার সংশোধন করা জরুরী মনে করেন।" কুরআনের যেসব আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় ত্রুটির উল্লেখ রয়েছে এবং সেগুলোকে কেন্দ্র করে কতিপয় গোমরাহ ফিরকা রসূল ভুল থেকে মুক্ত নয় বলে (নাউযুবিল্লাহ) যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রসংগে মাওলানা মওদূদী বলেন ঃ "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক যখনই মানবীয় কারণে ইজতিহাদী ত্রুটি ঘটেছে তখনই প্রত্যক্ষ অহী দ্বারা তা সংশোধন করা হয়েছে।

عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى (عبس) مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى

(انفال) عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ (توبة) وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ

اَبَدًا (توبة) يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ـ(التحريم)

উল্লেখিত এ আয়াতগুলো সে কথারই স্বাক্ষ্য বহন করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল থেকে মুক্ত ছিলেন না এবং তিনি ভুল করেছেন একথার প্রমাণ স্বরূপ লোকেরা এ আয়াতগুলো পেশ করে। বিশেষত আহলে কুরআন ফেরকা তো এসব আয়াত দ্বারা রসূলের ভুল অন্বেষণে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করে থাকে। অথচ এসব আয়াত প্রকৃতপক্ষে নবীকে ভুল থেকে বাঁচানোর এবং তাঁকে সংশোধন করার দায়িত্ব যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজে

www.pathagar.com

নিয়েছেন তার প্রমাণ বহন করে। এক জায়গায় নয় বরং বেশ কয়েক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা একথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি সরাসরি নিজের নবীর তত্ত্বাবধান করেন।"-(তাফহীমাত খঃ ১ রিসালাত আওর উসকি আহকাম)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের সারমর্ম

নবুয়াতের মান ও রিসালাতের মর্যাদা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী বিগত আলোচনায় নিজের যে ধ্যান-ধারণা পেশ করেছেন এবং এর বিভিন্ন দিক প্রসংগে যে দৃষ্টিভংগি ব্যক্ত করেছেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

(ক) নবী যদিও আপন সত্তার দিক থেকে মানুষ তথাপি তাঁর মানব প্রকৃতি সর্বোচ্চ গুণাবলী, সর্বোত্তম পূর্ণতা এবং সর্বোৎকৃষ্ট শক্তি ও সামর্থের কারণে অন্যান্য মানব প্রকৃতির মত নয়। বরং তাদের চেয়ে অনেক বেশী উত্তম ও পূর্ণাংগ।

(খ) নবুয়াত ও রিসালাত নবীর জন্মগত বৈশিষ্ট্য। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নবুয়াত ও রিসালাত তার মানব সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং তার কোনো স্বতন্ত্র মর্যাদাও নেই। বরং রিসালাত ও নবুয়াত মানবতা ও মানব প্রকৃতির একটি সম্পূরক অমূল্য উপাদান যা সবসময় তার সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং নবুয়াতের যোগ্যতাসহ সৃষ্টি করা হয়। তারপর বাস্তবতার দিকে উন্নীত হয়ে অবশেষে কার্যতঃ নবী ও রসূল বানিয়ে দেয়া হয়। মোটকথা নবীর ব্যক্তিসত্তা ও তাঁর নবী সত্তা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আপেক্ষিক মাত্র।

(গ) নবীর মধ্যে এমন সব সর্বোচ্চ মানবীয় গুণাবলী এবং উন্নতমানের ধীশক্তি ও আত্মিক শক্তিসমূহ প্রদান করা হয় যা রিসালাতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্যে অতীব জরুরী।

(ঘ) নবীগণ জন্মলগ্ন থেকেই আল্লাহর বিশেষ তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। এমনকি নবুয়াত প্রাপ্তির আগেও তাঁরা চারিত্রিক দোষ, বিভ্রান্তি ও ত্রুটি থেকে নিরাপদ থাকেন।

(ঙ) নবুয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার পরও তার ওপর আল্লাহর কঠোর তত্ত্বাবধান চলতে থাকে। তাই তিনি প্রকৃতির অনুসরণ এবং শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে পুরোপুরি নিরাপদ থাকেন এবং হকের পথ থেকে তার পা চুল পরিমাণও চ্যুত হয় না। যেখানেই তার পা আল্লাহর সিরাতে মুস্তাকিম থেকে সামান্যও বিচ্যুত হয়েছে সেখানেই তাকে ভুল দেখিয়ে দিয়ে ঠিক করে দেয়া হয়। কারণ, তাঁর ভুল শুধু তাঁরই একার ভুল নয় বরং তা পুরো জাতির ভুলে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

(চ) নবীদের স্বভাব-প্রকৃতি অত্যন্ত পূতঃপবিত্র এবং বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। এমনকি বক্রতা ও ভুল প্রবণতার লেশমাত্র তাদের প্রকৃতিতে থাকে না। প্রকৃতিগতভাবে তাদেরকে এমন করে তৈরি করা হয় যে, তাঁরা কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়া শুধুমাত্র মেধা ও ধীশক্তি দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হন অন্যান্য লোক যেখানে চিন্তা-ভাবনা করার পরও পৌঁছতে পারে না।

(ছ) তাঁদের জ্ঞান অর্জিত নয় বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত এবং দানকৃত। হক ও বাতিল, ভুল ও নির্ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা তাঁদের স্বভাবগত ব্যাপার। তাঁরা স্বাভাবিকভাবে সঠিক চিন্তা করেন, নির্ভুল বলেন এবং নিখুঁত আমল করেন।

(জ) মানবিক দুর্বলতা চপলতায় যখনই তাঁদের দ্বারা ইজতেহাদী পদস্খলন ঘটে গেছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং প্রকাশ্য অহী দ্বারা তার সংশোধনও করা হয়েছে, যাতে করে তাঁরা সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র হেদায়াতের অনুসরণ করতে পারেন এবং জীবনের ক্ষুদ্রতম কাজেও আল্লাহ্‌র মর্জির খেলাফ কাজ না করে। কেননা নবীর ইজতেহাদও (গবেষণা) ঠিক অহীর মুতাবেক হওয়া রিসালাতের মর্যাদায় আদিষ্ট হওয়ার অনিবার্য দাবী।

(ঝ) কুরআনে নবীদের দু' একটি ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা এ কারণে উল্লেখ করা হয়নি যে, লোকদের মনের আস্থা তাঁদের ওপর থেকে উঠে যাক। বরং এর উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু বিষয় জানিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে প্রবৃত্তির অনুসরণ অথবা নিজের মতো কিংবা মানবীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে চলার জন্যে ছেড়ে দেননি। বরং আল্লাহ্‌র মর্জির খেলাফ কেশাগ্র পরিমাণ নড়চড় করার বাধ্যবাধকতাও তাদের ওপর আরোপ করেছেন। যাতে পরিপূর্ণ নির্ভরতা সহ তাঁদের অনুসরণ করা যায় এবং তাদের কথা ও কাজে ইসলামের সবটাই যেন শিক্ষা ও যাবতীয় ইসলামী বিষয়ের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

নবুয়াতের উচ্চতম স্থান ও রিসালাতের পদমর্যাদা সম্পর্কে এ হলো মাওলানা মওদূদীর ধ্যান-ধারণা। আল্লাহ্‌র কোনো বান্দা-যার অন্তরে আল্লাহ্ ভীতি আছে, আখেরাতে জবাবদিহির ব্যাপারে যার অন্তর একেবারে অনুভূতিশূন্য হয়ে যায়নি এবং অপরের ছিদ্রান্বেষণ ও সত্য গোপনকে যে পুন্য কাজ মনে করে না সে কি একথা বলার সাহস করতে পারে যে, নবুয়াতের স্থান ও রিসালাতের পদমর্যাদা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর এ চিন্তাধারা ভুল অথবা ত্রুটিপূর্ণ কিংবা নীচু শ্রেণীর ? মাওলানা মওদূদীর ওপর অভিযোগকারী মহোদয়গণ যদি এ চিন্তাধারাকে ভুল অথবা ত্রুটিপূর্ণ কিংবা নীচু শ্রেণীর মনে

www.pathagar.com

করে থাকেন তাহলে মেহেরবাণী করে কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর চেয়ে নির্ভুল ও সঠিক পূর্ণাংগ ও সম্পূরক চিন্তাধারা পেশ করুন। আমাদের জিজ্ঞাসা, নবুয়াতের মান ও রিসালাতের মর্যাদা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর এ চিন্তাধারা ভুল, ত্রুটিপূর্ণ অথবা নীচু শ্রেণীর হয় তাহলে আপনাদের সঠিক ও পূর্ণাংগ চিন্তাধারা কি এটাই হবে যে, নবীদেরকে মানবতার মান ও রিসালাতের মর্যাদা থেকে উঠিয়ে নিয়ে মাবুদ হওয়ার মান ও ইলাহ্ হওয়ার মর্যাদায় পৌঁছে দেয়া ? এবং যে শিরকের মূলোৎপাটনের জন্যে নবীদেরকে পাঠানো হয়েছিলো আমরা নিজেরা সে শিরকেই নিমজ্জিত হয়ে যাবো এবং আমাদের সাথে অন্যদেরকেও ধ্বংসের চক্করে ডুবিয়ে দেবো ?

لعمری ان هذا الشئ عجاب-

এ প্রারম্ভিক কিন্তু মৌলিক বক্তব্য পেশের নিম্নে হযরত মাওলানা কাযী মাযহার হুসাইন সাহেবের অভিযোগের জবাব দেয়া হলো।

অভিযোগের জবাব

হযরত মাওলানা কাযী মাযহার হুসাইন সাহেবের অভিযোগের যে সারমর্ম আমরা আগে পেশ করেছি, তিনি সে অভিযোগে যাকিছু বলেছেন, সেগুলোর সবই আমাদের মতে ভুল ও বাস্তববিরোধী। যেসব কারণে আমরা মাযহার হুসাইন সাহেবের বক্তব্য সঠিক বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। তার একটি হলো—তিনি ১ম অংশে বলেছেন—"হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম কর্তৃক রিসালাতের কর্তব্য আদায় করতে ত্রুটি হওয়া অসম্ভব এবং কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমই একথা লিখেননি।" অথবা দ্বিতীয় অংশে বলেছেন—"রিসালাতের কর্তব্য আদায় করার ক্ষেত্রে নবী কর্তৃক ঢিলেমী হওয়া গোনাহ ও পাপ। আর গোনাহ্ থেকে নবীগণ সর্বসম্মত মতে মাসুম বা নিষ্পাপ। এ ধরনের আকীদা পোষণকারীগণ ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী এবং আহলে সুন্নাতদল থেকে খারিজ।" কিংবা ৩য় অংশে বলেছেন—"হযরত ইউনুস আলাইহিস সাল্লাম আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগে অধৈর্য হয়ে স্বস্থান ত্যাগ করেননি।" এ সমস্ত কথা কেবল আত্মতৃপ্তির জন্যে। অন্যথায় সত্য ও বাস্তবতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বাস্তবতা বরং এর বিপরীত স্বাক্ষ্য দেয়। সত্য ও বাস্তবতার সাথে এসব কথার কোনো সম্পর্ক নেই তা পরে প্রমাণ করা হবে।

দ্বিতীয় কারণ হলো, মাওলানার উল্লেখিত বক্তব্য যেমন সত্য ও বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল নয়, তেমনি তা আগেকার আলেমদের ঐসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুযায়ীও নয়। যা তাঁরা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কাহিনী হিসেবে নিজেদের বিস্তারিত লেখায় উল্লেখ করেছেন। তাঁরা নিজেদের বিস্তারিত লেখায়

www.pathagar.com

সে সমস্ত কথা গ্রহণ করেছেন যেগুলো মাযহার হুসাইন সাহেব এখানে অস্বীকার করেছেন।

তৃতীয় কারণ হলো, কুরআনে এ কাহিনী সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় যে ইশারা-ইংগিত করা হয়েছে অথবা কোনো কোনো প্রমাণিত বর্ণনা ও হাদীস-সমূহে এ কাহিনীর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে, মাওলানা মাযহার সাহেবের বক্তব্য সেগুলোর সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং সেগুলোর বিরোধী। এ কারণে আমরা ঐগুলোকে সঠিক বলে গ্রহণ করেত পারি না এবং তার সাথে একমতও হতে পারি না। "রিসালাতের কর্তব্য আদায় করতে গিয়ে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কিছু ত্রুটি হয়ে গিয়েছিলো" অথবা "তিনি সময়ের আগেই আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন" মাওলানা মওদূদীর বক্তব্য কুরআন, হাদীস ও আগেকার নির্ভরযোগ্য আলেমদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল বলে আমরা মনে করি। কেননা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে প্রখ্যাত আলেম ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশিষ্ট আলেমগণের মত হলো—তাঁর দ্বারা এমন কোনো ত্রুটি অবশ্যই হয়েছিলো যার সম্পর্ক রিসালাতের কর্তব্য পালনের সাথে ছাড়া আর কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো না। আর এ কারণেই তাঁকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তিরস্কার কিংবা শাস্তি স্বরূপ মাছের পেটে রাখা হয়েছিলো। এ বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিককালের তাফসীরকারগণ যাকিছু লিখেছেন মাওলানা মওদূদী নিজের তাফসীরে সূরা সাফ্ফাতের ৮৫ টীকায় সেসব লেখার কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। এখানে সর্বাগ্রে উক্ত টীকাটি হুবহু উদ্ধৃত করা যথার্থ হবে মনে করে নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো।

"হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের এ কাহিনী সম্পর্কে সূরা ইউনুস ও সূরা আম্বিয়ার তাফসীরে আমরা যাকিছু লিখেছি কতিপয় লোক সে সম্পর্কে আপত্তি করেছেন। তাই এখানে অন্যান্য তাফসীরকারদের বক্তব্যও উল্লেখ করা যথার্থ মনে করছি।

সূরা ইউনুসের ৯৮ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে প্রখ্যাত মুফাসসীর কাতাদাহ বলেন ঃ "এমন কোনো জনপদ নেই, যে কুফরী করেছে এবং আযাব আসার পর ঈমান গ্রহণ করেছে তারপর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইউনুস আলাইহিস সালামের কওমই ব্যতিক্রম। তারা যখন নিজেদের নবীকে তালাশ করে পেলো না এবং বুঝতে পারলো যে, আযাব অত্যাসন্ন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে তাওবা করার মানসিকতা সৃষ্টি করে দেন।"–(ইবনে কাসীর ঃ খঃ ২ পৃঃ ৪৩৩)

www.pathagar.com

একই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা আলুসী লিখেছেন—এ জাতির কাহিনী হলো, ইউনুস আলাইহিস সালামকে মুসেলের 'নিনওয়া' এলাকার লোকদের কাছে নবী করে পাঠানো হয়েছিলো। এরা ছিলো কাফের ও মুশরিক। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম এক অদ্বিতীয় লা-শারীক আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে এবং মূর্তি পূজা ছেড়ে দেয়ার জন্যে তাদের প্রতি আহ্বান জানালেন। তারা তা অস্বীকার করলো এবং তাঁকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করলো। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তাদেরকে জানালেন যে, তৃতীয় দিনে তাদের ওপর আযাব আপতিত হবে। তৃতীয় দিন আসার আগেই মধ্য রাতে তিনি উক্ত জনপদ ছেড়ে চলে গেলেন। দিবাভাগে আযাব যখন সে জাতির মাথার ওপর এসে হাজির হলো --- এবং তাদের দৃঢ়বিশ্বাস হলো যে, তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তারা তাদের নবীকে খোঁজ করে পেলো না। অবশেষে তারা নিজেদের ছেলে-মেয়ে ও জীব-জন্তু সহ মাঠে এসে জমা হলো এবং তাওবা করে ঈমানের পথ অনুসরণ করলো --- তাই আল্লাহ তাদের উপর রহম করলেন এবং তাদের দোয়া কবুল করলেন।-(রূহুল মায়ানী খঃ ১১, পৃঃ ১৭০)

সূরা আম্বিয়ার ৮৭ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা আলুসী লিখেছেন ঃ

"হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের নিজের সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাওয়া ছিলো হিজরত করার মতো। কিন্তু এজন্যে তাঁকে আদেশ দেয়া হয়েছিলো না।-(রূহুল মায়ানী খঃ ১৭ পৃঃ ৭৭)

إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔

হযরত ইউনুস আলাইহি সাল্লাম উপরোক্ত দোয়ার তাৎপর্য তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

"অর্থাৎ নির্দেশ আসার আগে হিজরত করতে গিয়ে তাড়াহুড়া করে নবীদের চিরন্তন নীতি বিরোধী কাজ করে আমি অপরাধ করেছি। এটা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে নিজের অপরাধের স্বীকৃতি এবং তাওবার বহিঃপ্রকাশ। যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ মুসিবতকে দূর করে দেন।"-(রূহুল মায়ানী খঃ ১৭ পৃঃ ৭৮)

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ আয়াতের টীকায় লিখেছেন ঃ "যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈমান গ্রহণ করলো না তখন তিনি তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়ে চলে গেলেন। তাদের ওপর থেকে আযাব ফিরে যাওয়ার পরও তিনি নিজে ফিরে আসেননি এবং এভাবে চলে যাওয়ার জন্যে সে আমার আদেশের অপেক্ষা করেনি।"-(বায়ানুল কুরআন)

www.pathagar.com

এ আয়াতের টীকায় মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী লিখেছেন ঃ "কওমের আচরণে রাগান্বিত হয়ে তিনি শহর ছেড়ে চলে গেলেন, আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করলেন না। এবং তিনদিন পর আযাব আসার সময় নির্দিষ্ট করে বলে গেলেন।"

اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ۔

এ আয়াতে নিজের ভুলের স্বীকৃতি যে, "তোমার নির্দেশের অপেক্ষা না করেই নগরবাসীদেরকে ফেলে রেখে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই তাড়াহুড়া করেছি।"

সূরা আস সাফ্ফাতের উপরোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী লিখেছেন ঃ "হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের অপরাধ ছিলো এই যে, যে গোত্র তাঁকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছিলো তাদেরকে ধ্বংস করার ওয়াদা আল্লাহ করেছিলেন। তিনি মনে করলেন এ আযাবের আগমন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তিনি ধৈর্যধারণ না করে জাতিকে দাওয়াত দেয়া বাদ দিয়ে চলে গেলেন। অথচ দাওয়াতের কাজ চালু রাখা তাঁর ওপর ওয়াযিব ছিলো। কেননা ঐসব লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ধ্বংস না করার সম্ভাবনাও অবশিষ্ট ছিলো।"-(তাফসীরে কবীর খঃ ৭ পৃঃ ১৫৮)

আল্লামা আলুসী (اذ ابق الى الفلك المشحون) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ (ابق) এর প্রকৃত অর্থ হলো মনিবের কাছ থেকে পলায়ন করা। যেহেতু হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তাঁর রবের অনুমতি ছাড়াই নিজের কওমকে ছেড়ে পলায়ন করেছিলেন। তাই শব্দটির প্রয়োগ এ ক্ষেত্রে যথার্থ হয়েছে। তারপর অগ্রসর হয়ে লিখেছেন ঃ "যখন তৃতীয় দিন হলো তখন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে গেলেন। এবার যখন লোকেরা তাঁকে খুঁজে পেলো না তখন তারা ছোটবড় সবাই এবং জীব-জন্তুসহ বের হয়ে আসলো। আযাব তাদের একেবারে দ্বারপ্রান্তে ছিলো। এমতাবস্থায় তারা আল্লাহর কাছে মিনতি করলো, ক্ষমা চাইলো, আর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।"-(রুহুল মায়ানী, খঃ ২৩ পৃঃ ১৩০)

মাওলানা শাব্বীর আহমদ সাহেব وَهُوَ مُلِيْمٌ -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "অপরাধ ছিলো এই যে, আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করেই ইজতিহাদী ভুলবশতঃ নগর থেকে তিনি বের হয়ে যান এবং আযাব আসার দিন নির্দিষ্ট করে দেন।"

www.pathagar.com

তারপর সূরা কলমের فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ আয়াতের টীকায় মাওলানা শাব্বীর আহমদ সাহেব লিখেছেন ঃ "অর্থাৎ মাছের পেটে অবস্থানকারী পয়গাম্বরের [হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম] মত মিথ্যাবাদীদের ব্যাপারে সংকীর্ণতা ও অস্থীরতার প্রকাশ করো না।" একই আয়াতের وَهُوَ مَكْظُومٌ অংশের টীকা লিখতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ "অর্থাৎ কওমের লোকদের ওপর তিনি খুব রাগান্বিত ছিলেন। রাগের আতিশয্যে তিনি তাৎক্ষণিক আযাবের দোয়া বরং ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন।"-(তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা সাফফাত, টীকা-৮)

এবার হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা এবং এ বিষয়ের আগেকার আলেম ও তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের আরো কতিপয় উক্তি পেশ করা যাচ্ছে, যাতে এ দাবী প্রমাণিত হবে যে, তিনি ক্রটি করেছিলেন।

প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে দু'টি স্বীকৃত কথা

এক ঃ হযরত ইউনুস আলাইহিস সাল্লাম সম্পর্কে একথা সবার কাছে স্বীকৃত যে, তাঁর কওমের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব এসেছিলো। তবে লোকেরা তাওবা করে আন্তরিকতার সাথে যখন ঈমান গ্রহণ করলো তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের ঈমান গ্রহণ করে আযাব উঠিয়ে নিলেন।

إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ -(يونس :

দুই ঃ এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করে দেয়া অথবা শাস্তি কিংবা তিরস্কার স্বরূপ মাছের পেটে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি সেখানে বন্দী হয়ে ছিলেন। এ দু'টি কথা সামনে রাখলে মস্তিষ্কে স্বতঃই এ প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় গৃহীত বিধানের খেলাফ (আযাবের আলামত দেখে ঈমান গ্রহণ কারো জন্যে উপকারী নয়) ইউনুস আলাইহিস সালামের কওমের ঈমান কবুল করে তাদের ওপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেন এবং তাদের জন্যে এ বাধ্যবাধক ঈমান পরিশেষে কি কারণে উপকারী হলো ? এর কারণই বা কি ছিলো ?

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে কেন নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্যে মাছের পেটে রাখা হলো ? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী বলেছেন ঃ উপরোক্ত দু'টি জিনিস এ কারণে হয়েছে যে, "একদিকে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম রিসালাতের কর্তব্য পালনে কিছুটা ক্রটি করেছেন ;

www.pathagar.com

অন্যদিকে সময় আসার আগেই তিনি আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। সুতরাং সে কওমকে আযাব দেয়া আল্লাহর ইনসাফে সঠিক মনে হয়নি। কেননা, দলীল উপস্থাপন করার যে শর্ত রয়েছে তা জাতির জন্যে পূরো করা হয়নি।" এবং হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকেও একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মাছের পেটে রাখা হয়।

"হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম রিসালাতের কর্তব্য আদায় করতে গিয়ে এটি করেছেন" এবং "তিনি আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে স্থান ত্যাগ করে চলে গেছেন" মাওলানার একথা দু'টি তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত বানানো কথা শুধু নয় ; বরং মাওলানার অনেক আগে বড় বড় আলেম ও প্রখ্যাত চিন্তাবিদগণ একথাগুলো নিজেদের গ্রন্থরাজিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। অথচ আজ পর্যন্ত কেউ তাঁদের সম্পর্কে এমন উক্তি করার সাহস করেনি যে, এসব আলেম হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে অশ্রদ্ধা করেছেন অথবা তাঁর সাথে বে-আদবী করেছেন কিংবা তাঁরা ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী হয়ে গেছেন। নিম্নে তাঁদের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করা হলো। এসব উক্তিতে উল্লেখিত কথা দু'টির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এবং হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে এগুলো নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।

ইমাম বাগাবী এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় তাফসীরকারদের ব্যাখ্যা

'মুয়ালিমুত তানযিল' প্রণেতা ইমাম বাগাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি وذا النون اذ ذهب مغاضبًا এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

اختلفوا فى معناه فقال الضحاك مغاضبا لقومه وهو رواية العوفى عن ابن عباس قال كان يونس وقومه يسكنون فلسطين فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة اسباط فاوحى اللّه الى شعياء النبى ان اذهب الى حزقيل الملك وقل له يوجه نبيا قويا فقال له الملك فمن ترى ؟ فقال يونس فانه قوى امين۔

فدعا الملك بيونس فامره ان يخرج فقال له يونس هل امرك اللّه باخراجى قال لا ۔ فقال هل سمانى ؟ قال لا ۔ قال فهھنا غيرى انبياء اقوياء فالحوا عليه فخرج من بينهم مغاضبا للنبى وللملك ولقومه ۔

"আলেমগণ এ আয়াতের অর্থে মতপার্থক্য করেছেন। দাহ্হাক বলেন (مُغاضبًا) দ্বারা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের নিজ গোত্রের লোকদের উপর রাগ করা বুঝানো হয়েছে। আওফী ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

www.pathagar.com

থেকে একথা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম স্বজাতিসহ ফিলিস্তিনে বসবাস করতেন। তাঁদের সাথে এক রাজা যুদ্ধ করে নয়টি পরিবারকে বন্দী করে নিয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা হিযকীল রাজার কাছে গিয়ে একজন শক্তিশালী নবীকে আক্রমণকারী রাজার সাথে যুদ্ধ করার জন্যে হযরত শা'ইয়া নবীর কাছে অহী পাঠালেন। হযরত শা'ইয়া আলাইহিস সালাম যখন পয়গাম নিয়ে হিযকীল বাদশাহর কাছে আসলেন তখন বাদশাহ নবীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাকে উপযুক্ত মনে করেন। হযরত শা'ইয়া আলাইহিস সালাম বললেন, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে। তিনি শক্তিশালী আবার আমানতদারও। বাদশাহ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে ডেকে বললেন ঃ তুমি জিহাদের জন্যে রওয়ান হয়ে যাও। ইউনুস আলাইহিস সালাম বললেন ঃ আল্লাহ আমাকেই যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কি ? বাদশাহ বললেন ঃ না। তারপর ইউনুস আলাইহিস সালাম বললেন ঃ আল্লাহ কি আমার নাম নির্দিষ্ট করে বলেছেন। বাদশাহ বললেন ঃ না। তাতে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম বললেন, আমাকে ছাড়া এখানে আরো শক্তিশালী নবী আছেন (তাদেরকে পাঠানো হচ্ছে না কেন ?) কিন্তু বাদশাহ তাকেই বাধ্য করলেন। তিনি নবী, বাদশাহ ও স্বজাতির ওপর রাগ করে জিহাদের জন্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।"

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের রাগ হওয়ার প্রথম ব্যাখ্যা

ইমাম দাহহাকের নামে এটা আয়াতের প্রথম বিশ্লেষণ। ইমাম দাহহাক (مغاضبا) শব্দ দ্বারা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের স্বজাতির সাথে রাগ হওয়া বুঝেছেন। আর রাগ হওয়ার কারণ হলো—যখন তাঁর কাছে হযরত শা'ইয়া নবী এবং হিযকীল বাদশাহর মারফতে জিহাদের জন্যে রওয়ানা হওয়ার আল্লাহর নির্দেশ পেশ করা হলো তখন তিনি আল্লাহর এ নির্দেশ পালন করতে গড়িমসি করে বললেন ঃ "আল্লাহ এ কাজের জন্যে নির্দিষ্ট করে আমার নাম তো উল্লেখ করেননি। যখন আমার নাম বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়নি তখন আপনি কেন আমার নাম নিচ্ছেন এবং আমাকে এ কাজে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন ? এখানে তো আরো নবী উপস্থিত আছেন যারা এ কাজ সম্পন্ন করার জন্যে আমার মতো উপযুক্ত। এরূপ দীর্ঘ বাকবিতণ্ডার পরও যখন বাদশাহ হিযকীল এবং অবশিষ্ট নবীগণ তাঁকেই জিহাদে যাওয়ার জন্যে বাধ্য করলেন তখন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম এ বাধ্যবাধকতাকে নিজের ওপর চাপ মনে করে কওমের ওপর রাগ করলেন এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নেহায়েত অনিচ্ছায় জিহাদের জন্যে বের হয়ে গেলেন।"

www.pathagar.com

'কওমের ওপর রাগ করার জন্যে' এ কারণটি যুক্তিসংগত নয়

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কওমের ওপর রাগ করার যে কারণ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে আপাতঃ দৃষ্টিতে তার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। কেননা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে যাওয়ার জন্যে যদি চাপ প্রয়োগ করা হয়েও থাকে তবে সেটা বাদশাহ হিযকীল, হযরত শা'ইয়া এবং অন্যান্য নবীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, কওমের পক্ষ থেকে নয়। কারণ, এ বর্ণনায় কওমের কথা আদৌ উল্লেখিত হয়নি। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যদি রাগ করেন তাহলে বাদশাহ হিযকীল হযরত শা'ইয়া এবং অন্যসব নবীদের ওপর রাগ করতে পারেন। কওমের সাথে রাগ করার এটা কোনো সংগত কারণ নয়। আমাদের মতে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের তাঁর কওমের ওপর রাগ করার আসল কারণ শুধু সেটা যা আল্লামা সাইয়েদ আলুসী তাঁর বিখ্যাত তাফসীর রূহুল মায়ানীর ১৭ খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

اى غضبان على قومه لشدة شكيمتهم وتمادى اصرارهم مع طول دعوته اياهم ـ ١هـ

> "অর্থাৎ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম স্বজাতির ওপর রাগ করে এ কারণে রওয়ানা হয়ে গেলেন যে, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সত্যের দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও লোকগণ পাষাণ হৃদয় ও মজ্জাগত রূঢ়তার কারণে কুফরীর ওপরই দৃঢ়মূল থাকে।"

ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রাগ হওয়ার যে কারণ বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে হিযকীল বাদশাহর ওপর রাগ হওয়ার কারণ, কওমের ওপর রাগ হওয়ার কারণ নয়। এ কারণেই আল্লামা আলুসী রাহ্‌মাতুল্লাহ্ আলাই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর উল্লেখিত রেওয়ায়েতকে হিযকীল বাদশাহর ওপর রাগ করার কারণ স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। নিম্নের দ্বিতীয় কারণটি প্রণিধানযোগ্য।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এবং রাগ হওয়ার কারণ

আয়াতে (مغاضبا) শব্দের তাফসীরে আল্লামা সাইয়েদ আলুসী নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

وقيل غضبان على الملك حزقيل فقد روى عن ابن عباس انه قال كان يونس وقومه يسكنون فلسطين فغزهم ملك وسبى منهم تسعة اسباط

فاوحى الله الى شعياء ان اذهب الى حزقيل الملك وقل له يوجه نبيا قويا فقال له الملك فمن ترى ؟ قال يونس فانه قوى امين ـ الخ

"কেউ কেউ বলেন, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম বাদশাহ্ হিযকীলের ওপর রাগ করেছিলেন। এর কারণ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তাঁর জাতির লোকসহ ফিলিস্তিনে বসবাস করতেন। একজন বাদশাহ্ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং নয়টি পরিবারকে বন্দী করে নিয়ে যায়। সে সময় আল্লাহ্ তায়ালা হযরত শা'ইয়া নবীকে হিযকীলের কাছে গিয়ে আক্রমণকারী রাজার বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী নবীকে জিহাদের জন্য পাঠাতে অহী মারফত নির্দেশ দেন। হিযকীল বাদশাহ্ হযরত শা'ইয়া আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, এ প্রসংগে আপনার মত কি ? তিনি বললেন ঃ এ কাজের জন্যে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যথোপযুক্ত। কেননা, তিনি শক্তিশালী এবং সাথে সাথে আমানতদারও বটে।"

এ ব্যাখ্যার সারমর্ম হলো (مغاضبا) দ্বারা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের হিযকীল বাদশার ওপর রাগান্বিত হওয়া। আর রাগ হওয়ার কারণ হলো, ইবনে আব্বাসের পূর্ববর্তী বর্ণনায় প্রথম ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে ইমাম বাগাবীর উদ্বৃতিতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা। অর্থাৎ তোমাকেই জিহাদ করার জন্যে বের হতে হবে।" হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ওপর হিযকীল বাদশাহর একথার মাধ্যমে বার বার চাপ দেয়া।

তৃতীয় ব্যাখ্যা

সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরে পূর্ববর্তী মুফাসসিরদের ইমামদের মধ্যে ইমাম বাগাবী ও অন্যান্য তাফসীরকারদের নিম্নোক্ত বাক্যগুলো তৃতীয় ব্যাখ্যা স্বরূপ উল্লেখযোগ্য ঃ

وقال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة ذهب عن قومه مغاضبا لربه اذكشف العذاب عن قومه بعد ما اوعدهم ..... ـ

"ওরওয়াহ ইবনে যুবাইর, সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং একটি দলের মতে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আপন রবের ওপর রাগ করে নিজের কওমকে পরিত্যাগ করে চলে যান। রাগের কারণ হলো—হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম কওমকে আযাব আসার ধমক দিয়েছিলেন। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা তাদের থেকে আযাব উঠিয়ে নেন।"

www.pathagar.com

وقال الحسن انما غاضب ربه عز وجل من اجل انه امره بالمسير الى قومه لينذرهم باسه ويدعوهم اليه فسال ربه ان ينظره ليتأهب للشخوص اليهم فقيل له ان لامر اسرع من ذلك حتى سأل ان ينظر الى ان يأخذ نعلا يلبسها فلم ينظر وكان فى خلقه ضيق فذهب مغاضبا ـ

"হাসান বসরীর মতে আল্লাহর ওপর রাগ করার কারণ ছিলো এই যে, আল্লাহ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে কওমের কাছে গিয়ে আযাব আসার ভয় দেখানো এবং তাদেরকে সত্যের দাওয়াত দেয়ার আদেশ করেন। তাতে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে কওমের কাছে পৌঁছার মতো সময় চেয়ে দরখাস্ত পেশ করেন। কিন্তু জবাবে বলা হলো ব্যাপারটি খুবই সংগীন, এতে সময় দেয়া যেতে পারে না। তিনি অন্তত জুতা পরার সময় চেয়ে আবার দরখাস্ত পেশ করলেন, কিন্তু তজ্জন্য সময় পাওয়া গেলো না। তিনি ছিলেন রূঢ় ও মেজাজী। তাই তিনি রাগ করে চলে যান।"

وقال وهب بن منبه ان يونس كان عبدا صالحا وكان فى خلقه ضيق فلما حمل عليه اثقال النبوة تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل فقد فها بين يديه وخرج ها ربامنها ـ فلذالك اخرجه الله من اولى العزم من الرسل ـ وقال لنبيه محمد صلعم ـ فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل ـ ولا تكن كصاحب الحوت ـ ١هـ

"ওহাব বিন মুনাব্বাহ বলেন, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যদিও নেককার বান্দা ছিলেন, তথাপি তাঁর মেজাজ ও প্রকৃতি ছিলো রূঢ়। যখন নবুয়াতের দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে অর্পণ করা হলো তখন তিনি এ বোঝার নীচে কম বয়সী উট যেমন অতি বোঝায় হাঁপিয়ে ওঠে ঠিক তেমনি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেন। এজন্যে তিনি নবুয়াতের এ বোঝাকে সেখানেই নিক্ষেপ করে ফেলে দেন এবং পালিয়ে আসেন। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নাম উলুল আযম পয়গাম্বরদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা বললেন ঃ উলুল আযম পয়গাম্বরদের মত সবর করো এবং মৎস ওয়ালা নবীর (ইউনুস) মতো হয়ো না। (অর্থাৎ তাঁর মতো অধৈর্য হইও না)।"

তাফসীরের ইমামদের তিনটি ব্যাখ্যার সারমর্ম

প্রথম ব্যাখ্যা হলো হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম স্বগোত্রীয় লোকদের সাথে রাগ করেছিলেন। (مغاضبا) শব্দ দ্বারা কওমের সাথে রাগ করাই

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আওকীর যে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে তাতে এ ব্যাখ্যারই উল্লেখ আছে। পূর্ববর্তী শীর্ষস্থানীয় তাফসীরকারদের মধ্যে ইমাম দাহহাক এটা গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী তাফসীরকারদের মধ্যে আল্লামা সাইয়েদ আলুসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রুহুল মায়ানীর ১৭ খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় ব্যাখ্যার উপর এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তৎকালীন বাদশাহ হিযকীলের ওপর রাগান্বিত হয়েছিলেন। কেননা, তিনি হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে বিশেষ করে জিহাদের জন্যে মনোনীত করে বলেছিলেন ঃ তোমাকেই জিহাদের জন্য যেতে হবে। এ ব্যাখ্যা অনুসারে (مغاضبا) শব্দ দ্বারা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে সমকালীন বাদশাহ হিযকীলের ওপর রাগ করা অর্থ হবে।

তৃতীয় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তাঁর রবের ওপর রাগান্বিত হয়েছিলেন (مغاضبا) শব্দ দ্বারা তার এ রাগই বুঝানো হয়েছে। উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, হাসান বাগাবী, ইমাম শা'বী এবং ওহাব বিন মুনাববিহ প্রমুখদের মত বড় বড় আলেম উপরোক্ত আয়াতাংশের এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকেও এরূপ তাফসীর বর্ণিত আছে। রুহুল মায়ানীর ১৭ খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর ওপর রাগ করে চলে যান। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুও আয়াতের উপরোক্ত অর্থ বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত তিনটি ব্যাখ্যায়ই যে কথাটি পাওয়া যায় তাহলো হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের রাগান্বিত হওয়া। এ বিষয়ে তিনটি ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কোনো পার্থক্য থেকে থাকলে তা অপর দু'টি বিষয়ে ছিলো। একটি হলো, তিনি কার ওপর রাগান্বিত হয়েছিলেন ? দ্বিতীয় হলো, তাঁর রাগান্বিত হওয়ার কারণ কি ছিলো ? প্রথম কথাটি উপরোক্ত তিনটি ব্যাখ্যায় বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা অর্থাৎ রাগ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

রাগের কারণ

প্রথম ব্যাখ্যায় আল্লামা সাইয়েদ আলুসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বক্তব্যে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের রাগ হওয়ার কারণে এটা বলা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম নিজের কওমকে দীর্ঘদিন যাবত সত্য ও ন্যায়ের দাওয়াত দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু তাতে কওমের মধ্যে কোনো প্রভাব

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়নি বরং তারা অহংকার ও দাম্ভিকতায় মত্ত থাকে। এজন্যে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তাদের ওপর রাগ করে চলে যান। "তিনি একথাও পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, কওমকে ছেড়ে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের এই চলে যাওয়া যদিও হিজরতের মতো ছিলো। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সে হিজরত করার কোনো অনুমতি ছিলো না। তিনি লিখেছেন ঃ

ای غضبان علی قومه لشدة شکیمتم وتمادی اصرارهم مع طول دعوته ایاهم ـ وکان ذهابه هذا منهم هجرة عنهم لکنه لم یومربه ـ ١هـ

"হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম কওমের ওপর এ কারণে রাগ করেছিলেন যে, দীর্ঘদিন যাবত তাদের কাছে দাওয়াত পেশ করা সত্ত্বেও চরম পাষণ্ডতার কারণে তারা কুফরীর উপরই দৃঢ় থাকে। এ কারণে তিনি রাগ করে চলে যান। কওমকে পরিত্যাগ করে তাঁর চলে যাওয়া যদিও ছিলো হিজরত কিন্তু হিজরত করার জন্যে তাঁকে অনুমতি দেয়া হয়েছিলো না।"

দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রাগ হওয়ার যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তার সারমর্ম হলো—যখন হযরত শা'ইয়া আলাইহিস সালাম এবং হিযকীল বাদশাহর পক্ষ থেকে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে বার বার চাপ দেয়া হলো, তখন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আমার কথা তো আল্লাহ নির্দিষ্ট করে বলেননি এবং বিশেষ করে আমাকে যাওয়ার আদেশও করেননি, তাহলে আমাকে আপনারা অযথা কেন বাধ্য করছেন ? ইত্যাদি ধরনের অনেক টালবাহানা করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন তাঁর কোনো ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হলো না এবং হযরত শা'ইয়া আলাইহিস সালাম এবং হিযকীল বাদশাহও চাপ প্রয়োগের ব্যাপারে দৃঢ়তা দেখান, তখন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম এ চাপকে তাঁর বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি মনে করে হিযকীল বাদশাহর ওপর রাগ করেন এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিহাদের জন্যে বের হন।

তৃতীয় ব্যাখ্যায় প্রভু বা আল্লাহর ওপর হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের রাগ করার যে তিনটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন তিনজন শীর্ষস্থানীয় তাফসীরকারের তাফসীরে উল্লেখ আছে। এর প্রথম কারণ হলো, "হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যেহেতু কওমকে আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার ধমক দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা সত্ত্বেও কওম থেকে আযাব উঠিয়ে নিয়ে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে কওমের সামনে ভুল প্রমাণ করে দেখালেন। এ কারণে আপন রবের ওপর হযরত ইউনুস আলাইহিস

www.pathagar.com

সালামের রাগ হলো এবং অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।" এ কারণটিই ওরওয়াহ ইবনে যুবাইর, সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং একদল প্রাচীন আলেম বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাগাবী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

وقال عروة ابن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة ذهب عن قومه مغاضبا لربه انكشف عن قومه العذاب بعد ما اوعدهم - اهـ

> "ওরওয়াহ ইবনে যুবাইর, সাইয়েদ ইবনে জুবাইর এবং একটি দলের রায় হলো হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আপন রবের সাথে রাগ করে জাতিকে ছেড়ে এ কারণে চলে যান যে, তিনি কওমকে আযাব আসার কথা শুনিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ আযাব উঠিয়ে নিয়েছিলেন।"

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের রাগ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো— হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম দাওয়াতী কাজের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে কওমের কাছে যাওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করার নিমিত্তে কিছু সময় চেয়ে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দরখাস্ত মঞ্জুর হয়নি। এজন্যে তিনি আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যান।

হাসান বসরী হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের রাগান্বিত হওয়ার এ কারণটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বসরীর নিম্নোক্ত কথাগুলো এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঃ

وقال الحسن انما غاضب ربه عز وجل من اجل انه امره بالمسير الى قومه لينذر هم باسه ويدعوهم اليه فسال ربه ان ينظره ليتاهب للشخوص اليهم فقيل له ان الامر اسرع من ذالك فخرج مغاضبا - الخ

> "হযরত হাসান বসরী বলেন, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর ওপর এ কারণে রাগ করেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কওমের কাছে গিয়ে আযাবের ভয় এবং সৎ পথের দাওয়াত দেয়ার আদেশ করলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তাদের কাছে যাওয়ার প্রস্তুতির জন্যে কিছু সময়ের অবকাশ চাইলেন। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব এলো—ব্যাপারটি খুব দ্রুততার দাবী করে। এ ক্ষেত্রে সময় দেয়া যাবে না। এতে তিনি রাগ করে চলে যান।"

রাগ করার তৃতীয় কারণ হলো—হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে রূঢ় মেজাজী ছিলেন। সুতরাং যখন নবুয়াতের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হয় তখন সে দায়িত্বভার ধারণ করার শক্তি তার না থাকার

www.pathagar.com

কারণে তিনি সেখানেই তা পরিত্যাগ করেন এবং আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যান। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উলুল আযম পয়গাম্বরদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেন।

ওহাব বিন মুনাববিহ রাগ করার যে কারণ উল্লেখ করেছেন, ইমাম বাগাবী তা নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

وقال وهب بن منبه ان يونس كان فى خلقه ضيق فلما حمل عليه اثقال النبوة تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل ـ فقذ فها بين يديه وخرجها ربًا ـ ١هـ

"ওহাব ইবনে মুনাববিহ বলেন ঃ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের মেজাজ ও প্রকৃতি ছিলো রূঢ়। যখন তাঁর ওপর নবুয়াতের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো তখন তিনি কম বয়সী উট বেশী বোঝার চাপে যেরূপ ক্লান্ত হয়ে যায় সেরূপ অবসাদগ্রস্ত হয়ে গেলেন। এ কারণে তিনি এ দায়িত্বভার সেখানেই ফেলে রেখে পালিয়ে গেলেন।"

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের চলে যাওয়া কি আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক ছিলো ?

এ পর্যন্ত যাকিছু পেশ করা হলো তা ছিলো হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের রাগান্বিত হওয়া এবং তার কারণ সম্পর্কিত। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম অসহিষ্ণুতার কারণে আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই সে স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন কিনা এখন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তাঁর এরূপ চলে যাওয়াকে কোনো তাফসীরকার রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করতে ত্রুটি বলে আখ্যায়িত করেছেন কিনা ? স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা কুরআন থেকে প্রমাণিত যা অস্বীকার করার কোনোই অবকাশ নেই। এ কারণে উপরে এ কাহিনী সম্পর্কে তাফসীরকারদের যেসব উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে প্রায় তার সবগুলোতেই হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের স্থান ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। তাঁর স্থান ত্যাগ করাটা আল্লাহর অনুমতিক্রমে হয়েছিলো না বিনা অনুমতিতে তা নিয়েও কথা থেকে যায়। এ প্রসংগে রূহুল মায়ানীর নিম্নোক্ত বাক্যটির পুনরুল্লেখ যথেষ্ট মনে করি।

وكان ذهابه هذا منهم هجرة عنهم لكنه لم يومر به ـ ١هـ

"হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের স্থান ত্যাগ করা যদিও হিজরতের মতো ছিলো কিন্তু সে জন্য তাঁকে অনুমতি দেয়া হয়নি।"–(খণ্ড ১৭ পৃঃ-৮৩)

www.pathagar.com

আল্লামা সাইয়েদ আলূসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উপরোক্ত মন্তব্যে একথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম চলে যাওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত এবং অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন না। আল্লাহর অনুমতির অপেক্ষা না করে চলে যাওয়া ধৈর্যহারা হওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে ? বরং অধৈর্য এর কারণ হতে পারে। আর এ ত্রুটি ও পদস্খলনের পরিণতিতেই তিনি মাছের পেটের অন্ধকার জেলখানায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বন্ধীত্বের দুর্বিসহ জীবন কাটান। পবিত্র কুরআনে নবীদের যে ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করে দেখুন। কোনো নবী আল্লাহর অনুমতি ছাড়া স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন এমন কথা আপনি কোথাও পাবেন না। পক্ষান্তরে আপনি অবশ্যই পাবেন যে, যখন কোনো নবীর উম্মতের ওপর আযাব আসার ফায়সালা করা হয়েছে তখন নবীগণ আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে বের হওয়ার অনুমতি পাওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁরা তাবলীগ ও হেদায়াতের কাজে মগ্ন থাকতেন, কখনো স্থান ত্যাগ করতেন না।

واصنع الفلك باعيننا ووحينا ..... حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين -

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম উপরোক্ত নির্দেশ পাওয়া পর্যন্ত বরাবর আপন কওমকে হেদায়াত করতে থাকেন এবং কোথাও বের হননি।

এমনিভাবে হযরত লূত আলাইহিস সালাম (فاسر باهلك بقطع من الليل) এ আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত দাওয়াতের কাজে নিমগ্ন থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হিজরত করার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত মক্কাবাসীদেরকে ক্রমাগতভাবে দ্বীন ও ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। হিজরত করার অনুমতি পাওয়ার পরেই কেবল তিনি মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে আসেন।

যা হোক, আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো নবী স্থান ত্যাগ করে চলে গেছেন নবীদের জীবন ইতিহাসে এমন কোনো উদাহরণ পাওয়া যাবে না। কেবলমাত্র হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামই অনুমতি ছাড়াই স্থান ত্যাগ করে চলে যান। অথচ তাঁর জন্যে উচিত ছিলো আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা করা এবং আদেশ না আসা পর্যন্ত দীনের তাবলীগ ও সত্যের দাওয়াত পেশ করতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন থাকা। ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ বিষয়টাকেই অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি গোনাহের কারণের উপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

والاقرب فيه وجهان - الاول ان ذنبه كان لان الله تعالى وعده انزال الاهلاك بقومه فظن انه نازل لامحالة فلاجل هذا الظن لم يصبر على دعائهم فكان الواجب عليه ان يستمر على الدعاء-

"গোনাহের দু'টি কারণের সম্ভাবনা বেশী। তাঁর গোনাহের একটি কারণ হলো কওমের ওপর আযাব নাযিল হবে বলে আল্লাহ্ তাঁর সাথে ওয়াদা করেছিলেন। তাতে আযাব অবশ্যই নাযিল হবে বলে তার বিশ্বাস ছিলো। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি কওমকে দাওয়াত দেয়ার ধৈর্যধারণ করতে পারেনি। অথচ দাওয়াত দেয়ার কাজে অনবরত নিয়োজিত থাকা তাঁর উচিত ছিলো।"-(তাফসীরে কবীর খণ্ড ৭ পৃঃ ১৫৮)

হিজরত করার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কওমকে হেদায়াত করা এবং অধৈর্য হয়ে স্থান ত্যাগ না করা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ওপর ওয়াজিব ছিলো একথা উপরোক্ত বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। কিন্তু তিনি এটা না করে অধৈর্য হয়ে স্থান ত্যাগ করেছিলেন।

এখন সম্মানিত অভিযোগ উত্থাপনকারীগণ বলুন, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম অধৈর্য হয়ে নিজের স্থান ত্যাগ করেছিলেন কিনা ? অধৈর্যের কারণে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর চলে যাওয়া কি ত্রুটি নয় ? অথচ নিজের কওমকে হেদায়াত করা এবং অধৈর্য হয়ে চলে না যাওয়া তাঁর কর্তব্য ছিলো। তাঁর এ ত্রুটি রিসালাতের কর্তব্য আদায়ের সাথে সম্পর্কিত ছিলো কিনা ? এসব উক্তি ও বক্তব্যের কারণে মাওলানা মওদূদীকে যদি ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারিজ ঘোষণা করা হয়, তাহলে ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি সম্পর্কে কি অভিমত ব্যক্ত করা হবে ? তিনিও তো একই কথা লিখেছেন।

উপরোক্ত আলোচনার ফলাফল

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে ওপরে যে আলোচনা করা হয়েছে, আয়াতের তাফসীরে পূর্ববর্তী আলেমদের যেসব উক্তি পেশ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে যেসব বিষয় প্রমাণিত হয় আমরা নিম্নে সেগুলোর উল্লেখ করছি। তারপর এর আলোকেই আমরা দেখবো, মাওলানা মওদূদী হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনে যা লিখেছেন সেগুলো আগেকার প্রখ্যাত আলেমদের ব্যাখ্যার অনুরূপ না তার সাথে সাংঘর্ষিক।

আগেকার আলোচনার ভিত্তিতে যা প্রমাণিত হয় অথবা পূর্বেকার আলেমদের উল্লেখিত উক্তিসমূহে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের প্রতি যেসব দুর্বলতা ও ত্রুটি সম্পৃক্ত করা হয়েছে সেগুলো হলো এরূপ ঃ

www.pathagar.com

(ক) হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের মধ্যে মিজাজের রূঢ়তা এবং মনের সংকীর্ণতা উপস্থিত ছিলো। كان فى خلقه ضيق

(খ) 'জিহাদের জন্যে বের হও' আল্লাহর এ নির্দেশ যখন হযরত শা'ইয়া নবী অথবা হিযকীল বাদশাহর মাধ্যমে তাঁর কাছে পৌঁছানো হলো তখন আদেশ পালনের ব্যাপারে তিনি গড়িমসি শুরু করে দিলেন এবং এভাবে প্রতিবাদ করলেন ঃ

اهل امرك الله باخراجى ؟ এবং هل سمانى ؟ অথবা فهنا انبياء اقوياء غيرى

(গ) অনেক গড়িমসি করার পর অন্য একজন নবী, বাদশাহ এবং কওমের ওপর রাগ করে বাধ্য হয়ে জিহাদের জন্যে রওয়ানা হলেন।

فخرج من بنينهم مغاضبا للنبى وللملك ولقومه -

(ঘ) "তার কওম থেকে যখন আল্লাহ তায়ালা আযাব উঠিয়ে নিলেন এবং তিনি কওমের সামনে বাহ্যত এক প্রকার ওয়াদা ভংগকারীরূপে প্রমাণিত হলেন তখন তিনি আল্লাহর ওপর রাগান্বিত হলেন।"

ذهب عن قومه مغاضبا لربه اذكشف عنهم العذاب بعد ما اوعدهم -

(ঙ) "সত্যের দাওয়াত পেশ করার উদ্দেশ্যে কওমের কাছে যাওয়ার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন তাঁকে আদেশ দেয়া হলো তখন তিনি আল্লাহর কাছে কিছুটা সময় চাইলেন। যখন তাঁকে সময় দেয়া হলো না তখন আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ক্রোধান্বিত অবস্থায় রওয়ানা হয়ে গেলেন।"

(চ) হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যদিও নেক বান্দা ছিলেন। কিন্তু স্বভাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন দুর্বল এবং মেজাজ ছিলো রূঢ়। নবুয়াতের দায়িত্বভার অর্পিত হলে তিনি সে বোঝা বহন করতে অক্ষম হয়ে সেখানেই তা পরিত্যাগ করলেন এবং পালিয়ে গেলেন। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নাম উলুল আযম পয়গাম্বরদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেন।

উপরোল্লেখিত কথাগুলো আগের আলোচনার পূর্ববর্তী আলেমদের উক্তি এবং বিশ্লেষণমূলক লেখায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আল্লামা সাইয়েদ আলুসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহ আলাই-হির লেখায় অতিরিক্ত আরো তিনটি কথা আছে ঃ

(১) হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে স্থান ত্যাগ করে চলে যান।

www.pathagar.com

وكان ذهابه هذا منهم هجرة عنهم لكنه لم يومر به ـ

(২) নিজ জায়গায় অবস্থান করতঃ দীনের তাবলীগ ও সত্যের দাওয়াত অনবরত পেশ করা এবং স্থান ত্যাগ না করা ইউনুস আলাইহিস সালামের ওপর ওয়াজিব ছিলো।

(৩) কিন্তু তিনি তাবলীগ ও দাওয়াতের ওপর দৃঢ় থাকতে পারলেন না। বরং অধৈর্য হওয়ার কারণে ওয়াজিব কাজ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

فلم يصبر على دعاءهم ـ وكان الواجب عليه ان يستمر على الدعاء ـ

মাওলানা কাযী মাযহার হুসাইন সাহেব এবং অন্যান্য অভিযোগকারীদের কাছে একটি প্রশ্ন

উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আলোকে মাওলানা কাযী মাযহার হুসাইন সাহেব এবং মাওলানা মওদূদীর অন্যান্য বিরোধীদের কাছে কি আমাদের এ প্রশ্ন করার আছে যে, পূর্ববর্তী আলেম এবং তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের ভাষ্যে যেসব কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোর সারকথা দুর্বলতা এবং ঢিলেমী কিনা ? ঐগুলোর অধিকাংশ রিসালাতের দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো কিনা ? যেমন, আল্লাহর পক্ষ থেকে জিহাদ করার নির্দেশ পাওয়ার পরও হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের গড়িমসি ও প্রতিবাদ করা, এই বলে যে ঃ

هل امرك الله باخراجى ? এবং اهل سماى ? অথবা فهنا انبياء اقوياء غيرى

এমনিভাবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া অধৈর্য হয়ে স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়া অথচ স্থানে অবস্থান করে দাওয়াত ও দীনের কাজে অবিরত লেগে থাকা তাঁর জন্যে ওয়াজিব ছিলো। এ সমস্ত কাজ কি ত্রুটি নয় যা রিসালাতের কর্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। এসব দুর্বলতা ও অসতর্কতা প্রাচীন যুগের আলেমদের উল্লেখিত বক্তব্যে স্পষ্টভাবে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দিকে সম্বোধন করা হয়নি কি ? এসব প্রশ্নের জবাব যদি হ্যাঁ সূচক হয় এবং অবশ্যিই হাঁ সূচক হবে তাহলে জনাব মাওলানা মাযহার হুসাইন সাহেব এবং অন্যান্য বিরোধীদের এ অভিযোগের মূল্য কতটুকু যে ঃ

"রিসালাতের কর্তব্য আদায় করতে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম অসতর্ক ছিলেন না। কেননা, রিসালাতের কর্তব্য আদায় করতে গিয়ে নবী কর্তৃক অসাবধানতা অবলম্বন করা অসম্ভব। কোনো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য আলেমই এ ধরনের কথা লিখেননি।"

এ সমস্ত ওলামায়ে সলফ এবং তাফসীরের ইমামগণ কি আপনার মতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য আলেম নন যাঁরা উল্লেখিত সমস্ত দুর্বলতা ও অসতর্কতা

www.pathagar.com

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন ? আপনার মতে যখন এ ধরনের অসাবধান হওয়া অসম্ভব তখন উপরোল্লেখিত তাফসীরের ইমাম ও প্রখ্যাত আলেমগণ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম কর্তৃক এ ধরনের অসম্ভব অসাবধানতা সংঘটিত হওয়ার বিষয় কিভাবে মেনে নিলেন এবং তারা নবীর প্রতি এসব অসতর্কতা বা ক্রটি সম্পর্কিত হওয়া স্বীকার করলেন কেমন করে ?

তারপর আপনার এ ভাষণ—"নবী কর্তৃক রিসালাতের কর্তব্য আদায় করতে গিয়ে অসাবধান হওয়া অন্যায় ও গোনাহ্। যে ব্যক্তি এ ধরনের আকীদা পোষণ করে সে ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী এবং আহলে সুন্নাত দল থেকে খারিজ।" কিভাবে সঠিক বলে গ্রহণ করা হবে ? অথচ উরওয়া ইবনে যুবাইর, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং ওহাব ইবনে মুনাববিহ্র মতো প্রখ্যাত আলেম ও উম্মতের শীর্ষস্থানীয় গবেষকগণ এর বিপরীত কথার সমর্থক। তাঁদের মতে এ ধরনের অসাবধানতা নবীগণ কর্তৃক কেবলমাত্র সংঘটিত হওয়াই যে সম্ভব তা নয় বরং বাস্তবেও সংঘটিত হয়েছে। আল্লামা আলুসী এবং ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিও একথার সমর্থক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আপনার মতে এ সমস্ত আলেম কি ইসমতে আম্বিয়া অস্বীকারকারী এবং আহলে সুন্নাত দল বহির্ভূত ? 'হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগে অধৈর্য হয়ে স্থান ত্যাগ করে চলে যাননি'—আপনার একথাও ভিত্তিহীন। কেননা সময়ের আগে অধৈর্য হয়ে যদি তিনি না গিয়ে থাকেন তাহলে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিভাবে বললেন ঃ

فلا جل هذا الظن لم يصبر على دعائهم وكان الواجب عليه ان يستمر على الدعاء؟

তারপর কুরআনের এ ইরশাদের তাৎপর্য কি ?

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ ؟

"আপন রবের হুকুমের অপেক্ষা করো, মৎস ওয়ালা পয়গাম্বরের [হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম] মতো হইও না।"

যা হোক, এ তত্ত্ব স্বতঃই স্বীকৃত যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম কর্তৃক অসাবধানতা হয়েছে এবং সেটা রিসালাতের কর্তব্য আদায় সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। এটা পূর্ববর্তী প্রখ্যাত আলেম ও তাফসীরের ইমাম হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন। তাহলে মাওলানা

www.pathagar.com

মওদূদীর একথা বলা–"রিসালাতের কর্তব্য আদায় করতে গিয়ে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের অসাবধানতা হয়ে গিয়েছিলো" পূর্ববর্তী আলেমদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সম্পূর্ণ অনুরূপ, বিরোধী নয়।

এটাই কি ইনসাফ ভিত্তিক দাবী ?

একথা অবশ্যই আমাদের বোধগম্য হওয়ার অনেক উর্ধে যে, আজকের কতিপয় সংকীর্ণমনা মানুষ মাওলানা মওদূদীর রচনায় সামান্য কোনো বিষয়ও তাদের মত ও দৃষ্টিভংগির বিরোধী—পরিপন্থি দেখামাত্র তাদের অস্ত্রাগার মাওলানার বিরোধিতায় তৎপর হয়ে ওঠে এবং তাদের ফতওয়াবাজীর কারখানায় উৎপাদিত কুফর, ফিসক ও গোমরাহির গোলা বর্ষণের মাধ্যমে ফতোয়ার কেন্দ্রগুলো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে। তারা কখনও মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীকে নবীদের অবমাননাকারী বলে অপরাধী সাব্যস্ত করে, আবার কখনো ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারীরূপে অপরাধী সাব্যস্ত করে। কিন্তু সে একই কথা যখন তাদের অন্যদের লেখা ও রচনায় পাওয়া যায় তখন তাদের দূরদর্শী চোখ তাদের ভ্রান্তি ও গোমরাহী দেখতে পায় না। তখন এরা তাদেরকে নবীদের অবমাননাকারী এবং ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারীরূপে অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারে না। বরং তাঁদের লেখাগুলো ব্যর্থবোধক বলে ভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বানিয়ে নেয় যাতে তাদেরকে কোনো অভিযোগের সম্মুখীন হতে না হয়। এটাই কি ইনসাফের দাবী ? তাদের কাছে এমন কোন্ যুক্তিসংগত প্রমাণ আছে যার ভিত্তিতে তারা একই অপরাধে অপরাধী ? মাওলানা মওদূদীকে গলা ধাক্কা পাওয়ার যোগ্য মনে করে এবং অন্যদেরকে মর্যাদা লাভের যোগ্য মনে করে ?

فَهَلْ عِنْدَهُمْ مِنْ عِلْمٍ فَيُخْرِجُوهُ لَنَا ؟ اَمْ يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاءَ هُمْ فَيَمِيْلُوْنَ مَيْلاً عَظِيْمًا ؟

নবীর অসতর্ক হওয়া অপরাধ ও গোনাহ নয়

আসল কথা হলো এসব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ কখনো একথা চিন্তা করেনি যে, নবীর অসতর্ক হওয়া অথবা ইজতিহাদী ত্রুটি হয়ে যাওয়া যদিও রিসালাতের দায়িত্ব আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তবুও এটা কোনো অপরাধও নয়, গোনাহও নয়। বরং এটা মানব প্রকৃতির অপরিহার্য একটি দিক যা থেকে নবীগণও মাসুম নন। তাঁরা গোনাহ থেকে মাসুম। 'যাল্লাত' বা পদস্খলন এবং অসাবধানতা বশতঃ কোনো কিছু হয়ে যাওয়া থেকে মাসুম নয়। এ ধরনের ত্রুটি বা অসর্তকতা হয়ে যাওয়ার বিষয় নবীদের সাথে সম্পৃক্ত করলে মানুষকে ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী বলে চিহ্নিত করা যায় না। কেননা একথা গোটা

www.pathagar.com

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের স্বীকৃতি নীতি যে, 'যাল্লাত' ও ভুল-ত্রুটি থেকে নবীগণ মাসুম ও নিরাপদ নন। তাঁরা গোনাহ্ থেকে মাসুম কিন্তু পদস্খলন এবং ভুল-ত্রুটি থেকে নয়। ইসমতে আম্বিয়া প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা উপরে করা হয়েছে। অতএব "রিসালাতের কর্তব্য আদায় করতে তাঁর ত্রুটি হয়েছিলো" হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী যদি একথা বলে থাকেন তাহলে তা এমন কোনো কথা নয় যার কারণে মাওলানা মওদূদীকে আহলে সুন্নাত দল থেকে খারিজ করা যায় অথবা তাঁকে ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী ঘোষণা করা যায়। বরং এগুলো এমন যা পূর্ববর্তী বিখ্যাত মুফাসসিরগণ বলে আসছেন। এখন ভেবে দেখার বিষয় হলো যে, এ ঘটনায় যদি হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কোনো ত্রুটি না হবে এবং সেটা রিসালাতের কর্তব্য আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না হবে তাহলে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে কোনো ত্রুটি বা অসাবধানতা ব্যতিরেকে মাছের পেটে কেমন করে নিক্ষেপ করা হলো। যদি তিনি তাসবীহ্ ও তাহলীলের মাধ্যমে ক্ষমা না চাইতেন তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই থেকে যেতেন।

فلولا انه كان من المسبحين للبث فى بطنه الى يوم يبعثون -

এ কারণেই হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কতিপয় দুর্বলতা ও অসাবধানতার কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এগুলো অস্বীকার করাও অসম্ভব নয়।

উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী, শা'বী ওহাব ইবনে মুনাববিহ, ইবনে আব্বাস এবং ইবনে মাসউদ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানীগণ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের প্রতি 'ত্রুটি' আরোপ করার কারণে যদি নবীদের অবমাননাকারী হিসেবে অপরাধী এবং ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী না হয় তাহলে একই কাজ করার কারণে একমাত্র মাওলানা মওদূদী নবীদের অবমাননাকারী এবং ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী হবেন কেন? অন্যথায় যাঁরা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের প্রতি গোনাহের আরোপ করেছেন তাঁরা তো অতি সহজেই ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী এবং নবীদের অবমাননাকারী হিসাবে অপরাধী বলে ঘোষিত হবেন।

আল্লামা আলূসী এবং ইমাম মুজাহিদও কি ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী ?

এভাবে সাইয়েদ আল্লামা আলুসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিও নবীদের অবমাননাকারী ও ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী রূপে পরিগণিত হবেন। কেননা তিনিও একটি আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে হযরত ইউনুস

www.pathagar.com

আলাইহিস সালামের গোনাহ করার কথা বলেছেন। اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

وهذا اعتراف منه عليه السلام بذنبه واظهار توبته ليفرج عنه كربته - اه (ج ١٧ صـ ٨٣)

"হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের এ বক্তব্য তাঁর গোনাহের স্বীকারোক্তি এবং তাওবার অভিব্যক্তি। এভাবে তিনি মুসিবত থেকে উদ্ধার পেতে চেয়েছেন।-(খঃ ১৭ পৃঃ ৮৩)

ইমাম মুজাহিদও নবীদের অবমাননাকারী এবং ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী রূপে আখ্যায়িত হবেন। কেননা, তিনিও ইউনুস আলাইহিস সালামের কাহিনী সম্বলিত আয়াতের وَهُوَ مُلِيْمٌ শব্দের তাফসীর করেছেন مذنب (গোনাহগার) শব্দ দিয়ে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি وَهُوَ مُلِيْمٌ -এর তাফসীরে বলেন ঃ قال مجاهد مذنب "মুজাহিদ বলেছেন মু'লীমের অর্থ গোনাহগার।"-(খঃ ১৩ পৃঃ ৪৮৪)

কিন্তু অভিযোগকারী মহোদয়দের মতে যদি ইমাম মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ও আল্লামা আলুসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির গোনাহের আরোপ করা সত্ত্বেও নবীদের অবমাননাকারী ও ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী হিসেবে চিহ্নিত না হন, তাহলে মাওলানা মওদূদীকেও ত্রুটি বা অসাবধানতা শব্দ আরোপ করার কারণে নবীদের অবমাননাকারী ও ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী বলা যাবে না। কারণ, নবীর অসাবধানতা অপরাধ বা গোনাহ কোনোটাই নয়।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

উপরে আমাদের পেশকৃত বক্তব্য সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর বিরোধীগণ হয়তো বলবেন যে, তাফসীরের ইমামদের বক্তব্য ও ভাষ্য হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের প্রতি যেসব ভুল-ত্রুটির বা অসাবধানতার কথা আরোপ করা হয়েছে তার কোনো কোনোটিকে বিজ্ঞ আলেমগণ নিজেরাও সঠিক বলে গ্রহণ করেননি, বরং ভুল বলে ঘোষণা করেছেন যেমন আল্লামা সাইয়েদ আলুসীর নিম্নোক্ত উক্তিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

وقيل مغاضبا لربه - وحكى فى هذه المغاضبة كيفيات وتعقب ذالك فى البحر بانه يجب اطواح هذا القول اذ لايناسب ذالك بمنصب النبوة - اه (ج ١٧ صـ ٨٣)

কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে (مغاضبا) শব্দের অর্থ আল্লাহর ওপর রাগান্বিত হওয়া। তারপর এ ব্যাপারে অনেক কথার অবতারণা হয়েছে। তবে 'বাহরে মুহীত' নামক গ্রন্থে এগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ভুল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা নবুয়াতের পদমর্যাদার সাথে এ অর্থের কোনো সামঞ্জস্য নেই।"–(রূহুল মায়ানী খঃ ১৭ পৃঃ ৮৩)

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ী ইমামদের উক্তিতেও হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের আল্লাহর প্রতি রাগান্বিত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব, বাহরে মুহীতে এ প্রসংগে ব্যাখ্যা পেশ করে বলা হয়েছে যে, সাহাবা ও তাবেয়ী ইমামদের উক্তিতে যদি (مغاضبا) এর অর্থ (مغاضبا لربه) (আল্লাহর ওপর রাগ করা) বর্ণনা করা হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ এই নয় যে, তিনি আল্লাহর ওপর রাগান্বিত হয়েছিলেন। বরং তার অর্থ হলো তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কওমের ওপর রাগ করেছিলেন। অর্থাৎ (لربّه) এখানে লাম অক্ষরটি (مغاضبا) এর সেলী (صله) নয় বরং ইল্লত বা কারণ নির্দেশক। তিনি লিখেছেন ঃ

وينبغى انن يتاول لمن قال ذلك من العلماء كالحسن والشعبى وابن جُبيرٌ وغيرهم من التابعين وابن مسعود من الصحابة بان يكون معنى قولهم "لربه" لاجل ربه وحمية لدينه ـ فاللام لام العلة لااللام الموصلة للمفعول به ـ ١هـ

"হাসান বাসরী, ইমাম শা'বী, ইবনে জুবাইর এবং অন্যান্য তাবেয়ী ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সাহাবী থেকে (مغاضبا لربه) বলে (مغاضبا) এর যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে তার একটা সংগত ব্যাখ্যা থাকা জরুরী। আর সে ব্যাখ্যা হলো এখানে (لربه) এর লাম (مفعول به) কর্মের (صله) নয় বরং 'লাম' ইল্লত বা কারণ নির্দেশক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের লোকদের সাথে রাগ করেছিলেন, তবে রাগের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দীনের সহযোগিতা, অন্য কিছু নয়।"–(রূহুল মায়ানী খঃ ১৭ পৃঃ ৮৩)

স্বয়ং আল্লামা সাইয়েদ আলুসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিও এ ধরনের সম্বোধনকে ইহুদীদের মনগড়া বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

وكون المراد مغاضبا لربه عز وجل مقتضى زعم اليهود فانهم زعموا ان اللّه تعالى امره ان يذهب الى نينوى وينذر اهلها فهرب من ذالك الخ ولا

www.pathagar.com

يخفى ان مثل هذا الهرب مما يجلّ عنه الانبياء عليهم السلام - واليهود قوم بهت - ١ هـ

مغاضبا لربه -এর অর্থ আল্লাহর ওপর রাগান্বিত হওয়া বলা ইহুদীদের কল্পনাপ্রসূত। ইহুদীরা বলছে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে নিনাওয়াবাসীদের কাছে গিয়ে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আদেশ পালন না করে পালিয়ে যান। আদেশ পালন না করে পালিয়ে যাওয়া কোনো নবীর উপযুক্ত কাজ হতে পারে না। নবীদের মর্যাদা এর অনেক উচ্চে। তারা পূতঃপবিত্র। ইহুদী জাতি অপবাদ রটনাকারী জাতি হিসেবে খ্যাত।"

মূলকথা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর ওপর রাগ করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে এমন বলা ঠিক নয়। (مغاضبا) শব্দ দ্বারা আল্লাহর ওপর রাগ করা বুঝায় না। পূর্ববর্তী আলেমদের রচনাবলীতে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যেসব বক্তব্য পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। সুতরাং পূর্ববর্তী আলেমদের উক্তি থেকে একথার সমর্থন পাওয়া যায় না যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম রিসালাতের কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বাস্তবিকই কিছুটা অসতর্ক হয়েছিলেন ; যেমন মাওলানা মওদূদী বলছেন।

প্রথম জবাব

এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব দেয়া যেতে পারে। প্রথম জবাব হলো, আমরা প্রথমেই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ তিনটি কারণ বলেছেন। এক, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তাঁর জাতির প্রতি রাগান্বিত হয়েছিলেন। দুই, হিযকীল বাদশাহর ওপর রাগান্বিত হয়েছিলেন। তিন, তাঁর রবের প্রতি রাগান্বিত হয়েছিলেন। --- এ তিনটি কারণের কথা আল্লামা আলূসী এবং অপরাপর অনেক তাফসীরকার নিজ নিজ তাফসীরের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন, বাহরে মুহীত প্রণেতা ও আল্লামা সাইয়েদ আলূসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শুধুমাত্র তৃতীয় ব্যাখ্যাটির রদ করেছেন। এতে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাখ্যা তাদের মতেও সঠিক বলে প্রমাণিত। যেমন অন্যান্য তাফসীরের ইমামগণও এ ব্যাখ্যা দু'টিকে সঠিক বলে স্বীকার করেছেন। ইমাম বাগাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তৃতীয় ব্যাখ্যার রদে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাখ্যার সমর্থনে লিখেছেন ঃ

والتأويلات المتقدمة اولى بحال الانبياء من انه ذهب مغاضبا لقومه او للملك - ١ هـ

www.pathagar.com

"হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম কওম অথবা বাদশাহর প্রতি রাগ করে চলে যান' এ দু'টি ব্যাখ্যা নবীদের মর্যাদার সাথে অধিক সামঞ্জস্য পূর্ণ।"

এ দু'টি ব্যাখ্যা যখন সঠিক প্রমাণিত হলো তখন এর বিস্তারিত বর্ণনায় রাগ করার কারণ নিরূপণের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রথমোল্লেখিত রেওয়ায়েত কি হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের রিসালাতের কর্তব্য পালনে গড়িমসি বা ত্রুটি প্রমাণিত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয় ? হযরত শা'ইয়ার আলাইহিস সালামের মাধ্যমে জিহাদের নির্দেশ পেয়ে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের একথা বলা যে, আল্লাহ কি নির্দিষ্ট করে আমার নামই বলেছেন ? অথবা নির্দিষ্ট করে আমাকেই যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ? এখানে কি অন্য কোনো নবী নেই যিনি জিহাদের জন্যে যেতে পারেন ? অথবা আমাকে একাকী কেন বাধ্য করা হচ্ছে ? অথবা আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়া। যেমন, রূহুল মায়ানীর ১৭ খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে এবং اذا ابق الى الفلك المشحون কুরআনের এ আয়াতটিও এসব কথার সমর্থন করছে। উপরোল্লেখিত সবগুলো বিষয়ই কি আপতঃ দৃষ্টিতে আল্লাহর হুকুম পালনের ব্যাপারে গড়িমসি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি নয় ও কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা এবং রাগ হওয়ার কারণ নির্ণয়ের ব্যাপারে উপরোল্লেখিত সমগ্র রেওয়ায়েতগুলো কি সুস্পষ্টভাবে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ব্যাপারে গড়িমসি ও ঢিলামী করা প্রমাণ করে না ? অধিকন্তু ঐ সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি কি রিসালাতের কর্তব্য পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় ? জিহাদের নির্দেশ পালন করা কি রিসালাতের কর্তব্যের মধ্যে শামিল নয় ? হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম এ ক্ষেত্রে যেসব কথাবার্তা বলেছেন তা কি সে কর্তব্য পালনে গড়িমসি বা অলসতার সাক্ষ্য নয় ? এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব যদি হ্যাঁ বোধক হয় এবং অবশ্যই হ্যাঁ বোধক হবে তাহলে রিসালাতের কর্তব্য আদায় করতে গিয়ে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ত্রুটি হয়ে গিয়েছিলো একথা প্রমাণ করার জন্যে এর চেয়ে বড় দলীল আর কি হতে পারে ?

দ্বিতীয় জবাব

'বাহরে মুহীতের' রচয়িতা এবং আল্লামা সাইয়েদ আলুসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কর্তৃক তৃতীয় ব্যাখ্যা খণ্ডন করার উদ্দেশ্য হলো কুরআনের শব্দ (مغاضبا) দ্বারা (مغاضبا لربه) অর্থ করা এবং (مغاضبا) শব্দ দ্বারা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের যে ক্রোধের বিষয় উল্লেখ করা। এর অর্থ তিনি আল্লাহর ওপর রাগ করেছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ, এ ধরনের কাজ নবীদের জন্য শোভনীয় নয়। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর ওপরই রাগ করেছিলেন, এটা আমাদেরও কথা বা দাবী নয়। আমাদের কথা ও

www.pathagar.com

দাবী শুধু এই যে, আগেকার আলেমগণ এবং শীর্ষস্থানীয় তাফসীরকারগণ (مغاضبا) শব্দের তাফসীরে (مغاضبا لربه) করেছেন, যদিও তা কুরআনের উদ্দেশ্য নয়। এবং তাফসীরকার ও পূর্ববর্তী আলেমগণ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের আল্লাহর ওপর রাগান্বিত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। আর এটা এমন একটা দাবী যা কখনো মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা সম্ভব নয় এবং এমন সত্য যা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ, পূর্ববর্তী আলেমদের কথায় (مغاضبا) শব্দের ব্যাখ্যায় (مغاضبا لربه) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে। তাতে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, আগেকার আলেম ও মুফাসসিরগণ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের সাথে এ কথার সম্বন্ধকে সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ তিনি স্বীয় রবের প্রতি রাগ করেছিলেন। যদিও আল্লামা সাইয়েদ আলুসী এবং বাহরে মুহীত রচয়িতা (مغاضبا) শব্দের উপরোক্ত তাফসীর সঠিক হিসেবে গ্রহণ করেননি। কেননা তাদের মতে এমন কাজ নবীর পদমর্যাদার পরিপন্থী।

এখন কথা হলো 'বাহরে মুহীত' রচয়িতা সলফে সালেহীনদের مغاضبا لربه এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে এখানে 'লাম' تعليل অর্থাৎ কারণ নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সেলী হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। তাদের মতে مغاضبا لربه এর অর্থ হলো হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম স্বগোত্রীয় লোকদের ওপর রাগ ঠিকই করেছিলেন তবে তার উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি। অতএব, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর ওপর রাগ করেছেন বলে তাদের বাক্য দ্বারাও প্রমাণিত হয় না। এর জবাবে আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে, সলফে সালেহীনদের কথায় এমন ব্যাখ্যার সামান্যতম অবকাশও নেই। এটা তাদের উক্তির ব্যাখ্যা নয়। বরং কারো কথার এমন ব্যাখ্যা পেশ করা যার পেছনে বক্তার কোনো সমর্থন নেই।

توجيه الكلام بما لايرضى به قائله

পরিশেষে ভেবে দেখার ব্যাপার হলো, সলফে সালেহীনদের মতে যদি مغاضبا لربه এর 'লাম' تعليل -এর জন্যে না হয়ে صله -এর জন্যে হয় এবং হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের তাঁর কওমের প্রতি রাগ করার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ করা হয় তাহলে তাঁদের কথায় রাগের জন্য لربه ছাড়া অন্যান্য কারণের উল্লেখও রয়েছে কেন এবং তাও এমন কারণ যা বিশেষ করে আল্লাহর ওপর রাগান্বিত হওয়ার কারণই হতে পারে। যেমন ওরওয়াহ ইবনে জুবাইর ও সায়ীদ ইবনে জুবাইর প্রমুখগণ مغاضبا لربه এর এ কারণই উল্লেখ করেছেন।

ذهب عن قومه مغاضبا لربه اذكشف عنهم العذاب لما اوعدهم ـ اهـ

www.pathagar.com

"হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রতি রাগান্বিত হয়ে কওমকে পরিত্যাগ করে এজন্যে চলে গেলেন যে, ঐ কওমের ওপর আযাব নাযিল করার ওয়াদা করা হয়েছিলো।"

হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বক্তব্যে مغاضبا لربه এর জন্যে যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তা ইমাম বাগাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ভাষায় এরূপ ঃ

انما غاضب ربه لاجل انه امره بالمسير الى قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم اليه فسأل ربه ان ينظره ليتاهب للشخوص اليهم فلم ينظر فذهب مغاضبا ـ اهـ

"হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম এ কারণে আল্লাহর ওপর রাগ করেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কওমের কাছে গিয়ে আযাবে ইলাহীর ভয় দেখাতে এবং সত্যের দাওয়াত পেশ করতে হুকুম দিয়েছিলেন। তিনি তখন প্রস্তুতির জন্য সময় চাইলেন। কিন্তু তাঁকে সময় দেয়া হলো না। এ কারণে তিনি তাঁর রবের প্রতি রাগান্বিত হয়ে চলে গেলেন।"

উপরোক্ত উক্তিসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আল্লাহর কোনো বান্দা কি একথা বলার দুঃসাহস দেখাতে পারবে যে, مغاضبا لربه এর 'লাম' تعليل বা কারণ নির্দেশক এবং কওমের প্রতি রাগান্বিত হওয়ার এখানে অর্থ। এ ক্রোধের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ এবং দীনের সহযোগিতা। অসম্ভব কখনো তা নয় বরং এসব উক্তি পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, সলফে সালেহীন এসব কারণ আল্লাহর ওপর রাগ করা বুঝানোর জন্যে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কওমের প্রতি ক্রোধ বুঝানোর জন্যে নয়। সুতরাং সলফে সালেহীনদের বাক্যের যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে তা সঠিক ব্যাখ্যা নয় বরং توجيه الكلام بما لايرضى به قائله এমন ব্যাখ্যা যার পেছনে বক্তার সমর্থন নেই।

তৃতীয় জবাব

পূর্ববর্তী প্রখ্যাত আলেমদের বক্তব্যে ও লেখায় সুস্পষ্টভাবে কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের সাথে দেখানো হয়েছে —তাঁদের সে বক্তব্য ও উক্তির প্রতি নজর না দিয়ে কুরআনের যেসব জায়গায় এ কাহিনীর দিকে ইশারা ইংগিত করা হয়েছে সেগুলোর ওপর চিন্তা করলে তা থেকেও জানা যায় যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম কর্তৃক কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছিলো। আর সে ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিলো রিসালাতের কর্তব্য পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্যথায় মাছের পেটের অন্ধকার সংকীর্ণ বন্দীশালায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তিস্বরূপ বন্দী রাখার আর কি কারণ

www.pathagar.com

থাকতে পারে ? যদি তাসবীহ তাহলীলের মাধ্যমে তাওবা করে ক্ষমা না চাইতেন তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সে জেলখানায় অবস্থান করতেন :

فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ -

কুরআনের চার জায়গায় এ কাহিনীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে। কোনো জায়গায় যদিও কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ নেই, তথাপি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর উল্লেখ হয়েছে। নীচে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ সম্বলিত আয়াতগুলো উল্লেখ করা হলো।

এক : সূরা ইউনুসে ইউনুসের কওম থেকে আযাব উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন :

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ - (يونس)

"এমন কোনো জনপদ নেই যে, সেখানকার লোক আযাব দেখে ঈমান এনেছে, আর সে ঈমান তার জন্যে কল্যাণকর হয়েছে একমাত্র ইউনুসের কওম ছাড়া ? তারা যখন ঈমান আনলো তখন তাদের ওপর থেকে দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনাকর আযাবকে আমরা দূর করে দিলাম এবং একটি সময় পর্যন্ত জীবন ভোগ করার সুযোগ দিলাম।"-(ইউনুস : ৯৮)

এ আয়াতে যদিও হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কোনো ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হয়নি তথাপি একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, যখন ইউনুস আলাইহিস সালাম জাতিগত ঈমান গ্রহণ করলো তখন এ ঈমান তাদের জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হলো এবং আযাব দূর করে দেয়া হলো।

একথা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের জাতির সাথে এ আচরণ আযাব নাযিল করার সাধারণ রীতি বিরোধী হয়েছে। কেননা, আযাবের নিদর্শনাবলী দেখে ঈমান লওয়া কল্যাণকর না হওয়াই সাধারণ নিয়ম।

يوم ياتى بعض ايات ربك لاينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل

এ রীতির আওতায় ফেরাউন আযাবের নিদর্শন দেখে যখন ঈমান এনে বললো :

امنت انه لااله الا الذى امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين -

"আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই একথা এবার আমি মেনে নিলাম। বনি ইসরাঈল যার ওপর ঈমান এনেছে আমিও তার ওপর ঈমান আনলাম এবং আমি মুসলমানদের মধ্যে শামিল হলাম।"

www.pathagar.com

এ ঈমান তার জন্যে কল্যাণকর হয়নি এবং ডুবে যাওয়া থেকেও সে নিষ্কৃতি পায়নি। বরং তার এ ঈমানের জবাবে আল্লাহ বলেন ঃ

الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ـ

"এখন ? অথচ এর আগে নাফরমানী করেছো এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারী ছিলো।"

ইউনুস আলাইহিস সালামের কওমের এ ব্যতিক্রমধর্মী আচরণের প্রকৃত কারণ যদি এই হয় যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই স্থান ত্যাগ করে চলে যান এবং আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা না করে নিজ সিদ্ধান্তেই স্থান ত্যাগ করেন যার কারণে আযাব নাযিল হওয়ার দলীল পূর্ণ হওয়ার যে আবশ্যিকতা ছিলো তা পূরণ হয়নি। তারপর এ আয়াত দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে ঃ

'হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের অধৈর্য হয়ে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়াটা যদিও হিজরত করার উদ্দেশ্য ছিলো, তথাপি তিনি হিজরত করার অনুমতি পাননি। এজন্যে তাঁর পদমর্যাদার প্রেক্ষাপটে এটাকেই এমন একটি পদস্খলন ও ত্রুটির মধ্যে গণ্য করা হলো যা রিসালাতের কর্তব্য পালনের ত্রুটির অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত দীনের তাবলীগ ও সত্যের দাওয়াতী কাজে নিমগ্ন থাকা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য ছিলো। তার পূর্বে নিজের সিদ্ধান্তেই স্থান ত্যাগ করা উচিত ছিলো না। যেমন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা আগে বর্ণনা. করা হয়েছে। আল্লামা আলুসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইংগিত দিয়েছেন এভাবে ঃ

وهذا اعتراف منه عليه السلام بذنبه واظهار لتوبته ليفرج عنه كربته (هدج ١٧ صـ ٨٣)

"এটা ইউনুস আলাইহিস সালামের গোনাহের স্বীকারোক্তি ও তাওবার অভিব্যক্তি ; যাতে তার কষ্ট দূর হয়ে যায়।"-(খণ্ড ১৭ ঃ পৃষ্ঠা-৮৩)

দুই ঃ সূরা আল আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ق اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (الانبياء : ٨٧-٨٨)

www.pathagar.com

"এবং মাছওয়ালা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলো এবং ধারণা করেছিলো যে, আমি তাকে পাকড়াও করতে পারবো না। শেষ পর্যন্ত সে অন্ধকার থেকে ডেকে উঠলো, তুমি ছাড়া পবিত্র মহান সত্তা আর কেউ নেই। আমি অবশ্যই অপরাধী। তখন আমরা তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং তাঁকে চিন্তা-ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি দিলাম। আমরা মু'মিনদেরকে এমনি করেই রক্ষা করে থাকি।"-(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮৭-৮৮)

তিন ঃ সূরা আস সাফফাতে আছে ঃ

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۝ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۝ فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝ (الصافات : ١٣٩-١٤٤)

"ইউনুস রাসূলদের একজন। স্মরণ করো যখন সে একটি ভরা নৌকার দিকে পালিয়ে গেলো। লটারীতে অপরাধী হিসেবে ধরা পড়লো। অবশেষে তাকে মাছ গিলে ফেললো এবং তিনি ছিলেন তিরস্কৃত। যদি তিনি তাসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতেন তাহলে তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হতো।"-(সূরা আস সাফ্ফাত ঃ ১৩৯-১৪৪)

চার ঃ সূরা আল কলমে আছে ঃ

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۝ لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ۝ (القلم : ٤٨-٤٩)

"অতএব তুমি আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে থাকো এবং মাছওয়ালার [ইউনুস আলাইহিস সালাম] মত হয়ো না। সে যখন চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে ডাক দিয়েছিলো তখন আল্লাহর অনুগ্রহ তাঁর ওপর বর্ষিত না হলে সে পরিত্যক্ত ও প্রত্যাহৃত অবস্থায় ধু ধু বালুকাময় প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতো।"-(সূরা আল কলম ঃ ৪৮-৪৯)

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে কয়েকদিন অথবা কিছু দিন পর্যন্ত মাছের পেটে বন্দী জীবনযাপন করতে হয়েছে একথা এসব আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়। এটা কোনো পদস্খলন বা ক্রটি সংঘটিত হওয়া ব্যতিরেকে ছিলো না বরং ক্রটির পরিণামেই হয়েছিলো। এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো যে, ধৈর্যহারা হওয়ার মতো একটি ক্রটিও তাঁর হয়েছিলো। সূরা আল কলমের আয়াত একথারই স্পষ্ট ইংগিত বহন করে। এসব ক্রটি-বিচ্যুতি অবশ্যই রিসালাতের

কর্তব্য ও দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্যথায় কিছুদিন পর্যন্ত তাঁকে মাছের পেটে রাখার আর কি প্রয়োজন ছিলো? আবার বন্দীত্বও এমন যে তিনি যদি সবসময় তাসবীহ্ তাহলীলে নিয়োজিত থেকে মাফ না চাইতেন তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের অন্ধকার পেটেই তাঁকে অবস্থান করতে হতো। অতএব একথা স্বীকার করতেই হয় যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম রিসালাতের কর্তব্য আদায় করতে গিয়ে ত্রুটি করেছিলেন। তাই মাওলানা মওদূদীর এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ঠিক এবং কুরআনী শিক্ষার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ।

নবীদের যথাযোগ্য মর্যাদা

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উম্মতের জন্যে ফরজ বরং ঈমানের অংগ। তাঁদের প্রতি ইচ্ছাপূর্বক সামান্য অবজ্ঞা ও বে-আদবী প্রদর্শন করাও মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। তবে প্রত্যেক বস্তুর জন্যে ইসলাম একটি সীমা বেঁধে দিয়েছে যা অতিক্রম করা ইসলামের দৃষ্টিতে অশোভনীয়। নবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অর্থ কখনো এটা নয় যে, সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে আমরা সীমা অতিক্রম করবো এবং তাদেরকে মানবীয় মর্যাদা থেকে উঠিয়ে আল্লাহর আসনে পৌঁছে দেবো। মানুষ হওয়ার কারণে যেসব মানবসুলভ ত্রুটি তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং কুরআন ও হাদীসে যেগুলোর সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে অথবা যেগুলো কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত সেগুলোকে অস্বীকার করা প্রকারান্তে কুরআন ও হাদীসকে অস্বীকারেরই নামান্তর।

ইসলামে এভাবে সীমালংঘন করার কোনো অবকাশ নেই। আর এভাবেই আহলে কিতাবদের গোটা জাতি শিরকে নিমজ্জিত হয়েছিলো। আজ থেকে প্রায় ১৪ শ' বছর আগে মহাগ্রন্থ আল কুরআন নিম্নোক্ত ঘোষণার মাধ্যমে সীমালংঘন করার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছে ঃ

قُلْ يَـاَهْلَ الْكِتَابِ لَاتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ ـ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لاتطروا نى كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم ـ

"নাসারাগণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যেরূপ অতিরঞ্জিত প্রশংসা করেছে তোমরা আমার ব্যাপারে সেরূপ অতিরিক্ত প্রশংসা করো না।"

সুতরাং 'হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম রিসালাতের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে ত্রুটি করেছিলেন মাওলানা মওদূদীর একথায় কোনো ক্ষতি নেই।

www.pathagar.com

কেননা, তাঁর একথা কুরআনে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত আয়াতসমূহেরই যা এ কাহিনী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে তারই সারকথা এবং সলফে সালেহীনদের বিশ্লেষণমূলক উক্তিতেও একথাই সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের হাদীস

এ প্রসংগে কুরআন ছাড়া রসূলের হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দিলে কিছুসংখ্যক হাফেজে হাদীসের গ্রন্থসমূহে এমন রেওয়ায়েতও পাওয়া যায়, যদ্বারা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম কর্তৃক কোনো কোনো ত্রুটি সংঘটিত হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়। হাফেজ ইবনে কাসীর তাঁর বিখ্যাত তাফসীর 'ইবনে কাসীর'–এ 'জারাহ' বা যাঁচাই বাছাই ছাড়াই কয়েকটি রেওয়ায়েতে এ প্রসংগে ব্যক্ত করেছেন। রেওয়ায়েতগুলো নিম্নরূপ ঃ

١ـ قال ابن مسعود ان اللّه قد ارسل من البحر الا خضر حوتًا يشق البحار حتى جَاء فالتقم يونس حين القى نفسه من السفينة فاوحى اللّه الى ذالك الحوت ان لاتاكل له لحما ولا تهشم له عظما فان يونس ع ليس لك رزقا وانما بطنك تكون له سجنًا ـ ١هـ

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা 'বাহরে আখদার' বা একটি তিমি মাছকে আদেশ করে পাঠালেন। মাছটি সমুদ্র অতিক্রম করে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কাছে এসে পৌছলো। নৌকা থেকে পানিতে ফেলে দিলে মাছটি তাকে গিলে ফেললো। আল্লাহ মাছটিকে আদেশ করলেন ইউনুস আলাইহিস সালামের মাংস খাবে না এবং হাড্ডিও ভাংবে না। ইউনুস আলাইহিস সালাম তোমার খোরাক নয়। বরং তোমার পেট তার জন্যে কারাগার স্বরূপ করা হয়েছে।"

٢ـ وردى محمد بن اسحق عمن حدثه عن عبد اللّه ابن رافع مولى ام سلمة قال سمعت ابا هريرة يقول قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما اراد اللّه حبس يونس فى بطن الحوت اوحى اللّه الى الحوت ان خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما .... وسبح فى بطن الحوت فسمعت الملئكة تسبيحه ـ فقالوا يا ربنا انا نسمع صوتا ضعيفا بارض غربية قال ذالك عبدى يونس عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحر رواه ابن جرير ـ

www.pathagar.com

"মুহাম্মদ বিন ইসহাক একজন মুহাদ্দিসের মারফতে আবদুল্লাহ ইবনে রাফে থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ ইউনুস আলাইহিস সালামকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মাছের পেটে বন্দী রাখার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি একটি মাছকে আদেশ করলেন ইউনুস আলাইহিস সালামকে গিলে ফেল তবে গোশতে আঘাত করবে না, হাড়ও ভাংবে না। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে আটকা পড়ে তাসবীহ করতে লাগলেন। ফেরেশতাগণ তাঁর তাসবীহের আওয়াজ শুনে আল্লাহর কাছে আরজ করলো ঃ হে আমাদের প্রভু ! আমরা একটি অজ্ঞাত যমীনে একটি ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। (এটা কিসের আওয়াজ ?)। আল্লাহ জবাব দিলেন ঃ এ হলো আমার বান্দা ইউনুস আলাইহিস সালাম। সে আমার নির্দেশ অমান্য করে ছিলো যার পরিণতিতে আমি তাকে সমুদ্রে মাছের পেটে বন্দী করে রেখেছি।"

ইবনে জারীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে সনদ থেকে এ মারফু রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, সেখানে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের পর একজন রাবীকে অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি মুহাম্মদ বিন ইসহাকের শায়খ ছিলেন। এ অস্পষ্ট রাবীর কারণে হাদীসের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়ে থাকবে। এ কারণে ইবনে কাসীর এ প্রসংগে আগে অগ্রসর হয়ে বলেন ঃ

ورواه البزار فى مسنده من طريق محمد ابن اسحق عن عبد اللّه ابن رافع عن ابى هريرة فذكر نحوه-

"বাজ্জার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ হাদীসটি স্বীয় মুসনাদে মুহাম্মদ বিন ইসহাকের পন্থায় আবদুল্লাহ বিন রাফের মাধ্যমে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রেওয়ায়েতে করে ইবনে জারীরের রেওয়ায়েতের মত বর্ণনা করেছেন।"-(ইবনে কাসীর খঃ ৩ পৃঃ ১৯১-১৯২)

মূলকথা বাজ্জারের রেওয়ায়েতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং আবদুল্লাহ বিন রাফের মাঝখানের অস্পষ্ট রাবীর উল্লেখ করা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইবনে জারীরের রেওয়ায়েতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং আবদুল্লাহ বিন রাফের মাঝখানের যে অস্পষ্ট রাবীর উল্লেখ করা হয়নি তা **مزيد فى متصل الاسانيد** ধরনের। এটা হাদীস প্রমাণিত হওয়ার জন্যে ক্ষতিকর নয়। এ কারণে হাদীস অস্বীকার করা অথবা জয়ীফ বলে উল্লেখ করা ঠিক নয়।"

উল্লেখিত রেওয়ায়েতসমূহের সারমর্ম

'উপরোক্ত মওকুফ ও মারফু' রেওয়ায়েত দু'টি দ্বারা নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় সারবস্তু হিসেবে প্রমাণিত হয়।

www.pathagar.com

(ক) হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাছের পেটে বন্দী হিসেবে আটক রাখা হয়। আর মাছের পেট ছিলো তার জন্যে একটি জেলখানা স্বরূপ।

একথা মওকুফ ও মারফু উভয় ধরনের রেওয়ায়েতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মওকুফ রেওয়ায়েতে وانما بطنك تكون سجنا শব্দ এবং মারফু রেওয়ায়েতে فحبسته بطن الحوت শব্দই একথার প্রমাণ।

(খ) হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে মাছের পেটের অন্ধকার জেলখানায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বন্দী করে রাখা এমন একটি ত্রুটি ও অসতর্কতার পরিণতি ছিলো যা আল্লাহ তায়ালার আহকাম ও রিসালাতের কর্তব্য পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর প্রমাণ নিম্নবর্ণিত মারফু হাদীসের শব্দাবলী ঃ

ذالك عبدى يونس عصانى فحبسته فى بطن الحوت -

(গ) মাছের পেটের অন্ধকার কারাগার থেকে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে মুক্তির আদেশ তখনই দেয়া হয়েছিলো যখন তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করে তাসবীহের মাধ্যমে ক্ষমা চাইলেন এবং ফেরেশতাগণও তাঁর মুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করলেন।

হাফেজ ইবনে কাসীর কর্তৃক বর্ণিত একটি মারফু হাদীসের বাক্য দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়। হাদীসটির শেষাংশ এরূপ ঃ

قال فشفعوا له عند ذالك فامر اللّه الحوت فقذفه فى الساحل - ١ هـ

"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তখন ফেরেশতাগণ তাঁর জন্যে সুপারিশ করলেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা মাছটিকে আদেশ দিলেন। আর মাছটি তাঁকে সমুদ্রের তীরে নিক্ষেপ করলো।"-(ইবনে কাসীর খঃ ৩ পৃঃ ১৯১-১৯২)

এবার বলনু, মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একথা 'হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম রিসালাতের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অসাবধান হয়েছিলেন'—রাসূলের হাদীসের আলোকে সঠিক ছিলো কি না?

যা হোক, কুরআন ও হাদীসের বিশ্লেষণ, ইশারা ইংগিত এবং পূর্ববর্তী আলেমদের ব্যাখ্যামূলক ভাষ্য সামনে রেখে একথা অস্বীকার করা দুষ্কর যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম রিসালাতের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে ভুল করেছেন। আর এটা ছিলো অবশ্যই ফরজ ও রিসালাতের কর্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত। সলফে সালেহীনদের ভাষ্যে এ ত্রুটি বা অসতর্কতাকে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের সাথে স্পষ্টভাবে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট

www.pathagar.com

সম্পর্কের কারণে আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণ যদি নবীদের অবমাননাকারী রূপে চিহ্নিত না হন এবং ইসমতে আম্বিয়ারও অস্বীকারকারী না হন, তাহলে মাওলানা মওদূদীও একথা বলার কারণে নবীদের অবজ্ঞাকারী এবং ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী রূপে আখ্যায়িত হতে পারেন না।

এ পর্যন্ত যাকিছু আবেদন পেশ করা হলো তার সবগুলো মাওলানা কাযী মাযহার হুসাইন সাহেবের উত্থাপিত আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ; যাতে তিনি দাবী করেছেন যে, নবীগণ কর্তৃক রিসালাতের কর্তব্য পালনে ত্রুটি হওয়া অসম্ভব এবং হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম কর্তৃক এ ধরনের কোনো ত্রুটি হয়নি। আর যারা এ ধরনের আকীদা পোষণ করে তারা ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী।

এরপর আপত্তির শেষ অংশ নিয়ে আলোচনা করা আমাদের ইচ্ছা। জনাব মাওলানা মাযহার হুসাইন সাহেব এ অংশে তাফহীমুল কুরআনের বাক্যের ওপর যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন তা প্রযোজ্য হয় না। আর না হলে তার কারণ কি—একথা জানা। নিম্নে সে বিষয়টি লক্ষ্য করুন।

আপত্তির শেষাংশ ও তার জবাব

মুহতারাম মাওলানা কাযী মাযহার হুসাইন সাহেবের আপত্তির শেষাংশ যা আপত্তির সারাংশ শিরোনামে ৪নং এ উল্লেখ করা হয়েছে তা এই—"মওদূদী সাহেবের একথা ভুল যে, ইউনুস আলাইহিস সালামের কওমের ওপর দলীল পূর্ণ করার যে আইনানুগ বিধান আছে তা পূরণ হয়নি।" কেননা এভাবে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যেই ব্যহত হয়ে যায়। কারণ, কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য দলীল সম্পূর্ণ করা ছাড়া আর কিছু নয়।

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

আমাদের মতে এ অভিযোগ মাওলানা মওদূদীর আসল বাক্যের বিরুদ্ধে আদৌ আপত্তি হতে পারে না। যদি মুহতারাম কাযী সাহেব কুরআন থেকেই 'দলীল সম্পূর্ণ করার মাসয়ালা' সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞাত হয়ে মাওলানা মওদূদীর ভাষ্যের ওপর চিন্তা-গবেষণা করতেন তাহলে সম্ভবত তিনি এভাবে আপত্তি উত্থাপন করতে এবং প্রশ্ন করতে সাহস করতেন না এবং কুরআনের আয়াতকে এভাবে যত্রতত্র দলীল হিসেবে ব্যবহার করতেন না। সুতরাং কুরআন থেকে দলীল সম্পূর্ণ করার মাস্য়ালাটি প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে ব্যাখ্যা করা আমরা জরুরী মনে করি। তারপর আমরা দেখবো মাওলানা মওদূদীর আসল বাক্যের ওপর মুহতারাম মাওলানা কাযী সাহেবের আপত্তি উত্থাপন হতে পারে কিনা ?

www.pathagar.com

দলীল সম্পূর্ণ করার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

কুরআন পাঠে জানা যায় যে, মানব ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতিকে শাস্তি স্বরূপ যে আযাব দেয়া হয়েছে অথবা আযাবের উপযুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে আসমানী শরীয়াত ও ইলহামী কিতাবের আলোকে সে সাজা ও আযাব দু' প্রকার।

এক প্রকারের আযাব যা জাতির নাফরমানী ও খোদায়ী কানুনের সাথে বিদ্রোহ করার কারণে দুনিয়ায় নাযিল হয়েছে। এ আযাবকে কুরআনের পরিভাষায় عذاب الحيوة الدنيا বা ইহলৌকিক আযাব বলা হয়েছে। নতুন পরিভাষায় এটাকে مكافات عمل বা কাজের প্রতিশোধও বলা হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের আযাব হলো, যা ইহলৌকিক জীবনের অবসানের পর পারলৌকিক জীবনে মানুষের বাতিল আকীদা এবং পাপ কাজের জন্য দেয়া হয়। এ আযাবের সূচনা আলমে বরযখের কবর আযাব থেকে। আর এর শেষ যবনিকাপাত হয় আলমে হাশরে জাহান্নামের আযাব দিয়ে যা কাফেরদের জন্য স্থায়ী ও অবিনশ্বর এবং গোনাহগার মু'মিন বান্দাদের জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। কুরআন মজীদে এ আযাবকে عذاب اخروى বা আখেরাতের আযাব বলা হয়েছে। প্রচলিত ভাষায় এ আযাবকে 'পরকালের শাস্তি' বলা হয়।

কুরআন পাঠ করলে একথাও জানা যায় এবং মানব ইতিহাস এর জ্বলন্ত স্বাক্ষ্য যে, যখন কোনো অবাধ্য জাতিকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে আযাব দিতে ইচ্ছা করেন তখন তাদের কাছে আযাব আসার আগেই নিজের একজন নবী বা রাসূল পাঠান যাতে তাদেরকে সত্য পথে চলতে এবং যে পথের শেষ পরিণতি ধ্বংস—সে পথে চলা থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়। এভাবে প্রত্যেক নবী ও রাসূল নিজ নিজ জাতির কাছে আল্লাহ তায়ালার পয়গাম পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দেন এবং হক ও বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য রেখা টেনে দিয়ে জাতিকে ভালোভাবে অবগত করান যে, যদি সঠিক পথ অবলম্বন করে সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ করো তাহলে ইহলোকেও সফলকাম হবে এবং মৃত্যুর পর আল্লাহর কাছে গিয়ে পরকালেও চিরন্তন শান্তির নীড়ে বসবাস করতে পারবে যার নাম জান্নাত।

কিন্তু এর বিপরীতে যদি তোমরা ভুল নীতি গ্রহণ করো, সত্য ও ন্যায়ের পরিবর্তে বাতিলের অনুসরণ করো তাহলে এখানেও তোমাদেরকে ধ্বংসের স্বীকার হতে হবে এবং মৃত্যুর পর আল্লাহর কাছে গিয়ে সেখানেও চিরন্তন অশান্তি ও দুর্ভোগের ঘর পাওয়া যাবে যা জাহান্নাম নামে পরিচিত। এটাই হলো দলীল পূর্ণ করা যা নবী প্রেরণের মূল লক্ষ্য। এ দলীল পূরণের এ শর্ত পূর্ণ

www.pathagar.com

হওয়া ছাড়া আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার জীবনেও কাউকে আযাব দিবেন না এবং আখেরাতের জীবনেও না। দলীলের এ পূর্ণতা ব্যতিরেকে কাউকে আযাব দেয়া হবে না।

দুনিয়ার আযাবের জন্যে একটি আইনানুগ শর্ত
(আল্লাহর অনুমতি ছাড়া চলে না যাওয়া)

দুনিয়ার আযাব হোক কিংবা আখেরাতের আযাব—উভয় প্রকার আযাবের জন্যে এতটুকু দলীল সম্পূর্ণ করা জরুরী। তবে কুরআন পাঠে জানা যায় যে, দুনিয়াতে যেসব জাতিকে আযাব দেয়া হয়েছে নবী ও রাসূলগণ তাদের কাছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবস্থান করতঃ দীনের তাবলীগ ও সত্যের দাওয়াত পেশ করার কাজে নিয়োজিত থেকেছেন। আল্লাহর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তারা কখনো নিজ কর্মস্থল নিজের সিদ্ধান্তেই ত্যাগ করেননি। আল্লাহর পক্ষ থেকে আপন কর্মস্থল ত্যাগ করার আদেশ ও অনুমতি পেলে তবেই তারা কর্মস্থল ত্যাগ করতেন। এ থেকে এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে সামনে আসে যে, দুনিয়ায় কোনো জাতিকে আযাব দেয়ার জন্যে বিধান অনুযায়ী নবীগণ শুধুমাত্র দাওয়াত পেশ করবেন এবং তাবলীগের কর্তব্য আদায় করবেন—দলীল সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য এতটুকু করাই যথেষ্ট নয়। বরং দলীল সম্পূর্ণ হওয়ার অর্থ হলো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে নিমগ্ন থাকা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্মস্থল ত্যাগ করার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মস্থল ত্যাগ না করা। যখন এ শর্ত পূরণ হবে তখন দলীল সম্পূর্ণ হওয়ার আইনানুগ শর্ত পূর্ণ হবে এবং কওমের ওপর আযাবও নাযিল হবে। দুনিয়ায় যেসব জাতি আল্লাহর আযাবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের ইতিহাস উপরে যাকিছু পেশ করা হয়েছে তা তার সাক্ষী। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য নীচে আমরা কয়েকটি জাতির ঘটনা উল্লেখ করছি। যাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, দুনিয়ায় একটি জাতির ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার জন্য যে দলীল সম্পূর্ণ হওয়া জরুরী সে জন্য আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত নবীদের তাবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকা এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া আপন অবস্থান স্থল ত্যাগ না করাও একটি আইনানুগ শর্তের মর্যাদা রাখে।

নূহ আলাইহিস সালামের কওমের ওপর আযাব

মানব জাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে জাতি একটি মারাত্মক আযাবের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়েছিলো তারা হলো নূহের কওমে। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এ জাতিকে সর্ব প্রকারে বুঝিয়েছেন এবং তাবলীগের কর্তব্য পালনে সামান্যতম সুযোগও নষ্ট করেননি। রাত-দিন একাকার করে অহর্নিশ প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় পন্থায় তিনি তাদেরকে বুঝিয়েছেন এবং তাঁর এ সংস্কারমূলক

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা সাড়ে নয়শ' বছর ব্যাপী ক্রমাগত চালিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর জাতি অবাধ্যতা ও আত্মম্ভরিতার নীতি থেকে বিরত হলো না। বরং উল্টো তা আঁকড়ে ধরে রইলো। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম যখন তাদের ঈমান কবুল করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাদের বিদ্রোহে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন তখন তিনি তাদের জন্যে বদদোয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করলেন এবং একটি বিশ্বব্যাপী তুফান এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলো। এ ঘটনা কুরআনে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু একথার কোথাও উল্লেখ নেই যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নিজের অত্যধিক পেরেশানী ও স্বজাতির সীমাহীন ঔদ্ধত্ব ও ধৃষ্টতার কারণে অতিষ্ঠ হয়ে আপন কর্মস্থল ত্যাগ করে কোথাও চলে গিয়েছিলেন এবং তিনি আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করেননি। বরং কুরআনে এর বিপরীত কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যখন জাতির ধ্বংস ও নিঃশেষ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলো তখন হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে নৌকা বানানোর নির্দেশ দেয়া হলো। নৌকা তৈরি হয়ে গেলে হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে আদেশ করা হলো فاسلك فيها من كل زوجين اثنين আদেশটি আপাত দৃষ্টিতে যদিও হিজরতের জন্য নয় তবুও কার্যতঃ এটি হিজরতের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিলো না। আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্তির পর যখন নৌকা তৈরি হয়ে গেলো ও সকলেই নৌকায় চড়ে বসলেন এবং আল্লাহর হুকুমে নৌকা চলতে লাগলো তখন কেবলমাত্র তারাই নাযাত পেলো যারা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সাথে নৌকায় চড়েছিলো। আর অবশিষ্ট সকলেই ঝড়ের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেলো। এ জাতির ওপর আযাব নাযিল হওয়া এবং তাদের সকলেই ধ্বংস হওয়ার কারণ হলো আযাব নাযিল হওয়ার জন্যে দলীল সম্পূর্ণ হওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা তা পূর্ণ হয়েছে এবং আইনানুগ শর্তাবলীও সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয়েছে। কেননা হযরত নূহ আলাইহিস সালাম প্রথম থেকে শেষ অবধি তাবলীগের কাজে মগ্ন থাকেন এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলও ত্যাগ করেননি।

মিসরের ফেরাউনের ওপর আযাব

মিসরের ফেরাউনদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিলো। হযরত মূসা ও তাঁর ভাই হারুন আলাইহিমাস সালামকে যখন আল্লাহ তায়ালা রিসালাতের মর্যাদায় সমাসীন করে ফেরাউন ও তার কওমের কাছে পাঠালেন তখন তাঁরা উভয়ই আল্লাহর পয়গাম তার কাছে পৌছে দিলেন। সেই সময় থেকে শেষ পর্যন্ত তারা তাবলীগের কাজে সবসময় নিয়োজিত থাকেন এবং শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যান। এ ব্যাপারে তাঁরা বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছেন এবং মুজিযা প্রদর্শনও করেছেন। ওয়াজ-নসীহত করেছেন এবং আল্লাহর আযাবে পতিত হওয়ার হুমকিও দিয়েছেন।

www.pathagar.com

মোটকথা সর্ব উপায়ে কওমকে বুঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ফেরাউনী প্রশাসনের ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা নিজেদের কুফরী ও শিরক থেকে বিরত হলো না। তারা যুলুম-উৎপীড়নমূলক আচরণ ও পাশবিক কর্মতৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকলো। যখন হযরত মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম তাদের এ আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন এবং বনি ইসরাঈলদের ওপর তাদের সীমাতীত অত্যাচার দেখে অত্যন্ত বিচলিত হলেন তখন তাঁরা আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে বদদোয়া করলেন এবং আযাব নাযিল করার জন্যে দরখাস্ত পেশ করলেন এভাবে ঃ

رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالاً فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ..... لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ - رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ -

এসব কিছুই হয়েছে। কিন্তু হযরত মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম আল্লাহর অনুমতি ছাড়া অথবা রাগ করে কোথাও চলে যাননি এবং ধৈর্যহারা হয়ে আপন কর্মস্থলও ত্যাগ করেননি। বরং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দীনের তাবলীগ এবং সত্যের দাওয়াতী কাজে অবিচল থাকেন। যখন কওমের ওপর আযাব নাযিল হওয়ার আইনানুগ শর্তাবলী পূর্ণ হলো তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বনি ইসরাঈলদের সাথে করে রাতের মধ্যেই বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন ঃ فَاَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلاً

অন্যত্র আছে ঃ

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلاً -

তারপর দুই ভাই বনি ইসরাঈলদের সাথে করে মিসর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। সাগর তীরে পৌঁছলে আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা ও হারুণ আলাইহিমুস সালামকে বনি ইসরাঈলসহ নাযাত দিলেন এবং ফেরাউন ও তার সংগী-সাথীদের সাগরে ডুবিয়ে মারলেন।

এখানে দেখা যায় যে, যতক্ষণে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হননি ততক্ষণ পর্যন্ত অত্যন্ত কষ্ট অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেও নিজের কাজে সর্বদা নিয়েজিত ছিলেন। এভাবেই মিসরের ফেরাউনের ওপর আযাব নাযিল হওয়ার আইনানুগ শর্ত পুরো হয়েছিলো এবং আযাবে এলাহী এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো।

www.pathagar.com

এ ঘটনা থেকেও জানা যায় যে, আযাব নাযিল হওয়ার জন্যে যে দলীল সম্পূর্ণ হওয়া জরুরী তা কেবলমাত্র নবীদের কওমের কাছে এসে সত্যের আহ্বান জানানো এবং শুধুমাত্র দীনের তাবলীগ দ্বারা সম্পন্ন হয় না। বরং দলীল সম্পূর্ণ হওয়ার জন্যে শেষ সময় পর্যন্ত দীনের তাবলীগে দৃঢ় থাকা এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিজ অবস্থান স্থল ত্যাগ না করাও জরুরী।

লূতের কওমের ওপর আযাব

দলীল সম্পূর্ণ হওয়ার উপরোক্ত অর্থ যখন পূর্ণ হলো তখনই লূতের কওমের ওপর আযাব নাযিল হয়। হযরত লূত আলাইহিস সালাম প্রথম থেকে শেষ সময় পর্যন্ত সর্বতোভাবে জাতিকে বুঝাতে থাকেন এবং আযাবে ইলাহী সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করেন। এ ব্যাপারে তিনি অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন ও বে-ইজ্জতি সহ্য করেন। এমনকি হযরত লূত আলাইহিস সালামের ঘরে আগত মেহমানদের মান-ইজ্জতও নিরাপদ ছিলো না। এতো অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেও তিনি সত্যের দাওয়াত দিতে এবং দীনের তাবলীগ করতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুদৃঢ় থাকেন। فاسر باهلك بقطع من الليل এ নির্দেশ পাওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি দীনের তাবলীগে নিয়োজিত থাকেন এবং অনুমতি ছাড়া আপন কর্মস্থল ত্যাগ করেননি। আযাব নাযিল হওয়ার জন্যে যে দলীল সম্পূর্ণ হওয়া জরুরী ছিলো তা পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় আযাব নাযিল হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়।

বস্তুত সাজাপ্রাপ্ত যেসব জাতির ইতিহাস কুরআন বর্ণনা করেছে তাতে এ সত্যটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, "ইহকালীন আযাবের" জন্যে যে দলীল সম্পূর্ণ হওয়া জরুরী তার জন্যে নবীদেরকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাতির কাছে অবস্থান করতঃ সত্যের দাওয়াত পেশ করে দীন প্রচারে দৃঢ় থাকা এবং আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে নিজ অবস্থান স্থল ত্যাগ না করা আবশ্যক। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কওমের জন্যে যেহেতু এ ধরনের দলীল সম্পূর্ণ হয়নি। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর থেকে আযাব উঠিয়ে নিয়েছেন।

পরকালীন আযাবের জন্যে যে দলীল সম্পূর্ণ হওয়া জরুরী তা শুধুমাত্র রসূল প্রেরণের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে জাতির কাছেই কোনো নবী বা রসূল পাঠিয়েছেন তাতে আযাবের জন্যে দলীল সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় যদি তারা ঈমান গ্রহণ না করে তাহলে কিয়ামতের দিন তাদেরকে জাহান্নামের আযাব দেয়া হবে। এ সত্যটিই কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً -

তাফহীমুল কুরআনে লিখিত মাওলানা মওদূদী সাহেবের ভাষ্যের ওপর মাওলানা কাযী মাযহার হুসাইন সাহেবের আপত্তি উত্থাপন সঠিক হবে কি হবে না আমরা এবার তা দলীল সম্পূর্ণ হওয়ার উপরোক্ত নীতির ব্যাখ্যার আলোকে পর্যালোচনা করে দেখবো। আমাদের মতে এ আপত্তি মাওলানা মওদূদীর লেখার বিরুদ্ধে আদৌ উত্থাপিত হয় না। কারণ, তিনি তার লেখায় যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাহলো ঃ

"আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতিকে ততক্ষণ পর্যন্ত আযাব দেন না যতক্ষণ না সে জাতির জন্য দলীল সম্পূর্ণ করেন। অতএব যখন নবীর রিসালাতের কর্তব্য পালনে ত্রুটি সংঘটিত হলো এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তিনি নিজের পক্ষ থেকেই আপন অবস্থানস্থল ত্যাগ করলেন তখন আল্লাহর ইনসাফে সে জাতিকে আযাব দেয়া যথার্থ মনে করলো না। কেননা, এজন্য দলীল সম্পূর্ণ হওয়ার আইনানুগ শর্ত তাদের ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়নি।"

যারা দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন তারা এই বাক্যের ওপর চোখ বুলালে অতি সহজেই বুঝতে পারবেন যে, এখানে আযাবের অর্থ হলো ইহকালীন আযাব বা পার্থিব শাস্তি। আর এ ধরনের আযাব দেয়ার জন্য মাওলানার মতে দলীল সম্পূর্ণ হওয়ার অর্থ হলো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীগণ আপন সম্প্রদায়ের লোকদেরকে দীনের দাওয়াত দিতে থাকবেন এবং নিজের ইচ্ছামতো নিজের অবস্থানস্থল ত্যাগ করবেন না। বরং আল্লাহর অনুমতি ও নির্দেশ প্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করে ধৈর্যধারণ করবেন। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যেহেতু এরূপ করেননি বরং আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকেই নিজের ইচ্ছামতো অবস্থানস্থল ত্যাগ করেছেন। সুতরাং দলীল সম্পূর্ণ হওয়ার আইনানুগ শর্ত পূরণ হয়নি। ফলে আযাবও রহিত হয়ে যায়। "নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যই হলো দলীল সম্পূর্ণ করা। যদি তা সম্পূর্ণ না হয় তাহলে নবী প্রেরণ উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়।" এমতাবস্থায় এ ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হতে পারে ? আমরা প্রথমে 'দলীল সম্পূর্ণ হওয়া' প্রসংগের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য যে দলীল সম্পূর্ণ হওয়া এবং নবীর আগমনে যা অনিবার্যরূপে পূর্ণ হয়ে যাওয়া উচিত তা প্রমাণ করেছি। আখেরাতের আযাবের জন্যে যে দলীল সম্পূর্ণ হওয়া জরুরী ও শর্তের পর্যায়ে আছে তা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের আগমন ও দীনের তাবলীগে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তবে দুনিয়ার আযাবের জন্যে যে দলীল সম্পূর্ণ হওয়া জরুরী ও শর্তের পর্যায়ভুক্ত ও তা শুধুমাত্র দীনের তাবলীগ করলেই পূর্ণ হয় না। বরং তজ্জন্য প্রয়োজন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দীনের প্রচার ও প্রসার কাজে নিয়োজিত থাকা এবং আল্লাহর অনুমতি ও নির্দেশ ব্যতিরেকে কিছুতেই আপন অবস্থানস্থল পরিত্যাগ

www.pathagar.com

না করা। এ ধরনের দলীল যে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম কর্তৃক সম্পূর্ণ হয়নি তা বলাই বাহুল্য।

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

এ আয়াতে 'হুজ্জত' অর্থ দলীল-প্রমাণ দিয়ে ঝগড়া করা বা আপত্তি করা। কিয়ামতের দিন যখন কাফের মুশরিকদেরকে জাহান্নামের আযাব দেয়া হবে তখন তারা এরূপ করবে। অর্থাৎ আমরা নবী-রসূলদেরকে এজন্যে পাঠিয়েছি যে, কিয়ামতের দিন যখন লোকদেরকে তাদের কুফরী ও শিরকের জন্যে জাহান্নামের আযাব দেয়া হবে তখন তারা যেন এ প্রতিবাদ না করতে পারে যে, আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব কেন দেয়া হবে? আমাদের কাছেতো কোনো সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি। مَا جَاءَنَا من بشير ولا نذير

নবীগণের আগমনেই যে দলীল সম্পূর্ণ হয় এবং আয়াতে বর্ণিত যে 'দলীল' তার উদ্দেশ্য হলো আখেরাতে শাস্তির জন্যে সম্পূর্ণ হওয়া। দুনিয়ার শাস্তির জন্যে নয়। মাওলানা মওদূদী ইউনুস আলাইহিস সালামের কওমের জন্যে এ ধরনের দলীল সম্পূর্ণ হওয়ার কথা অস্বীকার করেননি। তিনি যে দলীল সম্পূর্ণ হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন তাহলো দুনিয়ার আযাবের জন্যে। এ সম্পর্কে কুরআনের যে নির্দেশ পাওয়া যায় তাহলো—এ ধরনের দলীল সম্পূর্ণ হওয়ার জন্যে আল্লাহর অনুমতি ও নির্দেশ পাওয়ার আগে নবীদের আপন কর্মস্থল ত্যাগ না করা। এমতাবস্থায় মাওলানা মওদূদীর ওপর আপত্তিকারী মহোদয়দের ক্রোধান্বিত হওয়া সম্পূর্ন অযৌক্তিক।

মাওলানা মওদূদী এ বিষয়ে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা স্বস্থানে যদিও সম্পূর্ণ সঠিক ও যথার্থ। তথাপি তিনি মূল তাফহীমুল কুরআনের ২য় খণ্ডে নতুন সংস্করণে সূরা ইউনুসের টীকার ভাষ্যকে বদলিয়ে দিয়ে তাঁর সুস্থ চিত্তের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তিনি টীকা থেকে "হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম রিসালাতের কর্তব্য আদায় করতে গিয়ে কিছুটা ভুল করেছেন" একথা বাদ দিয়ে তদস্থলে লিখেছেন ঃ

"কুরআনের ভাষ্যকারগণ যে কথা বর্ণনা করেছেন সেটাই সঠিক বলে মনে হয়। আযাবের সংবাদ দেয়ার পরই হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়াই আপন কর্মস্থল ত্যাগ করে চলে যান।"

আপত্তি উথাপনকারী ভদ্র মহোয়গণ যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে তাদের সমীপে আমার আরজ হলো, যার সারাটি জীবন দীনে হকের মাথা উঁচু করার নিমিত্তে উৎসর্গীকৃত যিনি ইকামাতে দীনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আদায়ের

www.pathagar.com

জন্যে নিজের বীরত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতা এবং উদ্দীপনার বদৌলতে গোটা ইসলামী বিশ্বে নিজের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান তৈরি করে নিয়েছেন। দলীয় গোঁড়ামীর ভিত্তিতে এমন লোকের পশ্চাদ্ধাবন করা তাঁর ধারণা প্রসূত দোষ ও দুর্বলতাকে বলপ্রয়োগে দুনিয়ার সামনে একটি সত্য ও বাস্তব ঘটনা হিসেবে অতিরঞ্জিত করে পেশ করা দীন ইসলামের কি ধরনের খেদমত অথবা এটা কি আল্লাহর কাছে কোনো সওয়াবের কাজ ? আমরা বুঝতে পারছি না যে, অপরের দোষ ও দুর্বলতাকে দুনিয়ার সামনে সোৎসাহে পেশ করা এবং সাধারণ অসাধারণ সকলের কাছে তা প্রচার করে বেড়ানো কোন্ ধরনের নেকী এবং দীনের খেদমত ? মাছির মতো আবর্জনায় বসে তার দুর্গন্ধ ছড়ানো কোনো ভালো কাজ এবং নেক আমল হতে পারে না। বিজ্ঞজনোচিত কাজ হলো—মানুষের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতার অবসান ঘটানো, অপরের ছিদ্রান্বেষণের স্বাদ আস্বাদনে নয়। এমন প্রকৃতির লোকদের সম্পর্কেই একজন কবি এ কবিতা রচনা করেন ঃ

شر الورى بمساوى الناس مشتغل
مثل الذباب يراعى موضع العلل

সৃষ্টজগতে সে লোকটি সবচেয়ে খারাপ যে অপরের দোষ চর্চায় এমনভাবে মগ্ন থাকে যেমন মাছি সবসময় আবর্জনা ও ময়লার অন্বেষণে সদাব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত থাকে।

পরিশেষে দীনের অনুসারীদের জন্যে করণীয় কাজ কি শুধু এটাই অবশিষ্ট রয়ে গেলো যে, একে অপরের দোষ চর্চার এমনভাবে ব্যস্ত থাকবে যেন এখানে কাজ করার অন্য কেউ আদৌ নেই ?

فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة
وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم-

---

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সশরীরে উর্ধাকাশে উঠিয়ে নেয়া এবং এ বিষয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা

যেসব মৌলিক ও বিতর্কিত বিষয়সমূহ নিয়ে কতিপয় ইলমী মহলের পক্ষ থেকে মাওলানা মওদূদীকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে তন্মধ্যে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। মূল তাফহীমুল কুরআনের ১ম খণ্ডে ৪২১ পৃষ্ঠায় ১৯৫নং টীকায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সশরীরে উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী লিখেছেন ঃ

"কুরআনের ভাবধারার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল কোনো কর্মপদ্ধতি যদি থেকে থাকে তবে তাও শুধু সশরীরে ভূপৃষ্ঠ থেকে উঠিয়ে নেয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলা থেকে বিরত থাকা এবং মৃত্যুর ব্যাখ্যা করা থেকেও চুপ থাকা। বরং মসী আলাইহিস সালামের উঠিয়ে নেয়াকে আল্লাহ তায়ালার অপরাজেয় শক্তির একটি অপূর্ব বিকাশ মনে করে উঠিয়ে নেয়ার প্রকৃতি ও ধরনকে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং অস্পষ্ট রেখেছেন সেভাবে অস্পষ্ট রেখে দেয়া।"

১৯৫নং টীকায় মাওলানা আরো লিখেছেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সশরীরে ভূপৃষ্ঠ হতে তুলে নিয়ে আকাশের নীলিমায় কোথাও রেখে দিয়েছেন তা যেমন কুরআন বলছে না তেমনি একথাও বলছে না যে, যমীনের বুকে কোথাও তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এবং শুধু তার প্রাণই উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কাজেই কুরআনের ভিত্তিতে এর কোনো একটি দিকই নিসন্দেহে গ্রহণ বা বর্জন করা যায় না।"

তাফহীমুল কুরআনের উপরোক্ত ভাষ্যদ্বয়ের ওপর মাওলানা মওদূদীর প্রতিপক্ষ মহোদয়গণের পক্ষ থেকে দু' ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম উত্থাপিত অভিযোগ হলো, এ উভয় ভাষ্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সশরীরে উপরে উঠিয়ে নেয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে যা কুরআনের বুনিয়াদ। অথচ তাঁকে সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে গোটা মুসলিম জাতির ইজমা হয়ে গেছে এবং সমস্ত উম্মতগণ এটাকে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছেন। এমন সর্বস্মমতিক্রমে বিষয়ের অস্বীকার করা কোনো মু'মিনের শান হতে পারে না। এবং এর অস্বীকারকারী মুসলমান থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় অভিযোগ উল্লেখিত ভাষ্যে যদিও হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার কথা অস্বীকার করা হয়নি তথাপি এ বিষয়ে কুরআনে

www.pathagar.com

কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকার কথা অবশ্যই অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের সশরীরে উঠিয়ে নেয়া বিষয়টি যেমন অকাট্য ও সন্দেতাহাতীত অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তেমনি "হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের সশরীরে উঠিয়ে নেয়া কুরআনের ব্যাখ্যাকারী প্রমাণিত" একথাটিও এ বিষয়ের অকাট্য ও সন্দেহাতীত অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং এ দু'টির কোনো একটিও অস্বীকার করা জায়েয নয়। এবং কোনো একটিকে কুরআনের আলোকে সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্ট বলা যেতে পারে না। তাফহীমুল কুরআনের উপরোক্ত ভাষ্যের ওপর বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ শব্দের কিছু কিছু হেরফের করে উপরোক্ত অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। আমরা এই উভয় অভিযোগের জবাব পেশ করবো।

আমাকে ক্ষমা করবেন, বর্তমান যুগের উলামায়ে কিরামের মধ্যে কিছুসংখ্যক এমন লোক অনুপ্রবেশ করেছে যে, তাদের মনে হিংসা, বিদ্বেষ ও জিঘাংসার ব্যাধি সংক্রামক রোগের মতো ছড়িয়ে গেছে। যার ফলে তারা এতো সংকীর্ণমনা ও মাওলানা মওদূদীর বেলায় এমন পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে যে, মাওলানার যে কোনো লেখা তাদের নজরে পড়লে তা থেকে কোনো না কোনো ত্রুটি বের না করা পর্যন্ত যেন এসব মহামানবদের আর কোনো স্বস্তি থাকে না। আর যদি কোথাও কোনো ত্রুটির সন্ধান না পাওয়া যায় তাহলে নিজেদের তরফ থেকে ত্রুটি তৈরি করার উত্তম খেদমতে মগ্ন হয়ে যান। তারা এতটুকু মাত্রা ছাড়িয়েছেন যে, মাওলানা তাঁর লেখার কোনো কথা দলীলসহ প্রমাণ করলেও তাঁরা বলেন ঃ তিনি এটা অস্বীকার করেছেন। তাদের দোষ সন্ধানী চক্ষু কখনো ঐসব দলীলের প্রতি তাকায় না। আমাদের মতে এর আসল কারণ হলো অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ যখন একবার কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা কিংবা হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করে, তখন সে ব্যক্তি কথার মর্মমূলে পৌঁছা কিংবা তার তাৎপর্য উপলব্ধি করার সৌভাগ্য আর তার হয় না। মাওলানা মওদূদীর সাথে বিদ্বেষ পোষণকারী এসব মহামনীষীগণ যেহেতু হিংসা, বিদ্বেষ ও জিঘাংসার ব্যাধিতে আক্রান্ত ; সুতরাং মাওলানা মওদূদীর প্রতিটি সত্য ও সঠিক কথাও তাদের কাছে ভুল মনে হচ্ছে। এমনকি কোনো মাসয়ালা যদি দলীল দ্বারা তিনি প্রমাণও করে থাকেন তবুও এসব ভদ্রলোক মাওলানাকে সে মাসয়ালার অস্বীকারকারীরূপে চিত্রিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এখানে লক্ষ্য করুন। মাওলানা মওদূদী তাঁর ব্যাখ্যামূলক টীকায় আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত জোরালোভাবে কুরআনে করীমের পূর্বাপর বেশ কিছু দলীল-প্রমাণ পেশ করে একথা প্রমাণ করেছেন যে, হযরত মসীহ আলাইহিস সালামকে শরীর ও আত্মাসহ আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। যদিও কুরআনে দেহ ও আত্মা শব্দদ্বয়ের উল্লেখ স্পষ্টভাবে করা হয়নি তবুও

www.pathagar.com

কুরআনের বর্ণনাভংগী ও তার পূর্বাপর বিষয়বস্তু তাকে হযরত মসীহ আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নেয়ার তাৎপর্য সশরীরে উঠিয়ে নেয়াই হতে পারে। আত্মিকভাবে উঠিয়ে নেয়া বা মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়ার অর্থ যে হতে পারে না একথা দিবালোকের মত পরিষ্কার। কিন্তু তারপরও ন্যায়ের দুশমন এসব ভদ্রলোক একথা বলে বেড়াচ্ছে যে, মাওলানা মওদূদী হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের সশরীরে উঠিয়ে নেয়া এ বাক্যের দ্বারা অস্বীকার করেছেন। অথচ মাওলানা একথা অস্বীকার করেননি বরং তা কুরআনের দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন। এর প্রমাণের জন্য আমরা নিম্নে তাফহীমুল কুরআনের বাক্য ব্যাখ্যা-সহ দলীল হিসেবে পেশ করছি। এভাবে আপনি নিজেই জানতে পারবেন যে, এ বাক্য দ্বারা মাওলানা মওদূদী সশরীরে উঠিয়ে নেয়া অস্বীকার করেননি বরং তা কুরআনের দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

•

তাফহীমুল কুরআনের বাক্য

মাওলানা মওদূদী মূল তাফহীমুল কুরআনের ১ম খণ্ডে ৪২০ পৃষ্ঠায় সূরা আন নিসার وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ১৯৫নং টীকায় লিখেছেন ঃ

"এটা হলো আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য। এ আয়াতে একথাটিই আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। এখানে দৃঢ়তা সহকারে স্পষ্টভাবে যে কথাটি বলা হয়েছে তাহলো, হযরত মসীহ আলাইহিস সালামকে হত্যা করার ব্যাপারে ইহুদীরা সফলকাম হয়নি এবং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।"

এখন প্রশ্ন হলো উঠিয়ে নেয়ার সঠিক রূপটি কি ? এ সম্পর্কে কুরআনে বিস্তারিতভাবে কিছুই বলা হয়নি। আল্লাহ তাঁকে সশরীরে ভূপৃষ্ঠ থেকে তুলে নিয়ে আকাশ রাজ্যের কোথাও রেখে দিয়েছেন তা যেমন কুরআনে বলা হয়নি, তেমনি একথাও কুরআনে বলা হয়নি যে, দুনিয়ায় তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এবং শুধু তাঁর আত্মাকেই উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কাজেই কুরআনের ভিত্তিতে এর মধ্যে কোনো একটিকে নিসন্দেহে গ্রহণ বা বর্জন করা যায় না।

ব্যাখ্যা ঃ এটা তাফহীমুল কুরআনে উল্লেখিত বাক্যের প্রথম অংশ। বাক্যের এ অংশে মাওলানা চারটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম দু'টি বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এর একটি হলো ইহুদীরা "হযরত মসীহ আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে সফলকাম হয়নি" এবং দ্বিতীয়টি হলো "আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।"

www.pathagar.com

শেষ দু'টি জিনিস সম্পর্কে বলা হয়েছে, কুরআনে এ দু'টির স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়নি। একটি হলো, "হযরত মসীহ আলাইহিস সালামকে দেহ ও আত্মাসহ ভূপৃষ্ঠ থেকে উঠিয়ে আকাশ রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে" এবং দ্বিতীয় হলো, "ভূপৃষ্ঠেই তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে।" এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, কুরআনে করীমের ভিত্তিতে সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারটি অকাট্যভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা যায় না। একইভাবে কুরআনের ভিত্তিতে হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের মৃত্যু হওয়া ও না হওয়া নিশ্চিত নয়।"

কেউ যদি এ বাক্যের ওপর আপত্তি করতে চায় তবে বড়জোর এ বলে আপত্তি করতে পারে যে, এতে দাবী করা হয়েছে "কুরআনের ভিত্তিতে সশরীরে উঠিয়ে নেয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়।" এর যে কারণ বলা হয়েছে তাহলো "কুরআনে স্পষ্টভাবে একথা বলা হয়নি।" কিন্তু একথা সঠিক নয়। কারণ, কুরআন দ্বারা কোনো বস্তু অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার জন্য সে বস্তুটির ব্যাখ্যা কুরআনে থাকাই একমাত্র পদ্ধতি নয়। বরং আগে বা পরে তা প্রমাণিত হওয়ার জন্য যদি অকাট্য দলীল বর্তমান থাকে অথবা অনান্য আয়াত দ্বারা এর প্রমাণের ওপর অকাট্য দলীল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তাহলে সে বস্তুটি কুরআন দ্বারা নিসন্দেহে প্রমাণিত বলেই গ্রহণ করা হবে। যদিও কুরআনে সরাসরি বস্তুটির ব্যাখ্যা না করা হয়। এখানে সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার পক্ষে কুরআনের পূর্বাপর এমন সব দলীল প্রমাণাদি পাওয়া যায় যাদ্বারা সশরীরে উঠিয়ে নেয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। সুতরাং "কুরআনের ভিত্তিতে দু'টি বস্তুর কোনো একটিকে নিসন্দেহে গ্রহণ এবং বর্জন করা যায় না" একথা বলা ঠিক নয়। তবে বাক্যের কোথাও এমন কোনো কথার অবতারণা করা হয়নি যাদ্বারা কুরআন থেকে প্রমাণিত সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার মূল প্রতিপাদ্যকে মাওলানা অস্বীকার করেছেন বলে প্রতিভাত হয়। সুতরাং মাওলানাকে সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার অস্বীকারকারী বলা দুরস্ত হতে পারে না। বরং তাঁর লেখায় গভীরভাবে চিন্তা করলে এ সত্য স্পষ্ট হয় যে, তিনি সশরীরে উঠিয়ে নেয়া কুরআন থেকে প্রমাণিত বলে স্বীকার করেন। তিনি যে কথাটুকু অস্বীকার করেন, তাহলো কুরআনে দেহ ও আত্মার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি অর্থাৎ কুরআন থেকে সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার বিষয়টি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায়। তবে কুরআনে এটি স্পষ্ট করে বলা হয়নি। সুতরাং তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তাকে দেহ ও আত্মাসহ ভূপৃষ্ঠ থেকে উঠিয়ে আকাশ রাজ্যের কোথাও নিয়ে গেছেন। অথবা ভূপৃষ্ঠেই তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে—কুরআন এসব কথার কোনোটাই সুস্পষ্টভাবে বলে না। তাঁর লেখায় স্পষ্টভাবে বলার ব্যাপারটা অস্বীকার করা হয়েছে মাত্র, সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার মূল বক্তব্যকে নয়।

www.pathagar.com

একটি ধারণার অপনোদন

কিন্তু তারপর যদি কোনো কল্পনা বিলাসী লোক "কুরআন দেহ ও আত্মার কথা স্পষ্ট করে বলেনি" মাওলানার এ বাক্যকে কেন্দ্র করে এ ধারণার বশবর্তী হয় যে, সম্ভবত এ বাক্য দ্বারা সশরীরে উঠিয়ে নেয়া অস্বীকার করাই মাওলানার উদ্দেশ্য। তাহলে এ ধারণা অপনোদনের জন্যে মাওলানার আগের বাক্যই যথেষ্ট। খুব সম্ভব এ কারণেই মাওলানা আগের লেখায় এ ধরনের ভিত্তিহীন ধারণা ও কল্পনা নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে لیکن (তবে) শব্দ প্রয়োগ করে তার বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "তবে কুরআনের ভাষণের ধরন সম্পর্কে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে মনে হয় যে, উঠিয়ে নেয়ার স্বরূপ ও অবস্থা যাই হোক না কেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্যে আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো অস্বাভাবিক ধরনের ব্যবস্থা করেছেন।"

হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের উঠিয়ে নেয়ার ধরন ও ব্যবস্থা অসাধারণ ধরনের ছিলো একথা উক্ত বাক্যে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তবে এ অস্বাভাবিকতার ধরণটা কি ? এ ব্যাপারে এ বাক্যের মধ্যে কোনো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। তবে পরবর্তী বাক্যে মাওলানা ব্যাপারটি অস্বাভাবিকতার প্রকাশের জন্য প্রমাণ স্বরূপ যে তিনটি জিনিস পেশ করেছেন তা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মাওলানার মতে সশরীরে উঠিয়ে নেয়াই হলো অস্বাভাবিকতা। তিনি লিখেছেন ঃ

"এ অস্বাভাবিকতার প্রকাশ ঘটে তিনটি জিনিস থেকে। এক, ঈসায়ীদের মধ্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে দেহ ও প্রাণসহ উঠিয়ে নেয়ার ধারণা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিলো এবং একটি বিরাট দলের হযরত মসীহ আলাইহিস সালামকে খোদা বলার মূল কারণ ছিলো এটা। এতদসত্ত্বেও কুরআন কেবল এর স্পষ্ট প্রতিবাদ করেনি তাই নয়। বরং উঠিয়ে নেয়া (Asccusion) শব্দটিই ব্যবহার করেছে যা ঈসায়ীগণ এ ক্ষেত্রের জন্যে ব্যবহার করতো। কোনো ধ্যান-ধারণার প্রতিবাদ করতে গিয়ে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করে তাকে আরো দৃঢ় করে তোলা কুরআনের মতো গ্রন্থের জন্য শোভনীয় নয়। কারণ, কুরআন হলো 'কিতাবুম মুবীন' বা স্পষ্ট বর্ণনাকারী গ্রন্থ।

ব্যাখ্যা ঃ যাদের মনে ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহ ভীতি আছে এবং স্বভাবগত পক্ষপাত দোষে দুষ্ট নয় তারা মাওলানার এ ভাষ্যের ওপর সামান্য চিন্তা করলে সহজেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হবে যে, মাওলানার মতে এ অস্বাভাবিকতার স্বরূপ হলো শুধুমাত্র সশরীরে উঠিয়ে নেয়া, এছাড়া আর কিছু এর অর্থ নয়।

www.pathagar.com

প্রথমত, এ কারণে যে, মাওলানা হযরত মসীহ আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নেয়াকে অস্বাভাবিক ধরনের ব্যাপার বলে ঘোষণা করেছেন। আর স্বাভাবিক ধরনের উঠিয়ে নেয়া সশরীরে উঠিয়ে নেয়া ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কেননা উঠিয়ে নেয়া এখানে যুক্তিসংগতভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) আত্মা উঠিয়ে নেয়া (২) মর্যাদা উঁচু করা (৩) দেহ ও আত্মা একত্রে উঠিয়ে নেয়া। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। কেননা, এ দু'টি হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে কুরআন নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হিসেবে চালু ছিলো এবং কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। তবে তৃতীয় প্রকারের উঠিয়ে নেয়া একটি বিরল ঘটনা যা মসীহ আলাইহিস সালামের আগে আর কোনো মানুষের বেলায় ঘটেনি এবং এ ধরনের উঠিয়ে নেয়া আল্লাহর নীতিরও অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং অস্বাভাবিকভাবে উঠিয়ে নেয়া এ ধরনের উঠিয়ে নেয়াই কেবল (সশরীর) হতে পারে। আত্মা উঠিয়ে নেয়া বা মর্যাদা উঁচু করা নয়।

মাওলানা মওদূদী যখন তাঁর ব্যাখ্যামূলক বাক্যের প্রথমে একথা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, "কুরআন যেসব বস্তু সম্পর্কে দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা সহকারে বর্ণনা করেছে তন্মধ্যে হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের উঠিয়ে নেয়া অন্যতম।" তারপর স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ "এ উঠিয়ে নেয়া অস্বাভাবিক ও বিরল ধরনের।" আর অস্বাভাবিক ধরনের উঠিয়ে নেয়া কেবলমাত্র সশরীরে উঠিয়ে নেয়াই হতে পারে। আত্মার উঠিয়ে নেয়া কিংবা মর্যাদা উঁচু করা নয়। بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ আয়াতের এ তাৎপর্য সশরীরে উঠিয়ে নেয়া অন্য ধরনের উঠিয়ে নেয়া নয়।

তবে যেহেতু কুরআনে দেহ ও আত্মা সহ উঠিয়ে নেয়ার কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সুতরাং মাওলানা অত্যন্ত সতর্কতার ভিত্তিতে বলেছেন ঃ "সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার কথা স্পষ্টভাবে কুরআনে আছে এ ধরনের কথা বলা থেকে বিরত থাকা দরকার" যাতে কুরআনের সাথে এমন কোনো বিষয় সম্পর্কিত হয়ে না পড়ে যা কুরআনে নেই। এর অর্থ আবার এরূপ নয় যে, উঠিয়ে নেয়ার প্রমাণ কুরআনে নেই অথবা بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ আয়াতের رَفَعَ দ্বারা সশরীরে উঠিয়ে নেয়া ছাড়া অন্য ধরনের উঠিয়ে নেয়া অথবা মাওলানা নিজেই সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার সমর্থক নয়।

দ্বিতীয়ত, বিষয়টির অস্বাভাবিক ও বিরল ঘটনা হওয়াকে মাওলানা সশরীরে উঠিয়ে নেয়া মনে করেন তার প্রমাণ হলো তিনি যেসব যুক্তি-প্রমাণের

www.pathagar.com

অবতারণা করেছেন তাতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এখানে অস্বাভাবিকতার অর্থ হলো সশরীরে উঠিয়ে নেয়া। অন্য কোনো প্রকারের উঠিয়ে নেয়া নয়। এর দলীল হলো, মসীহ্ আলাইহিস সালামের সশরীরে উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কিত বিশ্বাস ঈসায়ীদের আগে থেকেই ছিলো। তাঁকে দেহ ও আত্মাসহ আকাশ রাজ্যে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি বিরাট দল তাকে খোদা ঘোষণা করেছে। এক্ষণে যদি এ বিশ্বাস বাস্তবিকই ভুল হতো এবং সশরীরে উঠিয়ে নেয়া আদৌ প্রমাণিত না হতো তাহলে কুরআনে এটাকে সুস্পষ্ট ভাষায় নাকচ করে দিতো। رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ শব্দ বলে সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার ভুল আকীদাকে আরো শক্তিশালী করতো না। কারণ, কোনো ধারণাকে খণ্ডন করার অভিপ্রায় নিয়ে এমন শব্দ প্রয়োগ করা যাতে খণ্ডনের পরিবর্তে সে ভুল ধারণা অধিক শক্তিশালী হয়। এমন কথা কুরআনে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।

ঈসায়ীরা এ ব্যাপারে যেসব শব্দ ব্যবহার করে আসছে কুরআনও সেসব শব্দ প্রয়োগ করছে। তাতে মনে হয় ঈসায়ীদের সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার আকীদা ভুল কিংবা ভিত্তিহীন নয়। বরং স্বস্থানে ঠিক এবং হযরত মসীহ্ আলাইহিস সালামকে দেহ ও আত্মাসহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। মোটকথা মাওলানার লেখাটি এ ব্যাপারে একথার ব্যাখ্যা স্বরূপ যে, হযরত মসীহ্ আলাইহিস সালামের জন্যে যে উঠিয়ে নেয়া স্বীকৃত হয়েছে তাদ্বারা উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সশরীরে উঠিয়ে নেয়া অন্য ধরনের উঠিয়ে নেয়া নয়। মাওলানা মওদূদী সশরীরে উঠিয়ে নেয়াকে অস্বীকার করেছেন এমন কোনো শব্দ তাঁর লেখায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তৃতীয়ত, অস্বাভাবিক ধরনের উঠিয়ে নেয়ার অর্থ সশরীরে উঠিয়ে নেয়া— একথা মাওলানা তার লেখায় প্রমাণ করেছেন। আমরা আগেই বলেছি উঠিয়ে নেয়া তিন ধরনের হতে পারে।

(১) আত্মাকে উঠিয়ে নেয়া (২) মর্যাদা উন্নত করা (৩) দেহ ও আত্মাকে একত্রে উঠিয়ে নেয়া। তন্মধ্যে প্রথম দু' প্রকার যে, আয়াতের বিষয়বস্তু হতে পারে না তা মাওলানা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ আয়াতের رَفَعَهُ -এর অর্থ আত্মা উঠিয়ে নেয়া কিংবা মর্যাদা উন্নত করা কখনো হতে পারে না। অস্বাভাবিক ধরনের উঠিয়ে নেয়া যদি সশরীরে উঠিয়ে নেয়া না হয়, তাহলে আর কোন্ ধরনের উঠিয়ে নেয়া হবে? অতএব, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এখানে অস্বাভাবিক উঠিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য হলো সশরীরে উঠিয়ে নেয়া, অন্য কোনো ধরনের উঠিয়ে নেয়া নয়। আগে অগ্রসর হয়ে বিষয়টি মাওলানার লেখায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

"দ্বিতীয় হলো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারটি যদি প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে উঠিয়ে নেয়ার মতো হতো কিংবা তার অর্থ যদি শুধু

www.pathagar.com

মর্যাদা বৃদ্ধি হতো—যেমন ইদরীস আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا "তাকে উচ্চস্থানে তুলে নিয়েছি"—তাহলে কথাটি বলার ধরন কখনো এরূপ হতো না যা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। তখন বিষয়টি বর্ণনা করার জন্য অধিক সংগত হতো এরূপ ভাষায় বলা যে, "নিশ্চয়ই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে জীবন্ত বাঁচিয়েছেন। তারপর মসীহ আলাইহিস সালাম স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। ইহুদীগণ তাঁকে লাঞ্ছিত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে উন্নত মর্যাদা দান করেছেন।"

তৃতীয় হলো, এ উঠিয়ে নেয়া 'যদি সাধারণ উঠিয়ে নেয়া হতো যেমন প্রচলিত কথায় আমরা প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির জন্যই বলে থাকি যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে উঠিয়ে নিয়েছেন' তাহলে তা উল্লেখ করার পর 'আল্লাহ বড় শক্তিমান ও জ্ঞানী' বাক্যাংশ উল্লেখ করা একেবারেই অপ্রাসংগিক হয়ে পড়ে। এ ধরনের বাক্যাংশ কেবল তখনই যথার্থ ও সংগত হতে পারে যখন আল্লাহর অপরিসীম শক্তি ও বিজ্ঞতার অস্বাভাবিকভাবে প্রকাশ ঘটে।

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের মতে একজন ন্যায়নিষ্ঠ সত্যপ্রিয় লোকের জন্য এ বাক্যাংশ যার মধ্যে অস্বাভাবিকতা প্রকাশের দু'টি ইংগিত উল্লেখ করা হয়েছে —একথা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, হযরত মসীহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কুরআনের বাণী بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ তে যে رَفَعَ -এর কথা বলা হয়েছে মাওলানা মওদূদী সেটাকে অস্বাভাবিক উঠিয়ে নেয়া বলে ঘোষণা করেছেন ; আত্মার উঠিয়ে নেয়া অথবা মর্যাদার উন্নতি করা নয়। বরং সেটাকে এমন ধরনের উঠিয়ে নেয়া যাদ্বারা আল্লাহ তায়ালার অপরাজেয় শক্তি ও পরিপূর্ণ বিজ্ঞতার অপূর্ব প্রকাশ ঘটে। সশরীরে উঠিয়ে নেয়া ছাড়া অন্য কোনো উঠিয়ে নেয়া দ্বারা তা প্রকাশ হতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে, তাফহীমুল কুরআনের উল্লেখিত অস্বাভাবিক ধরনের উঠিয়ে নেয়ার অর্থ হলো কেবলমাত্র সশরীরে উঠিয়ে নেয়া অন্য ধরনের উঠিয়ে নেয়া নয়।

মাওলানার যদিও এ বাক্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্যে কুরআনে যে رَفَعَ শব্দের ব্যবহার হয়েছে তাতে একথা স্পষ্ট করে বলেনি যে, এর অর্থ সশরীরে উঠিয়ে নেয়া তবুও বাক্যের পূর্বাপরের সম্পর্ক চিন্তা করলে একথা স্বতঃই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এখানে উঠিয়ে নেয়ার অর্থ হলো সশরীরে উঠিয়ে নেয়া এতে অন্য ধরনের উঠিয়ে নেয়া আদৌ উদ্দেশ্য নয়। বরং আগের বাক্যাংশে মাওলানার মতে সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কাদিয়ানীদের যুক্তির জবাবে মাওলানা লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

"এর উত্তরে কুরআন থেকে কোনো যুক্তি পেশ করতে হলে শুধু এতটুকু বলা যেতে পারে যে, সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তায়ালা مُتَوَفِّيكَ শব্দটি বলেছেন (৬ষ্ঠ রুকূ)। কিন্তু সেখানে ৫১নং টীকায় আমরা একথা বলেছি যে, শব্দটি সাধারণ মৃত্যুর অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এর দ্বারা প্রাণ হরণ, দেহ ও প্রাণ উভয়কে কব্জ করাও বুঝায়। কাজেই উপরে বর্ণিত কারণসমূহ অকেজো বলে ঘোষণা করার জন্যে এটা কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়।"

কাদিয়ানীদের প্রশ্ন ও তার জবাব

কোনো কোনো লোক (কাদিয়ানী) হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে একথা বুঝাবার জন্যে পীড়াপীড়ি ও জিদ করে তারা প্রশ্ন করে যে, تَوَفِّى শব্দটি 'সশরীরে উত্থান' অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার আর কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি ? কিন্তু সশরীরে উত্থান লাভের ব্যাপারটি যখন গোটা মানব জাতির ইতিহাসে একবার মাত্র সংঘটিত হয়েছে, তখন এর আরো দৃষ্টান্ত পেতে চাওয়া নিতান্তই অর্থহীন। আসলে দেখার বিষয় হলো, মূল অভিধানের দৃষ্টিতে উক্ত রূপ অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করার অবকাশ আছে কিনা। যদি থাকে তবে বলতে হবে যে, কুরআন সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার বিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করার পরিবর্তে এ শব্দটি ব্যবহার করে সে বিশ্বাসকে দৃঢ়তা দান করেছে এবং এভাবে উক্ত বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছে। অন্যথায় মৃত্যুর স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে দ্ব্যর্থবোধক 'ওফাত' শব্দ এমন স্থানে কিছুতেই ব্যবহার করা হতো না যেখানে পূর্ব থেকেই সশরীরে উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কিত ধারণা বর্তমান রয়েছে এবং যে কারণে ঈসা আলাইহিস সালামের খোদা হওয়ার বাতিল ধারণার জন্ম হয়েছে।"

ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা এ বাক্য দ্বারা কাদিয়ানীদের যুক্তি-প্রমাণের জবাব দিয়েছেন। জবাবে তিনি مُتَوَفِّيكَ শব্দের تَوَفِّى দ্বারা দেহ ও আত্মাকে কব্জ করা অর্থ পরিষ্কার ভাষায় করেছেন। গোটা মানব ইতিহাসে দেহ ও আত্মার কব্জ একবার মাত্র সংঘটিত হয়েছে। [হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা]। সুতরাং কাদিয়ানীদের এ ধরনের দৃষ্টান্ত চাওয়া নিতান্তই অযৌক্তিক ও অর্থহীন। আমরা হতভম্ব হয়ে যাই যখন দেখি এরূপ সুস্পষ্ট বাক্য থাকার পরও কতিপয় গোঁড়া ও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট লোক একথা বলে বেড়ায় যে, মাওলানা মওদূদী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সশরীরে উত্থানকে অস্বীকার করেছেন। এ ধরনের লোকদের জন্যে আমরা শুধু একথাই বলবো যে, আল্লাহ যেন তাদের অন্তরকে গোঁড়ামী ও কলহ প্রিয়তা থেকে পাক পবিত্র করে দেন এবং সত্য কথা সঠিকভাবে বুঝার শক্তি দেন। আমীন।

www.pathagar.com

এ পর্যন্ত যাকিছু নিবেদন করা হয়েছে তা মাওলানা মওদূদীর 'সশরীরে উত্থান' বিষয় অস্বীকার করাকে কেন্দ্র করে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব সম্পর্কিত ছিলো। এরপর আর একটি প্রশ্ন থেকে যায় তাহলো তাফহীমুল কুরআনের বাক্যে যদিও 'সশরীরে উত্থান' হওয়ার কথা অস্বীকার করা হয়নি কিন্তু কুরআনে তা স্পষ্টভাবে থাকার কথাতো অবশ্যই অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ কুরআনে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আর যখন কুরআন থেকে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে তখন কুরআন তাকে অস্পষ্ট সাব্যস্ত করা ঠিক নয়, যেমন মাওলানা মওদূদী বলেছেন ঃ

এ অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্যে প্রথমত বিষয়টির তাৎপর্য পরিষ্কার হওয়া জরুরী। তারপর এর শরয়ী মর্যাদা নির্দিষ্ট করতে হবে যাতে 'সশরীরে উত্থানের' শরয়ী মূল্যায়ন সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং মাওলানা মওদূদী এ বিষয় সম্পর্কে তাঁর নিজের যে গবেষণা পেশ করেছেন তা শরয়ী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যশীল না অসামঞ্জস্যশীল তা বিচার করা যায়।

সশরীরে উত্থানের তাৎপর্য ও তার শরয়ী মর্যাদা

আমরা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে একথা বলতে পারি যে, কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং উম্মতের বিশ্বাসের আলোকে বিষয়টির তাৎপর্য ও শরয়ী মূল্যবোধ কেবল এটাই নির্ধারিত হয় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে ইহুদীগণ হত্যা করেনি, শূলবিদ্ধও করেনি ; বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দেহ ও আত্মাসহ আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। দাজ্জালের আবির্ভাব হলে তিনি আসমান থেকে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন খলীফা হিসেবে ইসলামী শরীয়াত মুতাবেক ফায়সালা করবেন।

বিষয়টির উপরোক্ত তাৎপর্য এবং শরয়ী মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন, হাদীসে প্রমাণ রয়েছে এবং গোটা মুসলিম উম্মাহ একথার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। নবীর যমানা থেকে আজ পর্যন্ত বিষয়টি শরীয়াতের দৃষ্টিতে এ মর্যাদাই পেয়ে আসছে। কুরআনের কোনো আয়াতেই সশরীরে উত্থানের স্পষ্ট উক্তি নেই। কুরআন একথাও বলে না যে, "হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে দেহ ও আত্মাসহ জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।" এ বিষয়ে গোটা উম্মত একমত নয় এবং কুরআনের কোথাও এ ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এমন কথার পেছনে কোনো সমর্থন আছে বলেও আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। ঐকমত্য পোষণ করাতো দূরের কথা। এ ধরনের কোনো ব্যাখ্যা কুরআনে থাকলে অনিবার্যরূপে এমন আয়াতও পাওয়া যেতো যার বাক্য হতো এরূপ ঃ

www.pathagar.com

ان اللّٰه قد رفع عيسى حيًّا بجسده العنصرى الى السّماء۔

অথচ এ ধরনের কোনো আয়াত কুরআনে নেই। আজ পর্যন্ত কোনো আলেম একথা বলার সাহস করতে পারবে না যে, কুরআনে দেহ ও আত্মা শব্দদ্বয়ের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। কেননা এ ধরনের সাহসিকতা প্রদর্শনের সুস্পষ্ট অর্থ হলো কুরআনে এমন কোনো আয়াতের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যা আজ পর্যন্ত গোটা উম্মতের কারো নজরে পড়েনি। মোটকথা, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সশরীরে উত্থান সম্পর্কে গোটা উম্মত একমত এবং আজ পর্যন্ত সমগ্র উম্মত একাদিক্রমে এ মতই পোষণ করে আসছে। তবে কথা হলো কুরআনে বিষয়টির স্পষ্ট উক্তি সম্পর্কে এটা প্রমাণিতও নয় এবং উম্মতগণও একথার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেননি।

একটি জরুরী ব্যাখ্যা

কুরআনে যদিও দেহ ও আত্মার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু এর অর্থ কখনো এ নয় যে, কুরআন থেকে সশরীরে উঠিয়ে নেয়া প্রমাণিতও হয় না অথবা কুরআনের প্রমাণে অকাট্যতা নাই। ব্যাপারটা কস্মিনকালেও তা নয়। সশরীরে উত্থান সম্পর্কে কুরআনের প্রমাণ অকাট্য ও সন্দেহাতীত। এর একটি কারণ হলো কুরআনে দু'টি কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি কতল অপরটি উঠিয়ে নেয়া। কতল বা হত্যা কার্যটি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দেহ ও আত্মা উভয়ের কোনোটির ওপরই সংঘটিত হয়নি বলে বলা হয়েছে। কেননা وَمَا قَتَلُوْهُ আয়াতাংশের ضمير (সর্বনাম) দ্বারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। আর দেহ ও আত্মার সমষ্টিই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অস্তিত্ব। بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ আয়াত দ্বারা যে উত্থানের কথা স্বীকার করা হয়েছে সেটাও ব্যক্তি সত্তার (দেহ ও আত্মা) জন্যে। তাই যদিও দেহ ও আত্মার স্পষ্ট উল্লেখ এ আয়াতে নেই তথাপি সশরীরে উত্থানের ওপর আয়াতের প্রমাণ অকাট্য।

দ্বিতীয় কারণ হলো কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনা এবং বর্ণনাভংগি সশরীরে উত্থানের অকাট্য দলীল হিসেবে প্রতীয়মান হয়। যেমন, ওপরে তাফহীমুল কুরআনের বাক্যাংশে অস্বাভাবিকতা প্রকাশ করার জন্যে মাওলানা মওদূদী পেশকৃত দলীলসমূহ। এগুলোর সারমর্ম আমরা পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখ করবো। সুতরাং কুরআনে দেহ ও আত্মার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও বিষয়টির অকাট্যতায় কোনো পার্থক্য সূচিত হবে না। তাছাড়া মুতাওয়াতের অর্থ হাদীসমূহও সশরীরে উত্থান হওয়াকে অকাট্য ও নিসন্দেহে প্রমাণিত করে। সুতরাং বিষয়টি অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত সন্দেহযুক্ত বা অনিশ্চিত নয়। বিশেষত যখন

www.pathagar.com

এর ওপর ইজমা হয়ে গেছে এবং নবীর যামানা থেকে অদ্যাবধি অনবরত চলে আসছে তখন এর অকাট্যতা ও নিশ্চয়তা আরো সুদৃঢ় ও মজবুত হয়ে যায়।

আমার মতে যেসব বিষয় সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলা হয়নি সশরীরে উত্থান বিষয়টি সেসব বিষয়ের অন্যতম। তথাপি কুরআনের বর্ণনা পদ্ধতি, উম্মতের ইজমা এবং যুগ যুগের নিরবচ্ছিন্ন আচরণ ইসলামী শরীয়াতে এমন অকাট্য ও অমোঘ স্বীকৃতি পেয়েছে যে, বিষয়টির অস্বীকারী এক মিনিটের জন্যেও ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থাকতে পারে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও এ ধরনের বিষয়ের একটি। কেননা নামায সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, অমুক সময়ে এতো রাকায়াত নামায পড়তে হবে। কিন্তু কুরআনের বাচনভংগি, উম্মতের ইজমা এবং তাদের নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বাস ও দৈনন্দিন আচরণ বিষয়টিকে ইসলামী শরীয়াতে এমন অকাট্য ও নিশ্চিন্তরূপ লাভ করে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায অথবা এর কোনো এক ওয়াক্ত নামায অস্বীকারকারী এক মুহূর্তের জন্যেও ইসলামের সীমার মধ্যে থাকতে পারবে না। সশরীরে উঠিয়ে নেয়া বিষয়টিও ঠিক অনুরূপ। এ সম্পর্কে যদিও কুরআনে দেহ ও আত্মার কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি তথাপি কুরআনের বাচনভংগি রাসূলের অনুরূপ অর্থবোধক মুতাওয়াতের হাদীস, উম্মতের ইজমা এবং তাদের লাগাতার বিশ্বাসে বিষয়টি এমন অকাট্য ও নিসন্দেহ হয়ে যায় যে, তার অস্বীকারকারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায অস্বীকারকারীকে অনুরূপ পরিণতি ভোগ করতে হবে। অতএব কুরআনের ভিত্তিতে যদিও সশরীরে উত্থানের বিষয়টি স্পষ্ট নয় তবুও অন্যান্য শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে সশরীরে উত্থানের বিষয়টি অকাট্যই থাকে।

সশরীরে উত্থান বিষয়ের অংশসমূহ

বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্যে তার বিন্যস্ত অংশগুলো চিহ্নত করে দেখা দরকার যে, তার কোন্ কোন্ অংশের স্পষ্ট উল্লেখ কুরআনে রয়েছে আর কোন্ কোন্ অংশের নেই। আমরা যতটুকু চিন্তা-গবেষণা করেছি এবং কুরআন, হাদীস ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমদের ইলমী গবেষণার আলোকে বিষয়টির বিন্যস্ত অংশগুলো জানতে পেরেছি তা ৪টি অংশে নিম্নে ক্রমানুসারে উল্লেখ করছি ঃ

প্রথম অংশ ঃ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে ইহুদীগণ হত্যা করেনি, শূল বিদ্ধও করেনি ; বরং বিষয়টি তাদের কাছে সন্দেহপূর্ণ রয়ে গেছে।

দ্বিতীয় অংশ ঃ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অংশ ঃ কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি আসমান থেকে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং সমকালীন সমস্ত ফেতনা-ফাসাদকে নিশ্চিহ্ন করে ইসলামী জীবন পদ্ধতি ধরাপৃষ্ঠে চালু করবেন এবং তদানুযায়ী শাসন চালাবেন।

চতুর্থ অংশ ঃ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এ উত্থান সশরীরে হয়েছে অর্থাৎ তাঁকে দেহ ও আত্মাসহ আকাশ রাজ্যে উঠিয়ে নেয়া হয়। রূহানী অথবা মর্যাদার উন্নতি এখানে কখনো অর্থ নয়।

উপরোক্ত অংশ চতুষ্টয় গোটা মুসলমান সমাজ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হওয়া এবং সমস্ত মুসলমানেরা তা সর্বতোভাবে মেনে চলে ; কদাচিত কেউ কোনো অংশের ব্যাপারে পার্থক্য করলেও তা ধর্তব্য নয়। অধিকন্তু প্রায় গোটা উম্মতের কাছে এ অংশ চতুষ্টয় সার্বিকভাবে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত। এগুলোর কোনোটা ধারণামূলক কোনোটা অকাট্য এমন নয়। তথাপি এগুলোর অকাট্যতা ও অমোঘ হওয়ার ব্যাপারে প্রভেদ আছে। এদিক থেকে যে, কোনো কোনো অংশ স্পষ্টভাবে কুরআনে উল্লেখ আছে আবার কোনো অংশের সুস্পষ্ট উল্লেখ কুরআনে নেই ; বরঞ্চ কুরআনের বাচনভংগী ও পূর্বাপর বিষয় দ্বারা তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অথবা সমার্থক মুতাওয়াতের হাদীস এসব অংশের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। কুরআনে যেগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে এবং যেগুলো উল্লেখিত হয়নি তা আমরা নীচে আলোচনা করছি।

কুরআনে যেসব অংশের স্পষ্ট উল্লেখ আছে

উপরোল্লেখিত অংশ চতুষ্টয়ের মধ্যে কুরআনের প্রথম অংশদ্বয়ের উল্লেখ সুস্পষ্টভাবে করা হয়েছে। সূরা আন নিসায় বলা হয়েছে ঃ

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ-

"ইহুদীগণ তাকে হত্যা করেনি, শূলী বিদ্ধও করেনি ; বরং ব্যাপারটি তাদের কাছে সন্দেহযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। নিশ্চিতভাবেই তারা তাঁকে হত্যা করেনি বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।"

উল্লেখিত আয়াতে চারটি অংশের মধ্যে প্রথম দু'টি অংশের উল্লেখ স্পষ্টভাবে করা হয়েছে। তার একটি হলো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে ইহুদীগণ হত্যা করেনি বা শূলেও চড়ায়নি। বরং বিষয়টি তাদের কাছে সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়টি হলো, "হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।"

www.pathagar.com

কুরআনে যে অংশের স্পষ্ট উল্লেখ নেই

শেষ অংশদ্বয়ের প্রথম অংশ হলো—কিয়ামাতের নিকটবর্তী হয়ে গেলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ অংশ সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে এমন দাবী সম্ভবত মাওলানা মওদূদীর বিরোধীরাও করতে পারবেন না। কেননা, এ সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকার দাবী করার অর্থ হলো কুরআনের এরূপ কোনো আয়াত থাকা যে ঃ

ان المسيح ع ابن مريم سينزل من السماء حينمادنت الساعة فيقتل الدجال الخ

এ ধরনের কোনো আয়াত কুরআনে নেই। "হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে দেহ ও আত্মাসহ আকাশ রাজ্যে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এ উঠিয়ে নেয়া আত্মিক বা মর্যাদার উন্নতি নয়" এখন সর্বশেষ অংশের আলোচনায় আসা যাক। যেসব ভদ্রলোকগণ এ অংশকেও কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে বলে মনে করে এবং তাফহীমুল কুরআনে মাওলানা মওদূদী তা অস্বীকার করে বলে প্রচারণা চালায় তা সম্পূর্ণ ভুল। তাদের এ আপত্তির জবাব নিম্নরূপ।

দ্বিতীয় অভিযোগের জবাব

মাওলানা মওদূদী তাফহীমুল কুরআনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সশরীরে উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কিত কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে একথার অবশ্যই অস্বীকার করেছেন। কুরআনে এ সম্পর্কে শুধু এতটুকু কথা উল্লেখ আছে যে ঃ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ "বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।" দেহ ও আত্মার সামষ্টিক উঠিয়ে নেয়ার প্রমাণ অবশ্যই আছে। অর্থাৎ কুরআনের পূর্বাপর বক্তব্য ও অন্যান্য কারণে بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ উঠিয়ে নেয়ার অর্থ দেহ ও আত্মাসহ উঠিয়ে নেয়া স্বতঃই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কুরআনে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে একথা বলা যায় না। অর্থাৎ কেবলমাত্র কুরআনে উল্লেখিত শব্দ দ্বারা অকাট্যভাবে একথা বলা যায় না যে, কুরআন দেহ ও আত্মাসহ উঠিয়ে নেয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। তবে এর তাৎপর্য কখনো এটাও নয় যে, কুরআনের বক্তব্যে এ অর্থের সম্ভাবনা মোটেই নেই। বরং কুরআনের বাক্যে কতিপয় অর্থের সম্ভাবনা আছে। সম্ভাব্য অর্থের মধ্যে কোনো একটি অর্থকে আমরা বাইরের দলীল ও যুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করতে পারি। যেমন, সশরীরে উঠিয়ে নেয়াকে পূর্বাপর সম্পর্ক মুতাওয়াতের হাদীস, উম্মতের ইজমা দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায়। কিন্তু সেটাকে কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্য কিছুতেই বলতে পারি

www.pathagar.com

না। একজন দৃষ্টিশক্তির অধিকারী লোক—যদিও সে দূরদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত এমন কথা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। কারণ, এ বিষয়ে কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—এ ধরনের দাবী করার অর্থ হলো কুরআনে এমন আয়াত খুঁজে বের করা যা এরূপ ঃ

ان اللّٰه قد رفع المسيح ابن مريم حيًا الى السمآء بجسده العنصرى

অথচ এমন কোনো আয়াত কুরআনে নেই। এমন দাবীই তুলেছেন মাওলানা মওদূদীর প্রতিপক্ষ ভদ্রমহোদয়গণ। সশরীরে উঠিয়ে নেয়া কুরআনের স্পষ্ট উক্তি এমন দাবী করা আমার মতে কুরআন সম্পর্কে দু'টি ভ্রমের সৃষ্টি করে। একটি কুরআনের ওপর এমন অপবাদ দেয়া যা থেকে কুরআন নিসন্দেহে পবিত্র। দ্বিতয়টি, এমন ধৃষ্টতা যা নবীর শাসনামল থেকে অদ্যাবধি কারো মুখে উচ্চারিত হয়নি এবং ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের দুঃসাহস দেখাবে সে আশাও করা যায় না। কেননা সমগ্র কুরআনের কোথাও দেহ ও আত্ম সহ উঠিয়ে নেয়ার স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় না অথবা সেখানে حَيًّا এবং إِلَى السَّمَاءِ শব্দও পাওয়া যায় না। তারপরও বিষয়টির কুরআনে স্পষ্টত উল্লেখ আছে—বলে কিভাবে সহীহ হিসাবে গ্রহণ করা যায় ? এ কারণে কথাটি কুরআনের পরিবর্তে হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত। অথবা কুরআনের বাইরে অন্যান্য দলীল দ্বারা এর ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। কুরআন দ্বারা নয়। অর্থাৎ সশরীরে উঠিয়ে নেয়া অথবা দেহ ও আত্মাসহ আকাশ রাজ্যে উঠিয়ে নেয়ার বিষয়টি কুরআনে স্ববিস্তারে আলোচিত হয়েছে একথা বলা যেতে পারে না। মাওলানা তরজুমানুল কুরআনের রাসায়েলে এক প্রশ্নের জবাবে একথাটিই উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আমরা উক্ত প্রশ্ন ও তার উত্তর উল্লেখ করছি ঃ

একজন প্রশ্নকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে মাওলানা মওদূদীকে এ প্রশ্নটিও করেন ঃ

প্রশ্ন ঃ আকাশে উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কেও আপনি অন্যান্য তাফসীরকারদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন এবং উঠিয়ে নেয়ার অর্থকে অস্পষ্ট করে তুলেছেন। মাওলানা এর জবাবে বলেন ঃ

জবাব ঃ ঈসা আলাইহিস সালামের উত্থান সম্পর্কে আমি শুধু একথা বলেছি যে, কুরআনের ভাষায় (আকাশে উঠিয়ে নেয়া) رَفَعَ إِلَى السَّمَاءِ কথাটি স্পষ্টভাবে নেই। তবে এর অর্থ এ নয় যে, শব্দাবলী এ অর্থের ধারক বাহকও নয়, এটা তাৎপর্য নয়। বরং এর তাৎপর্য হলো কুরআন আকাশে উঠিয়ে নেয়ার সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলেছে একথা কেবলমাত্র শব্দাবলীর উপর ভিত্তি করে অকাট্যভাবে বলা যায় না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে যতটুকু বলেছেন

www.pathagar.com

ততটুকু কথা বলাই যথেষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন। এর বিভিন্ন অর্থের কোনো একটিকে কুরআন বহির্ভূত অন্য প্রমাণ দিয়ে নির্দিষ্ট করা যায়, তবে সেটাকে কুরআনের ব্যাখ্যা ঘোষণা করা যায় না। এ ব্যাপারে অস্পষ্টতা আছে বলে যদি আপনি অভিযোগ করেন তাহলে আমি বলবো যে, এ কাহিনীর অন্য আরো কিছু অংশও অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন শত্রু হাতে বন্দী ছিলেন এবং তারা যখন তাঁকে শূলে বিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো তখন এমন কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো যে, তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পরিবর্তে অন্য একজনকে শূলিবিদ্ধ করে মনে করতে থাকে যে, তারা ঈসা আলাইহিস সালামকেই শূলি বিদ্ধ করেছে। এমন কি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীগণও এ সন্দেহে পতিত হন। شُبِّهَ لَهُمْ আয়াতাংশের কোনো বিস্তারিত স্বরূপ আপনি কুরআনের কোথাও পেয়েছেন কি ? এখন যদি আমরা বাইরের কোনো উপায় অবলম্বন করে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করি তাহলে তা করতে পারি ; কিন্তু একথা বলতে পারি না যে, এভাবে বিস্তারিত বর্ণনা খোদ কুরআনই করছে।

–(তরজুমানুল কুরআন, খণ্ড, ৪৫, সংখ্যা ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫)

প্রশ্নের উপরোক্ত জবাব, তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যামূলক বাক্যাংশ এবং আমাদের পেশকৃত এ বাক্যের বিশ্লেষণ–এসব কিছু আমাদেরকে বলে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সশরীরে উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কে যাকিছু মাওলানা বর্ণনা করেছেন তার সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, কুরআনের শব্দাবলী সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার কেবলমাত্র সম্ভাবনা নয় বরং এরূপ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। একথা প্রমাণ করার জন্যে কুরআনের পূর্বাপর থেকে দলীল-প্রমাণ পেশ করা সম্ভব এবং কুরআন বহির্ভূত দলীল-প্রমাণ যেমন মুতাওয়াতের হাদীস, উম্মতের ইজমা, ক্রমাগত বিশ্বাস ইত্যাদিকে যখন কুরআনের দলীল ও প্রমাণের সাথে মিলানো হয় তখন সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার প্রমাণ অকাট্য ও সন্দেহাতীত হয়ে যায়। অবশ্য কুরআনের কোনো আয়াতে এরূপ স্পষ্ট বক্তব্য নেই যে ঃ

ان اللّٰه قد رفع عيسى ابن مريم حيًّا الى السَّمَاء بجسده۔

এখন এ ব্যাপারেও যদি কারো আপত্তি থাকে তাহলে কুরআন থেকে তার এমন কোনে আয়াত পেশ করা উচিত যার মধ্যে দেহ ও আত্মা শব্দদ্বয়ের এবং আকাশে উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে দেহ ও আত্মা শব্দের প্রমাণ কুরআন থেকে করা যায় এবং মাওলানা মওদূদী তা অস্বীকার করেছেন একথাও প্রমাণ করা যায়। কিন্তু

مقدم ازمحال بنيم چنى مصداق تالى

www.pathagar.com

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম

মাওলানা মওদূদী তরজুমানুল কুরআন এবং তাফহীমুল কুরআনে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে যে গবেষণা করেছেন এবং আমরাই ইতিপূর্বে যার বিস্তারিত আলোচনা উপরে করেছি তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

(ক) ইহুদীগণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করেনি।

(খ) তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলেও চড়ায়নি বরং বিষয়টি তাদের কাছে গোলক ধাঁধাঁর মতো হয়ে গেছে।

(গ) আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে আপন কুদরাতে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। এ তিনটি কথা কুরআনে স্ববিস্তারে উল্লেখ আছে ঃ

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ۔

এখন কথা হলো উঠিয়ে নেয়ার স্বরূপটি কি ছিলো ? এ সম্পর্কে মাওলানার অভিমত হলো, উঠিয়ে নেয়ার সত্যিকার ধরন এবং এর বিস্তারিত আলোচনা কুরআনের শব্দাবলীতে নেই। অবশ্য স্বাক্ষ্য-প্রমাণ এবং কারণসমূহ এমনিভাবে কুরআনের বাচনভংগী ও পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে দেহ ও আত্মাসহ আকাশ রাজ্যে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ আয়াতের মধ্যে (رفع) যে উঠিয়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে তাদ্বারা সশরীরে উঠিয়ে নেয়া ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় উঠিয়ে নেয়া আদৌ হতে পারে না। যদিও কুরআনের শব্দমালা একথার বিশ্লেষক নয় তথাপি মাওলানা একথাটি প্রমাণ করার জন্যে নিম্নবর্ণিত চারটি কারণ দলীল স্বরূপ পেশ করেছেন ঃ

প্রথম দলীল ঃ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে দেহ ও আত্মাসহ আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এ বিশ্বাস ইহুদীগণ প্রথম থেকেই পোষণ করে আসছে। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে ইলাহ বা খোদা ঘোষণা করেছেন। সূরা আন নিসার উক্ত আয়াত তাদের এ ভ্রম বিশ্বাসকে রদ করতে অথবা সংশোধন করতে নাযিল হয়। সশরীরে উত্থানের এ আকীদা যদি সম্পূর্ণ ভুল হতো এবং কোনোক্রমেই সঠিক না হতো তাহলে কুরআন স্পষ্ট ভাষায় এ বাতিল আকীদা নাকচ করে দিতো, بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ বলে উল্টো সহায়তা করতো না। কারণ, নাকচ করার ক্ষেত্রে কোনো ধারণা ও বিশ্বাসকে রদ করতে গিয়ে এমন শব্দ প্রয়োগ করা কুরআনের

www.pathagar.com

মত প্রকাশ্য ও বিস্ময়কর কিতাবের জন্য মোটেই শোভা পায় না যাদ্বারা উল্টো সে ধারণা ও বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়।

দ্বিতীয় দলীল ঃ সশরীরে উত্থান প্রমাণ করার জন্যে মাওলানা মওদূদী তাফহীমুল কুরআনে ২য় দলীল এভাবে পেশ করেছেন ঃ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ এ আয়াতের পরই উল্লেখ হয়েছে وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা খুবই শক্তিশালী এবং মহাজ্ঞানী। বস্তুত এ আয়াতকে এমন প্রসংগের সাথে উল্লেখ করা স্বার্থক হবে যার মধ্যে আল্লাহর অপরাজেয় শক্তি এবং মহাজ্ঞানের অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়। সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার মধ্যেই আল্লাহর অপূর্ব কুদরত ও হেকমাত বিকশিত হতে পারে। অতএব, بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ আয়াতে যে উঠিয়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে তাদ্বারা সশরীরে উঠিয়ে নেয়া ছাড়া অন্য কোনো ধরনের উঠিয়ে নেয়া অর্থ নয়। একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে।

তৃতীয় দলীল ঃ উত্থান দ্বারা যদি সশরীরে উত্থান অর্থ না হতো বরং আত্মার উত্থান বা মর্যাদার উন্নতি হতো তাহলে কুরআনের বাচনভংগী এরূপ হতো না। বরং আত্মাকে উঠিয়ে নেয়ার অবস্থায় নিম্নোক্ত শব্দাবলী অধিক যথার্থ হতো ঃ

> "নিশ্চয়ই তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করেনি বরঞ্চ আল্লাহ তাকে জীবিত বাঁচিয়ে নিয়ে পরে স্বাভাবিক মৃত্যুদান করেছেন।"
>
> মর্যাদার উন্নতির অবস্থায় নিম্নোক্ত শব্দের ব্যবহার অধিক যথার্থ হতো।
>
> "ইহুদীরা তাঁকে অপদস্ত করতে চেয়েছিলো কিন্তু আল্লাহ তাঁকে উঁচু মর্যাদা দান করেছেন।"

উপযুক্ত ও যথার্থ শব্দ পরিত্যাগ করে এমন শব্দাবলী ব্যবহার করা যা বাহ্যত আত্মিক উত্থান অথবা মর্যাদার উন্নতির পরিবর্তে সশরীরে উত্থানই বুঝিয়ে থাকে। এটি এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ যে, এখানে উত্থানের অর্থ সশরীরে উত্থান আত্মিক উত্থান বা মর্যাদার উন্নতি নয়।

চতুর্থ দলীল ঃ মাওলানা মওদূদী কাদিয়ানীদের একটি যুক্তি ও অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে সশরীরে উঠিয়ে নেয়াকে প্রমাণ করার জন্যে তাফহীমুল কুরআনে যে বাক্য লিখেছেন সেটা চতুর্থ দলীলরূপে প্রতীয়মান হয়। দলীলটি হলো اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ। আয়াতের توفى শব্দের অর্থ হলো দেহ ও আত্মার কবজ করা যা সূরা আন নিসার رفع শব্দের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আত্মা ও দেহের কবজ অর্থাৎ সশরীরে উত্থান লাভের ব্যাপারটি গোটা মানব জাতির ইতিহাসে একবার মাত্র সংঘটিত হয়েছে [অর্থাৎ হযরত ঈসার (আ) ব্যাপারে]

www.pathagar.com

অন্য কারো ব্যাপারে আদৌ সংঘটিত হয়নি। আরবী অভিধানে توفى শব্দটির প্রয়োগ দেহ ও আত্মার কবজ অর্থাৎ সশরীরে উত্থানের ক্ষেত্রেও ব্যবহারের অবকাশ আছে। অতএব, কি দেহ ও আত্মার কবজ (সশরীরে উত্থান লাভ) করার অর্থে আর কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে কাদিয়ানীদের এ প্রশ্ন করা এবং উদাহরণ চাওয়া একান্তই অর্থহীন। কেননা, এর উদাহরণ কেবল তখনই দেয়া সম্ভব হতো যদি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ছাড়াও অন্য কোনো ব্যক্তিকে দেহ ও আত্মাসহ আকাশে উঠিয়ে নেয়া হতো। অথচ অন্য কারো ব্যাপারে এমনটি হয়নি।

সশরীরে উত্থান লাভের ব্যাপারটি প্রমাণ করার জন্য মাওলানা মওদূদী কুরআন থেকেই এ চারটি দলীল তাফহীমুল কুরআনে পেশ করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে নিসন্দেহে বলা যায় যে, بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ আয়াত দ্বারা মাওলানা যা বুঝাতে চান তা সশরীরে উঠিয়ে নেয়া অন্য কোনো ধরনের উঠিয়ে নেয়া নয়।

কিন্তু যেহেতু দেহ ও আত্মা শব্দের কোনো স্পষ্ট উল্লেখ কুরআনে নেই এবং উঠিয়ে নেয়ার স্বরূপও সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়নি, সুতরাং মাওলানা আলোচনার শেষভাগে একথাও লিখেছেন যে, সশরীরে উত্থান লাভের বিষয়টি সরাসরি কুরআনের শব্দ থেকে প্রমাণিত একথা বলা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে এমন কোনো বস্তুর সম্পর্ক কুরআনের দিকে না করতে হয় যা কুরআনে মূলত নেই।

তাফহীম লিখকের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা

নিজের অবস্থান ও দাবীকে আরো স্পষ্ট করার অভিপ্রায়ে মাওলানা তাফহীমুল কুরআনের ১ম খণ্ডে সূরা আন নিসার টীকার শেষাংশে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে কুরআনের স্পিটের সাথে যে 'কর্মপদ্ধতি অধিক সামঞ্জস্যশীল' কথাটির স্থলে লিখেছেন ঃ "তারপর সশরীরে উত্থান লাভের বিশ্বাসটি সেসব হাদীস দ্বারা সুদৃঢ় হয় তার মধ্যে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আগে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় আগমন এবং দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করা বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে (সূরা আহযাবের তাফসীরের পরিশিষ্টে আমি সেসব হাদীস উল্লেখ করেছি)। এতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় বার আগমন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। এবার প্রত্যেকে স্বতঃই চিন্তা করতে পারবে যে, তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আগমন করা অধিক যুক্তিসংগত নাকি আল্লাহর রাজ্যের কোথাও জীবিত থেকে তারপর ফিরে আসা ?"

www.pathagar.com

সশরীরে উত্থান লাভের ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর এই হলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এ বিশদ বিশ্লেষণের আলোকে মাওলানা মওদূদী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সশরীরে উত্থান লাভের অস্বীকারকারী অথবা এ ব্যাপারে তিনি আহলে সুন্নাতের সাধারণ আকীদা থেকে আলাদা আকীদা কিংবা মত নিজের জন্যে তৈরি করে নিয়েছেন এমন কথা কোনো আলেম কেন কোনো আল্লাহভীরু সাধারণ লোকও বলার সাহস করে না। কেননা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে প্রথম থেকেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে যে বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে তাহলো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আকাশ রাজ্যে দেহ ও আত্মাসহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ইহুদীগণ তাকে হত্যা করেনি শূলেও চড়ায়নি। যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হবে তখন তিনি আকাশ থেকে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং ভূপৃষ্ঠে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লামের একজন প্রতিনিধিরূপে ইসলামী শরীয়াতকে জীবন বিধান হিসেবে চালু করবেন এবং সমকালীন সমস্ত ফিতনা ফাসাদের মূলোৎপাটন করবেন, মাওলানা মওদূদী এসব কথার একজন শক্তিশালী প্রবক্তা।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
সমালোচনা এবং সত্যের মাপকাঠি

ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ সম্মানিত সাহাবীগণ কি গোটা মুসলিম সমাজের জন্যে সত্যের মাপকাঠি এবং সব ধরনের সমালোচনার উর্ধে অথবা সাহাবীগণ সমগ্র উম্মতের জন্যে কেবল মাত্র আল্লাহর কিতাব ও রসূলের হাদীসই সত্যের মানদণ্ড এবং সম্মানিত সাহাবীগণ সমালোচনার উর্ধে নন—এ বিষয়টি বিতর্কিত বিষয়সমূহের অন্যতম। বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে জামায়াতে ইসলামীর সংবিধানের ৬নং ধারা থেকে। উক্ত ধারায় লেখা আছে ঃ

> "আল্লাহর রসূল ছাড়া অন্য কোনো মানুষকে সত্যের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করবে না এবং কাউকে সমালোচনার উর্ধে মনে করবে না।"

"একথাটাকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো ইলমী মহল থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এ ধারায় যে ভাষা বা শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে তাতে সম্মানিত সাহাবীগণও শামিল হয়ে যায়। কেননা, তাঁরাও রসূল ছাড়া অন্য যেসব মানুষ আছে তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে এ ধারা অনুসারে সাহাবীগণও সমালোচনার পাত্র হয়ে যান অথচ হাদীসসমূহের আলোকে সাহাবীদের সমালোচনা করা জায়েয় নয়। বরং তাঁরা গোটা উম্মতের জন্যে সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড হওয়ার মর্যাদা সম্পন্ন। এটা সমগ্র আহলে সুন্নাতের ইজমা ভিত্তিক একটি আকীদা। সুতরাং উপরোক্ত ধারা আহলে সুন্নাতের সম্মিলিত আকীদার খেলাফ হওয়াতে সংবিধান প্রণেতাগণও আহলে সুন্নাত দলের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তা থেকে খারিজ।"

'তানকীদ' বা সমালোচনার ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আহলে ইলম পণ্ডিত ব্যক্তিদের সন্দেহাতীত আকীদা তাই যা ৬নং ধারা এবং অন্যান্য লেখায় মাওলানা সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন এবং এ আকীদার ওপর তারা সুদৃঢ়ও আছেন। আর সে আকীদা হলো —নবীগণ ছাড়া কোনো মানুষ সত্য ন্যায়ের মাপকাঠি হতে পারে না এবং মানুষ সমালোচনার উর্ধে একথাও বলা যায় না। তাই মানুষটি সাহাবীদের দলভুক্ত হোক কিংবা অন্য যে কোনো আহলে ইলম, ইমাম বা বুযর্গের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক তাদের সকলের সমালোচনা করা যাবে ও তাদের কেউ সমালোচনার উর্ধে নয় এবং অপরের জন্যে সত্যের মাপকাঠিও নয়।

অপরদিকে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী বিরোধী বর্তমান যুগের কতিপয় আকীদা হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লামের সমস্ত

www.pathagar.com

সাহাবা সর্ববিধ সমালোচনার উর্ধে এবং তাঁরা গোটা উম্মতের সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড। তাঁদের এবং তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্তের কোনো সমালোচনা করা জায়েয নয়। যে কেউ তাদের ধরনের সমালোচনা করে আহলে সুন্নাতের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে বাতিল ফিরকার সাথে তার সম্পর্কযুক্ত হয় এ ধরনের বিষয় মৌলিক বিষয়সমূহের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান।

বিতর্কিত বিষয় ঃ সাহাবীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত না ব্যক্তিগত উক্তিসমূহ

উভয় দলের মধ্যে বিতর্কিত বিষয়টি কি তা ব্যাখ্যার দাবী রাখে ? বিতর্কিত বিষয়। কি সম্মানিত সাহাবীদের সম্মিলিত ফায়সালা না তাঁদের ব্যক্তিগত উক্তি এবং ইজতিহাদী অভিমত ? এ বিষয় সম্পর্কিত উভয় দলের বক্তব্য এবং লেখালেখি যতটুকু আমরা পাঠ করেছি তাতে আমরা নির্দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে, সাহাবীগণ যে সিদ্ধান্তের ওপর ঐকমত্য হয়েছেন সেসব সিদ্ধান্ত উভয় দলের কারো বিতর্কিত বিষয় কখনো নয়। এ ধরনের সম্মিলিত ফায়সালা উম্মতের জন্যে হুজ্জত (দলীল) এবং তা সমালোচনারও উর্ধে—এ বিষয়ে উভয় দল ঐকমত্য পোষণ করেন। সাহাবীগণের ব্যক্তিগত উক্তি এবং ইজতিহাদী অভিমতই হলো উভয় দলের বিতর্কের বিষয়বস্তু। এক দলের মতে এগুলোও সমালোচনার উর্ধে। আরেক দলের দাবী, এ ধরনের উক্তি ও অভিমত সমালোচনার যোগ্য। সুতরাং প্রথমে কুরআন হাদীসের আলোকে বিষয়টির শরয়ী মর্যাদা স্পষ্ট হওয়া জরুরী। তারপর দলীলের ভিত্তিতে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হবে যে, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষের রায় অধিকতর সঠিক আর কোন্ দলের রায় ভ্রান্তিপূর্ণ।

'তান্‌কীদ' শব্দের অর্থ

প্রচলিত আরবী বাকরীতিতে 'তান্‌কীদ' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'নকদ' থেকে। অভিধানে 'নকদ ইনতিকাদ এবং তানাক্কুদ শব্দগুলো প্রায় সমার্থক। অর্থাৎ কোনো বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার পর বস্তুটির ভালো-মন্দ, ভেজাল-নির্ভেজাল হওয়ার মধ্যে পার্থক্য করা। ভেজাল ও নির্ভেজালের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করার কাজকে তান্‌কীদ, তানাক্কুদ ও ইনতেকাদ বলে ; যদিও অভিধানে এছাড়া শব্দটির অন্যান্য অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে।

কামুসে শব্দটির যেসব অর্থের কথা উল্লেখ আছে উপরোল্লেখিত অর্থগুলোও তন্মধ্যে শামিল। প্রথম চতুর্থাংশের ২১১ পৃষ্ঠায় د (দাল) অধ্যায় ن (নূন) পরিচ্ছেদে আছে ঃ

النقد تميز الدراهم وغيرها كالتنقاد والانتقاد

www.pathagar.com

"অর্থাৎ 'নকদ' এর অর্থ 'তান্‌কাদ' ও 'ইনতিকাদ' এর মতো ভালো ও অচল মুদ্রার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা। আল মুনজিদে আছে نقد الدراهم وغيرها ميزها ونظرها يعرف جيدها من رديها নকদে দারাহেম এর অর্থ হলো চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে ভেজাল নির্ভেজাল চিনে একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করা। انتقد الدارهم اخرج الزيف منها ইনতিকাদে দারাহেম এর অর্থ হলো ভেজালগুলো নির্ভেজাল থেকে বেছে বের করা। ناقد الدارهم ميزها واخرج الزيف منها তানাকুদুদ দারাহেম এর অর্থ ইনতিকাদের মত খাঁটি ও ভেজালের মধ্যে পার্থক্য করা এবং মুদ্রা থেকে ভেজাল বস্তু বের করে দেয়া। تنقد الدارهم وغيرها بمعنى نقدها তানাকুদুদ দারাহেম এর অর্থ নকদ এর অনুরূপই।

এ পরিভাষার পরিপ্রেক্ষিতেই তানকীদ শব্দ উর্দু ভাষায় যাঁচাই বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। আরবী অভিধানে অর্থ বর্ণনা করার জন্যে উর্দু ভাষায় যতো কিতাব লেখা হয়েছে তার প্রায় সবগুলোতেই নকদ, ইনতিকাদ এবং তানাকুদ এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে যাছাই-বাছাই এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

কিন্তু এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, আরবী পরিভাষায় এ শব্দগুলো দোষ-ত্রুটি চর্চা এবং গুণ ও সৌন্দর্যের বিকাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল মুনজিদে আছে ঃ

نقد الكلام ظهر مابه من العيوب والحاسن اتنقد الشعر على قائله۔
اظهر عيبه انتقد الكلام اظهر عيوبه ومحاسنه۔

আল্লামা ইবনে আসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নেহায়ায় লিখেছেন ঃ

وفى حديث ابى الدرداء ان نقدتا الناس نقدوك۔ اى ان عبتهم واغتبتهم عابوك بمثله اهـ

এ পরিভাষার দৃষ্টিতে তানকাদ শব্দের অর্থ দোষ চর্চা করার অবকাশ পাওয়া যাঁয় উর্দু ভাষায় তানকীদ শব্দ এ অর্থে ব্যবহার হোক বা না হোক তবে আসল শব্দে দোষ চর্চার অর্থ করার সুযোগ অবশ্যই পাওয়া যায়। যেমন উপরে আরবী পরিভাষায় একথা প্রকাশ পেয়েছে। তারপর আমরা নিম্নে তানকীদের শরয়ী মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করবো যাতে শরীয়াতের দৃষ্টিতে এর মূল্যায়ন সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

www.pathagar.com

তানকীদ-এর শরয়ী মর্যাদা

তানকীদ-এর উপরোল্লেখিত দু'টি অর্থের শেষার্থ হলো দোষ-ক্রটির অন্বেষণ করা। কুরআন হাদীসের আলোকে এর শরয়ী নির্দেশনা হলো এ অর্থে একজন নিম্নশ্রেণীর মু'মিনেরও এরূপ তানকীদ জায়েয নয়। তবে এ ধরনের তানকীদ না করার কারণে কোনো বৃহৎ কল্যাণ ব্যহত হওয়ার আশংকা থাকলে সে ক্ষেত্রে দীনের খাতিরে তানকীদ করা যায়। যেমন হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ রাবীদের দোষ-ক্রটি খুঁজে বের করেছেন দীনের বৃহত্তম স্বার্থের খাতিরে। এরূপ তানকীদ করাকে পরিভাষায় আল জারাহ্ ওয়াল আল তাদীল বলা হয়। আরো কতিপয় অবস্থায় বৃহৎ কোনো উদ্দেশ্য লাভের জন্যে ফকীহগণ তানকীদ জায়েয বলেছেন। এ কয়েকটি নির্দিষ্ট অবস্থা ছাড়া কোনো মু'মিনের এ ধরনের তানকীদ যখন জায়েয নেই, যদিও সে নিম্নতম শ্রেণীর মু'মিন হোক। এমতাবস্থায় সম্মানিত সাহাবা অথবা অপরাপর ইমাম ও বুযর্গের তানকীদ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে ? অথচ দীনের ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সমগ্র উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম ও ইমামদের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য অন্য আর কোনো উপায়-উপকরণ নেই। তাঁরাও যদি এ ধরনের তানকীদ করার উর্ধে না থাকে তাহলে দীনের ব্যাপারে আর কার উপর ভরসা করা যাবে। এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উম্মত পর্যন্ত দীন পৌঁছানোর জন্য নির্ভরযোগ্য উৎস আর কি হতে পারে ? এ কারণে সম্মানিত সাহাবীগণ অথবা সলফে সালেহীনগণ দোষ চর্চা অর্থে তানকীদের পাত্র হতে পারে না। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট এবং নিশ্চিত ফায়সালা হলো এ ধরনের তানকীদ যা অপরের দোষ অন্বেষণ করা এবং চরবৃত্তি করা সম্পূর্ণ হারাম। এতে একজন মু'মিনকে অকারণে বেইজ্জতি করা হয় যা শরীয়াতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এটা গীবতও যা মৃত মুসলমান ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমার্থকও বটে। আল্লাহর ঘোষণা ঃ

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا - اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ - (الحجرات)

"একে অপরের দোষ তালাশ করো না। একে অপেরর নিন্দা করো না। আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে তোমাদের মধ্যে কেউ পসন্দ করবে কি? এমন কাজ তোমাদের অপসন্দনীয়।"

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لاتتبعوا عورات المسلمين فانه من يتبع عورات المسلمين يفضحه الله ولو فى جوف بيته -

"মুসলমানদের গোপন দোষ তালাশ করো না। যে কেউ মুসলমানদের গোপন দোষ খুঁজে বেড়ায় আল্লাহ তাকে বে-ইজ্জতি করবেন যদিও সে নিজের ঘরেই অবস্থান করে।"

জীবনের শেষ লগ্নে বিদায়ী হজ্জের খুতবায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মান-সম্মান সম্পর্কে এ হেদায়াত ও উপদেশ প্রদান করেন ঃ

ان دماء كم واموالكم واعراضكم عليكم حرام-

"অপরের জান ও মাল তোমাদের জন্যে হারাম এবং অপরের বে-ইজ্জতী করাও হারাম।"

দোষ চর্চা ও পরনিন্দা অর্থে যে তানকীদ তার শরয়ী মর্যাদা ও মূল্যায়ন হলো উপরোল্লেখিত নির্দেশনা। পরখ করা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অর্থে যে তানকীদ ব্যবহৃত হয় তা শরয়ী মর্যাদা জানার জন্যে নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি ঃ

তানকীদের দ্বিতীয় অর্থ পরখ করা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। একথার সারমর্ম হলো কোনো কথা এবং সিদ্ধান্তকে কিংবা রায় ও কাজকে কুরআন ও হাদীসের আইনের নিরিখে এবং গ্রহণ-বর্জনের শরয়ী নিক্তিতে যাঁচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। এভাবে পরখ করার পর দেখতে হবে বিষয়টি গ্রহণযোগ্য কি বর্জনযোগ্য যেসব কথা ও কাজ সত্য ও সনাতন হওয়ার ব্যাপারে অনির্দিষ্ট, ভুল-নির্ভুল এবং সঠিক-বেঠিক উভয় হওয়ার সম্ভাবনাময় এমন প্রত্যেকটি কাজ ও কথা শরীয়াতের দৃষ্টিতে বর্জন করা যায়। আর যেসব কাজ ও কথা সত্য ও সনাতন হওয়া সুনির্দিষ্ট, এর সঠিকতা একেবারে নিশ্চিত এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মোটেই নেই এমন প্রত্যেকটি কাজ ও কথা তানকীদের উপযোগী নয়। এ ধরনের কথা ও কাজ সত্যের মানদণ্ড এবং তানকীদের উর্ধে।

এ মানদণ্ড সামনে রেখে কাদের কথা ও কাজের তানকীদ করা জায়েয আর কাদের কথা ও কাজ এ ধরনের পরখ করার উর্ধে সে সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের আলোকে জানতে চাইলে আমাদের সামনে এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধুমাত্র আল্লাহর নবীগণ এ ধরনের তানকীদের উর্ধে। তাঁরা ছাড়া উম্মতের সমস্ত লোকের ব্যক্তিগত কথা কখনো পরখের উর্ধে নয় বরং যাঁচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উপযোগী। এ প্রেক্ষাপটে সত্যের মাপকাঠি কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতই হতে পারে। কুরআন ও হাদীস ছাড়া কারো ব্যক্তিগত উক্তি অথবা ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত কখনোই সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না। বরং কুরআন ও হাদীসের মানদণ্ডে পরখ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার

www.pathagar.com

পর উক্তি বা সিদ্ধান্তটি কুরআন হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা তা দেখতে হবে। যদি সামঞ্জস্যশীল হয় তাহলে তদনুযায়ী কার্য করা হবে আর সামঞ্জস্যশীল না হলে পরিহার করতে হবে।

এর প্রকৃত কারণ হলো সত্যের মানদণ্ড প্রকৃতপক্ষে এমন বস্তুকে বলা হয় যার সাথে কথা ও কাজের সামঞ্জস্যশীলতা হক ও সত্য হওয়ার নিদর্শন এবং অসাদৃশ্যতা বাতিল হওয়ার পরিচয় বহন করে। আর এটা সে বস্তুই হতে পারে যা নিশ্চিতভাবে সত্য ও সনাতন এবং বাতিল হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা নেই। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ বস্তু একদিকে আল্লাহর কিতাব অন্যদিকে রসূলের হাদীসই হতে পারে। সুতরাং সত্যের মানদণ্ড হিসেবে কেবলমাত্র এ দু'টোকেই গ্রহণ করা হবে।

এবার রয়ে গেলো উম্মতের ব্যক্তিগত উক্তি এবং ইজতিহাদী ফায়সালা প্রসংগ। উক্তি ও ফায়সালা দানকারী যতোবড় বুযর্গ হোক কিংবা মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোক না কেন তাঁর উক্তি বা উদ্ভাসিত সিদ্ধান্ত ভুল থেকে নিরাপদ তো নয়ই, অধিকন্তু কথার বা ফায়সালার সঠিকতা নিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট নয়। সুতরাং একথা বা সিদ্ধান্তকে কুরআন হাদীসের মত সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ডরূপে ঘোষণা করা যায় না অথবা তানকীদ তথা পরখ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঊর্ধে মনে করা যায় না। বরঞ্চ অনিবার্যরূপে কুরআন ও হাদীসের মানদণ্ডে যাঁচাই করে শরীয়াতের নিরিখে পরখ করে দেখতে হবে সেটা প্রকৃত মানদণ্ডের সাথে পূর্ণ করা সামঞ্জস্যশীল কিনা। কেননা নবীগণ ছাড়া উম্মতের আর কেউ মাসুম নয়। নিষ্পাপ নিষ্কলুষতা নবীদের বিশেষ গুণ যার সাথে অন্য কোনো মানুষই শরীক নয়। নবীদের অভিমত, উক্তি, ফায়সালা এবং কাজ অহীয়ে ইলাহীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে সত্য সঠিক। এখানে ভুলের লেশমাত্র নেই এবং ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনাও নেই একেবারে। সুতরাং কুরআন ও হাদীস সব ধরনের তানকীদ থেকে মুক্ত এবং গোটা উম্মতে মুহাম্মদীর জীবনের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

উপরে যাকিছু পেশ করা হলো, তার স্বপক্ষে কুরআন-হাদীসের নিম্নবর্ণিত দলীলগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা দরকার যাতে নবী ও অ-নবীর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্ণিত হয় এবং নবী নয় এমন লোককে নবী ও রসূলের সাথে শরীক না করা হয়।

কুরআনের দৃষ্টিতে তানকীদ

তানকীদ পরখ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে আমাদের প্রতি কুরআনের সুস্পষ্ট শিক্ষা হলো নবী ও রসূলদের ব্যক্তিসত্ত্বা সব ধরনের তানকীদ থেকে

www.pathagar.com

পবিত্র ও উর্ধে। রসূল হওয়ার কারণে তাঁদের মর্যাদাই এরূপ নয় যে, তাঁদের নির্দেশাবলী ও ফায়সালাসমূহ অন্য কোনো মাপকাঠিতে পরখ ও যাঁচাই-বাছাই করে গ্রহণ অথবা বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। অসম্ভব ! বরঞ্চ নবী ও রসূলগণ বিরাট পদমর্যাদায় সমাসীন হওয়ার কারণে তাদের প্রত্যেকটি হুকুম ও ফায়সালা গোটা উম্মতের জন্যে সর্বাবস্থায় সর্বযুগে কোনো রকম দ্বিধা-সংকোচ ব্যতিরেকে সৃষ্টির লয় পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় সংবিধান এবং চিরন্তন নির্দেশ হিসাবে অবশ্য পালনীয়। কোনো বিষয়কে রসূলের হুকুম ও সিদ্ধান্ত হিসেবে একবার মাত্র জানা গেলে তার তানকীদ তো দূরের কথা সেদিকে তানকীদের দৃষ্টি পর্যন্ত দেয়া যাবে না। আর যদি সে দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে ঈমান থাকবে না। কোনো মু'মিন তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি রসূলের পবিত্র সত্তাকে একমাত্র হুকুমদাতা ও বিচারক হিসাবে গ্রহণ না করে এবং সর্বাবস্থায় রসূলের অনুসরণ করাকে মুক্তির উপায় মনে না করে অথবা রসূলের আনুগত্য সম্পর্কে হীনমন্যতা অনুভব করে তাহলে ঈমান নামীয় সম্পদই তার থাকতে পারে না। এ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা হলো ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -(النساء)

"তোমার রবের শপথ ! তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না। যতোক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহ তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে নিবে। তারপর তুমি যে সিদ্ধান্ত দিবে তা তারা অকপটে বিনা দ্বিধায় মেনে নিবে এবং সে ফায়সালার সম্মুখে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিবে।"

আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় এ সত্যটি প্রকাশ করা হয়েছে যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে রসূলের মর্যাদা এতো উঁচু যে, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তাঁকে অনুসরণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানী সম্পদ লাভ করা সম্ভব না। এমন উঁচু মর্যাদা ও সর্বোচ্চ পদে সমাসীন হওয়া সত্ত্বেও নবীর পবিত্র সত্তার তানকীদ জায়েয হওয়ার চিন্তাও করা যায় কি ? এমন ধরনের চিন্তা করলে ঈমান অবশিষ্ট থাকবে কি ? না, কখনো নয়।

কুরআন এ সত্যকেও উদ্ঘাটন করে দিয়েছে যে, রসূলের পবিত্র সত্তা তাদের জন্যে আদর্শ যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে দেখা করতে চায়। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র জীবনের কাজে ও বিশ্বাসে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রসূলকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

www.pathagar.com

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ -(الممتحنه : ١)

"নিশ্চয়ই রসূলের পবিত্র সত্তা ঐসব লোকদের জন্য সুন্দর আদর্শ যারা আল্লাহর সাথে মিলিত হতে আশা করে এবং আখেরাতের আশা পোষণ করে।"–(সূরা মুমতাহিনা ঃ ১)

অর্থাৎ যারা কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার ইচ্ছা করে তারা রসূলের পবিত্র সত্তাকে স্বীয় জীবনে নিজের জন্যে আমল করার উদাহরণ বানিয়ে তার অনুসরণ করা উচিত।

সর্বাবস্থায় রসূলের অনুসরণ অপরিহার্য

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ -

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দেন তখন নিজের ইচ্ছায় সে ফায়সালার খেলাফ করা কোনো ঈমানদার নর-নারীর কাজ হওয়া উচিত নয়।"

অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূল যখন কোনো ব্যাপারে স্বীয় নির্দেশ ও ফায়সালা দিয়ে দেন তখন সে নির্দেশের সামনে প্রতিটি মুসলমানের মস্তক অবনত হওয়া জরুরী। হুকুম বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে ইচ্ছা করলে গ্রহণ করবে কিংবা বর্জন করবে এমন স্বাধীনতা কোনো ঈমানদার নর-নারীর থাকতে পারে না। বরঞ্চ সর্বাবস্থায় হুকুমের বাস্তবায়ন অপরিহার্য। মানা-নামানা এবং করা-না করার স্বাধীনতা আদৌ অবশিষ্ট থাকবে না। রসূলের পবিত্র সত্তা সব ধরনের তানকীদ থেকে মুক্ত পবিত্র এবং একমাত্র সত্য ও ন্যায়ের তুলাদণ্ড। এ সত্য কুরআনের আলোকে দীপ্ত ও উজ্জ্বল।

তবে কথা হলো উম্মতের ব্যক্তিগত অভিমত ও রায় নিয়ে উম্মত ব্যক্তিগত-ভাবে সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না এবং তারা তানকীদ করারও উর্ধে নয়। তাদের প্রকৃত ও মৌলিক মর্যাদা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

উম্মতের স্থান

নবী ও রাসূলগণের স্থান এবং উম্মতের স্থানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা নবীদেরকে যে মর্যাদা দান করেছেন উম্মতদেরকে কখনো সে

www.pathagar.com

মর্যাদা দেননি। এ ব্যাপারে কুরআন আমাদেরকে এভাবে দিকদর্শন দিচ্ছে যে, উম্মত যতো বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্নই হোক না কেন, তার ব্যক্তিগত কথা এবং ইজতিহাদী অভিমত নবীদের কথা ও কাজের মতো কখনো সর্বাবস্থায় দলীল এবং অবশ্য পালনীয় হওয়ার মর্যাদা সম্পন্ন নয়। তাদের কথা ও ইজতিহাদী ফায়সালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেয়া শরীয়াত মুতাবিক কিনা, কুরআন ও হাদীসের নিক্তিতে পরিপূর্ণভাবে পরীক্ষিত কিনা তা দেখা ও চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজনীয়তা থাকে। উম্মতের ব্যক্তিগত প্রকৃত মর্যাদা হলো তাদের ব্যক্তিগত উক্তি এবং গবেষণালব্ধ অভিমতকে কুরআন ও হাদীসের নিক্তিতেই যাঁচাই-বাছাই ও পরখ করতে হবে। যেসব কথা ও ফায়সালা শরীয়াতের মানদণ্ডে না টিকবে এবং কুরআন হাদীসের প্রতিকূলে হবে সেগুলো বর্জন করতে হবে।

মোটকথা নবী ও রসূলগণ ছাড়া উম্মতগণ নিজেরাই সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড নয় এবং তাদের কথা ও ফাসয়ালাসমূহ ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে দলীল ও অবশ্য পালনীয় হতে পারে না। কথা ও ফায়সালাসমূহ দলীল ও অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্যতা কুরআন হাদীসের মানদণ্ডে পরখ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে। এমতাবস্থায় যদি তা কুরআন হাদীসের সাথে অনুকুল হয় তবে দলীল ও অনুকরণীয় হবে অন্যথায় পরিত্যাজ্য বলে বুঝতে হবে। জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ৬নং ধারার এটিই তাৎপর্য যে—"আল্লাহর রসূল ছাড়া অন্য কাউকে সত্যের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করবে না এবং কাউকে তানকীদ থেকেও মুক্ত মনে করবে না।"

উপরের দাবীর সমর্থনে নিম্নেবর্ণিত দলীলগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ

কুরআন ও হাদীস একমাত্র মানদণ্ড হওয়ার প্রথম দলীল

এ দাবী প্রমাণ করার জন্যে কুরআনের প্রথম দলীল হলো, আল্লাহর রসূলের পর উম্মতের মধ্যে যাদের অনুসরণ ফরজ ও অপরিহার্য করা হয়েছে তারা হলো মুসলমান নেতৃবৃন্দ। জায়েয কাজে তাদেরকে মান্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ-

"আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যিনি আমীর তাঁরও আনুগত্য করো।"

এ সত্য সন্দেহাতীত যে, আয়াতের প্রধান সম্বোধিত লোক হচ্ছেন স্বয়ং সম্মানিত সাহাবীগণ এবং তাদের মধ্যস্থতায় গোটা উম্মতের অবশিষ্ট লোকগণও।

www.pathagar.com

তাদের সকলের জন্যে হুকুম হলো আল্লাহ্ ও রসূলের পর নিজেদের নেতার আনুগত্য কর।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি কুরআনের দৃষ্টিতে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম এবং উলুল আমর বা নেতাদের উভয়কেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে মতপার্থক্য করার অধিকার দেয়া হয়েছে। উলুল আমর বা নেতাগণ যেমন একে অপরের সাথে মতবিরোধ করতে পারে ; তেমনি সাধারণ সাহাবীগণও একে অপরের সাথে মতপার্থক্য করার অধিকার রাখে।

একইভাবে কুরআন থেকে একথাও জানা যায় যে, বিতর্কিত বিষয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা দিবে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের হাদীস। সমস্ত সাহাবা অথবা নেতৃবৃন্দ যেই হোক না কেন সকলকে কুরআন ও হাদীসেরই দ্বারস্থ হতে হবে। পারস্পরিক মতপার্থক্যের সময় প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের ওপর দৃঢ় থাকার অনুমতি নেতৃবৃন্দেরও নেই এবং নেতাদের সাথে মতবিরোধ ঘটলে আপন মতের ওপর অবিচল থাকার অধিকার সাহাবীদেরও নেই। বরং সকলেই ফায়সালার জন্যে কুরআন ও হাদীসের স্মরণাপন্ন হতে হবে। আল্লাহর ঘোষণা ঃ

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ـ(النساء)

"কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হলে তা আল্লাহ্ (কুরআন) ও রসূলের (হাদীস) কাছে ফিরিয়ে দাও—যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান রাখো। এ কাজ উত্তম এবং পরিণামের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা ভালো।"

এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে উলুল আমর ও সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে মতপার্থক্য করার অধিকার যখন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলো এবং মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার সময় প্রত্যেককে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের হাদীসের স্মরণাপন্ন হতে নির্দেশ দেয়া হলো তখন জানা গেলো যে, কেউ সত্যের মানদণ্ড নয়। কারো ব্যক্তিগত কথা এবং ইজতিহাদী ফায়সালা তানকীদ থেকে মুক্ত নয়। অন্যথায় প্রথমত একে অপরের সাথে মতপার্থক্য করার অধিকারই থাকতো না; আর সবাই তাদের কথা মানতে বাধ্য হতেন। অথবা অন্তত পারস্পরিক মতবিরোধের সময় নিজ নিজ রায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ প্রত্যেকের জন্যে থাকতো। কেননা, সকলেই তো সত্যের মানদণ্ড। অথবা পুনরায় তৃতীয় পর্যায়ে সাহাবীদের পর আগত লোকদের ওপর এ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হতো যে, সাহাবা অথবা তাঁদের নেতাদের সাথে মতবিরোধ করার অধিকার

তোমাদের নেই। কারণ, তাঁরা তোমাদের জন্যে ন্যায়ের মানদণ্ড এবং তোমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাঁচাই-বাছাই থেকে তারা উর্ধে।

কিন্তু আয়াতে এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। বরং সকলকে সমভাবে মতবিরোধ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। মতবিরোধের সময় সকলের জন্যে শেষ আশ্রয়স্থল ও চূড়ান্ত ফায়সালাকারী হিসেবে ঘোষিত হবে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত। এতে স্পষ্টত প্রতিভাত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে ন্যায়ের মানদণ্ড এবং সব ধরনের তানকীদ থেকে মুক্ত শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের হাদীস ; সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের ইজতিহাদী ফায়সালা নয়। যারা রসূলুল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড মনে করে না এবং তানকীদ থেকেও মুক্তভাবে না তাদের জন্যে উপরোক্ত আয়াত একটি মযুবত ও সুদৃঢ় দলীল।

দ্বিতীয় দলীল

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হযরত খিযির আলাইহিস সালাম এ দু'জন মহান ব্যক্তিত্বের একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম একাধারে শরীয়াত বাহক উলুল্ আযম ও উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন পয়গাম্বর ছিলেন। আবার অন্যদিকে তিনি 'কলিমুল্লাহ' খেতাবেও ভূষিত ছিলেন। তাঁর ওপরই তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছিলো। তাঁর সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيمًا "আল্লাহ তায়ালা মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কর্থা বলেছেন।" হযরত খিযির আলাইহিস সালাম এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি সারা বিশ্বের রহস্যময় ঘটনাবলীর গোপন তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত। আল্লাহ তাঁকে একটি বিশেষ ইল্‌ম দান করেছেন ঃ وَاٰتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا "আমি তাঁকে নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ ইলম দান করেছি।" কুরআনে এ দু'জন সম্মানিত ব্যক্তিত্বের ঘটনা যে ঢংয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে এর যে বিশ্লেষণ এসেছে তাতে নিসন্দেহে সত্য উদঘাটিত হয় যে, হযরত খিযির আলাইহিস সালামকে যে ইলম দান করা হয়েছিলো সে ইলম হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দান করা হয়নি। বরং এ বিদ্যায় হযরত খিযির আলাইহিস সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম থেকে অধিক পারদর্শী ছিলেন। রেওয়ায়েতেও একথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে ঃ بلى ان لى عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি হযরত খিযির আলাইহিস সালামের মত মস্তবড় অভিজ্ঞ ব্যক্তির তিনটি কাজের প্রকাশ্য সমালোচনা করেছেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। কেননা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের আনীত শরীয়াতের দৃষ্টিতে এসব কাজ জায়েয হওয়ার কোনোই বাহ্যিক সুযোগ ছিলো না। এমনকি তিনি সাথী

www.pathagar.com

হওয়ার চুক্তিপত্র ভংগ করলেন তবুও তানকীদ করা পরিত্যাগ করলেন না। হযরত খিযির আলাইহিস সালামের যে তিনটি কাজের সমালোচনা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম করেছিলেন তা সূরা কাহাফে বিশদভাবে বলা হয়েছে। ইচ্ছা করলে দেখে নেয়া যেতে পারে।

এ ঘটনায় আরো যে কয়টি যুক্তি আছে তাতে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় কথা স্থিরকৃত হয়। একথাগুলো স্থান, কাল ও পাত্রের উপযুক্ত বিধায় আমরা তা এখানে বর্ণনা করছি ঃ

এক ঃ নবী ও রাসূলগণ ছাড়া মস্তবড় আলেম ও বুযর্গও তানকীদ বা পরখ ও যাঁচাই-বাছাইয়ের ঊর্ধে নয়। হযরত খিযিরের মতো আলেম, বুযর্গ এবং ওলী আল্লাহ হলেও তাঁর কথা এবং কাজ সমকালীন ধর্মীয় বিধানের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাঁচাই-বাচাই করতে হবে। পরখ করার পর যেসব কথা ও কাজ আসমানী শরীয়াত অনুযায়ী হবে তা গ্রহণীয় আর যা শরীয়াত বিরোধী হবে তা বর্জনীয় এবং সেগুলোর ক্ষেত্রে মতপার্থক্য করা যাবে।

দুই ঃ কোনো মস্তবড় ব্যক্তি এবং বুযর্গ আলেমের কথা ও কাজের যদি এ অর্থে তানকীদ করা যায় যে, শরীয়াতের কষ্টিপাথরে এসব কথা ও কাজ পরখ করা হবে। তারপর এসব কথা ও কাজ ন্যায়ের মানদণ্ডে পরখ করে দেখা হবে তা শরীয়াতের মানদণ্ডে টিকে কিনা অথবা এগুলো শরয়ী আহকামের সাথে সামঞ্জস্যশীল না অসামঞ্জস্যশীল। শরয়ী বিধানের আলোকে এতটুকু জ্ঞাত হওয়া সেই ব্যক্তির অবজ্ঞা নয়। তার এরূপ যাঁচাই-বাছাই করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে নাজায়েযও নয়।

তিন ঃ আসমানী বিধান এবং তার বাহক নবী-রসূলগণই প্রকৃতপক্ষে সত্যের মাপকাঠি। যতবড় বুযর্গই হোক না কেন, অন্য যে কোনো ব্যক্তি এ অর্থে সত্যের মাপকাঠি নয় যে, কুরআন, হাদীস ও শরয়ী বিধান তার কথা ও কাজ সম্পর্কে কি ফায়সালা দিয়েছে তা দেখা ছাড়াই কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বুযর্গীর ভিত্তিতে তার কথা ও কাজ আমাদের জন্য নবীদের কথা ও কাজের মতো দলীল হয়ে যাবে এবং সর্বাবস্থায় তাদের অনুসরণ করা আমাদের জন্য জরুরী হয়ে পড়বে।

হাদীসের দৃষ্টিতে তানকীদ করা

পবিত্র কুরআনের পর হাদীসের দিকে নজর দিলে আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, বড় বড় সাহাবা এবং আলেমদেরও সমালোচনা করা হয়েছে। তাঁরা বরং এ ধরনের সমালোচনার জন্যে নিজেদেরকে পেশ করেছেন। কখনো

www.pathagar.com

তা অপসন্দ করেননি এবং এ ধরনের সমালোচনাকে কখনো তারা বে-ইজ্জতি বা অবজ্ঞা মনে করতেন না। এতে জানা যায় যে, তারা তানকীদ করা নাজায়েয মনে করতেন না এবং তানকীদ দ্বারা কারো দীনি মর্যাদা আহত হতে পারে এমন অথবা কারো ধর্মীয় মর্যাদায় খাটো হতে পারে এমন চিন্তাও তারা কখনো করেননি। বরং আপোষে একে অপরের এমন প্রকৃতির তানকীদ করায় এবং তানকীদ করার অনুমতি দেয়ায় দীনের নিয়ম-নীতিতে বে-দীন নিয়ম-নীতি প্রবেশ করার রাস্তা বন্ধ হয়েছে এবং সব ধরনের দীনি বিকৃতি থেকে রক্ষা পায়।

কিন্তু যখন থেকে একে অপরের তানকীদ করার রীতি বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যক্তি ও মাযহাবী ইমাম ও নেতাদের মরতবাকে দীনের মরতাবার উর্ধে মনে করা হতে থাকে তাদের স্পষ্ট শরীয়াত বিরোধী কাজের সমালোচনাকেও তাদের বে-ইজ্জতি মনে করা হতে থাকে, তাদের নিষ্কলুষতা বহাল রাখার জন্যে এ মর্মে সবক দেয়া হতে থাকে যে ঃ

"শরাব দিয়ে ধৌত জায়নামাযে বুযর্গ পীর নামায পড়তে হুকুম দিলেও মুরীদকে তাই করতে হবে। বে-খবর মুরীদ সে রাজ্যের তথ্য কিইবা জানে। (যে সে বিষয়ে তর্ক করবে)?"

তখন থেকেই দীনের নিরাপদ দুর্গ ও শক্ত ঘাটিতে ফাটল ধরতে শুরু করে এবং দীনের মৌলিক বিকৃতির জন্য সব ধরনের চোরাই দরযা খুলে যায়। আর এ দরযা বন্ধ করার জন্য হক্কানী আলেমগণ ও জাতির সংস্কারকগণকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয় এবং অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এবার নিম্নে হাদীসের আলোকে কতিপয় ঘটনাবলীর অবতারণা করা হচ্ছে। এসব ঘটনার দ্বারা বিষয়টি আবিষ্কার হয়ে যাবে যে, দীনের ব্যাপারে একে অপরের কথা ও কাজের তানকীদ করা এবং শরীয়াতের মানদণ্ডে তা পরখ ও যাঁচাই-বাছাই করা জায়েয। নবীগণ ছাড়া কোনো লোকই এর ব্যতিক্রম নয়।

মিরাসের ব্যাপারে হযরত আবু মূসার উপর তানকীদ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর গোটা উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দল হলো নিবেদিত প্রাণ সম্মানিত সাহাবীগণ—এ সত্য কোনো মু'মিন অস্বীকার করতে পারবে না। সাহাবীগণ গোটা উম্মতের দিশারী নেতা ও কর্ণধার। তাদের অনুসরণ আমাদের সৌভাগ্যের প্রসূতি এবং মুক্তির সোপান। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর উম্মতের মধ্যে দীনের ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারী হলেন সাহাবায়ে কিরামগণ। তাঁরা আমাদের কাছে খুবই পসন্দনীয় ও নৈকট্য লাভকারী বান্দা। তাদের সম্পর্কেই ঘোষণা হয়েছে ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

www.pathagar.com

এতো ফযীলত ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নবীদের মতো মাসুম, তাদের ইজতিহাদী ভুলত্রুটি হতে পারে না অথবা তাঁরা মানবসুলভ প্রকৃতি থেকে মুক্ত—তাদের সম্পর্কে এমন দাবী করা কঠিন। আমরা দেখতে পাই, তাঁরা এমন কথা বলেছেন এবং এমন কাজ করেছেন—যা কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে পরিত্যাজ্য বিবেচিত হয়েছে। তাঁরা নিজেরাও পরস্পরের তানকীদ করেছেন এবং পরবর্তী সময়ের আলেমগণও তাঁদের ব্যক্তিগত কথা ও ইজতিহাদী সিদ্ধান্তসমূহকে আলোচনার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলোর ওপর তানকীদ করেছেন। এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, সম্মানিত সাহাবীগণ আল্লাহর দৃষ্টিতে একটি পসন্দনীয় ও পরম প্রিয় দল হওয়া সত্ত্বেও উম্মতের জন্যে সত্যের মানদণ্ড হওয়া অথবা তাঁদের ব্যক্তিগত কথা ও ফায়সালা তানকীদের উর্ধে হওয়ার মরতবা আল্লাহ্ তাদেরকে দেননি।

এ বিষয়ের কতিপয় নির্ভরযোগ্য ঘটনার মধ্যে মিরাসের ঘটনাটি অন্যতম। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ঘটনাটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মিরাসের একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হলো। মাসয়ালাটি হলো—এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এক মেয়ে, এক নাতনী ও এক বোন রেখে যায়। এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিভাবে বণ্টন করা হবে? আবু মূসা আশয়ারী জবাবে বললেন ঃ সমস্ত সম্পত্তি সমানভাবে মেয়ে ও বোন পাবে। নাতনী সম্পত্তি পাবে না। বণ্টন নক্‌শাটি এরূপ ঃ

মৃত ঃ

মেয়ে	বোন	নাতনী
$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$	(বঞ্চিত)

আবু মূসা আশয়ারী সাথে সাথেই প্রশ্নকারীকে একথাও বললেন যে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদের কাছেও জিজ্ঞেস করো সম্ভবত তিনি আমার এ জবাব সমর্থন করবেন।

প্রশ্নকর্তা আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জবাব নিয়ে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলেন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললে তিনি আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জবাবের চরম তানকীদ করলেন এবং বললেন ঃ যদি আমি আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জবাবের সমর্থন করি তাহলে গোমরাহ হয়ে যাবো। নবীর দেয়া জবাব আমার কাছে আছে পৌত্রী মাহরূম হবে না ; বরং এক ষষ্ঠাংশের অধিকারী হবে। বণ্টন হবে এভাবে সমস্ত সম্পত্তি ৬ ভাগে বিভক্ত হবে। অর্ধেক মেয়ে পাবে, এক-ষষ্ঠাংশ

www.pathagar.com

পাবে পৌত্রী (দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্যে) تكملت للثلثين অবশিষ্ট যা থাকে তা পাবে বোন 'আসাবা' হিসেবে। কেননা মৃতের মেয়ের বর্তমানে বোন 'আসাবা' হিসেবে গণ্য হয় ; যাবিউল ফুরুয হয় না। হাদীসে আছে ঃ اجعلوا الاحوات مع البنات عصبة "কন্যার সাথে বোনদেরকে 'আসাবা' বানাও।"
-(হাদীস)

বন্টন নক্শাটি এরূপ হবে ঃ

মাসয়ালা-৬

মৃত --

মেয়ে	পৌত্রী	বোন
৩	১	২

উপরোক্ত ঘটনাটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

عن هزيل ابن شرحبيل قال سئل ابو موسى عن ابنة وبنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف وائت ابن مسعود فسيتا بعنى فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابى موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين - اقضى فيها بما قضى النبى صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقى فللاخت فاتينا ابا موسى فاخبرنا بقول ابن مسعود فقال لاتسألونى مادام هذا الحبر فيكم - (رواه البخارى)

"হুযাইল বিন শুরাহবিল বর্ণনা করেছেন ঃ একবার হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার মেয়ে, বোন ও পৌত্রীর মধ্যে কিভাবে বন্টন করা হবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো। তিনি জবাবে বললেন ঃ মেয়ে ও বোন অর্ধেক করে পাবে। (পৌত্রী কিছুই পাবে না)। ইবনে মাসউদকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করো, সে হয়তো আমাকে সমর্থন করবে। এ প্রশ্নকর্তা এ জবাব নিয়ে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলেন এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ যদি আমি আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জবাবের সমর্থন করি তাহলে গোমরাহ হয়ে যাবো। এ বিষয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ফায়সালা করেছেন আমি সেরূপ ফায়সালাই করবো। ফায়সালাটি হলো মেয়ে পাবে অর্ধেক সম্পত্তি, পৌত্রী

www.pathagar.com

এক-ষষ্ঠাংশ পাবে যাতে মেয়ের দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়। আর অবশিষ্ট অংশ পাবে বোন। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ জবাব নিয়ে আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসলে তিনি বললেন ঃ এ অভিজ্ঞ আলেমের বর্তমানে আমাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করো না।-(বুখারী)

সাহাবীদের ব্যক্তিগত কথা এবং ইজতিহাদী ফায়সালা নবীদের মত ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। এ ঘটনা একদিকে এ সত্য তুলে ধরে অন্যদিকে একথাও স্পষ্টত জানা যায় যে, তাদের ব্যক্তিগত অভিমতের তানকীদ করা নিষিদ্ধ নয় এবং তানকীদ থেকে তা ঊর্ধেও নয়। বরং তাদের এ ধরনের উক্তিসমূহ কুরআন ও হাদীসের নিরিখে পরখ ও যাঁচাই-বাছাই করার উপযোগী। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরখ করার পর আসল সত্যের মানদণ্ডের সাথে তা সামঞ্জস্যশীল হলে গ্রহণীয় হবে আর বিরোধী হলে বর্জনীয় হবে। এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, সত্যের প্রকৃত মানদণ্ড হলো কুরআন ও হাদীস। সাহাবায়ে কিরামগণ নয়। তানকীদের ঊর্ধে হচ্ছেন কেবলমাত্র নবী রসূলগণ। তাদের সাহাবীগণ নয়।

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তানকীদ

তানকীদ করার এ নীতি সাহাবীদের যুগ থেকেই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিলো। তানকীদ করতে গিয়ে কারো মরতবার দিকে লক্ষ্য করা হতো না। কারো ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব, বিরাট ব্যক্তিত্ব তানকীদ করার পথে বাধা হতে পারতো না। বরং সকলেই একে অপরের তানকীদ করতেন। একে অপরের কথা ও মতামতকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে পরখ করতেন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। এসব করে জানতেন কথাগুলো হাদীস কুরআনের অনুকুলে না প্রতিকুলে। প্রতিকুলে হলে প্রকাশ্যে বাতিল ঘোষণা করতেন। শুধু ব্যক্তির ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদার কারণেই তা গ্রহণযোগ্য হতো না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা দ্বিতীয় খলিফা উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি মতের ওপর তানকীদ করে সে নজীর স্থাপন করেছেন। একজন সিরীয় লোকের সাথে কথোপকথনের সময় ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিরমিযিতে ঘটনাটি ব্যক্ত হয়েছে এভাবে ঃ

روى الترمذى انّ رجلا من اهل الشام سأل عبد اللّٰه ابن عمر من التّمتع

بالعمرة الى الحج فقال حلال - فقال الشامى ان اباك قد نهى عنها فقال

ارأيت ان كان ابى قد هنى عنها وصنعها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امر ابى يتبع ام امر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؟ فقال بل امر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال قد صنعها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم -

"তিরমিযী বর্ণনা করেন, একজন সিরীয় লোক ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হজ্জের সাথে ওমরা তামাত্তু করা জায়েয না হারাম ? ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ জায়েয এবং হালাল। লোকটি বললেন ঃ তোমার পিতা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তো তামাত্তু করা নিষেধ করে দিয়েছেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, বলুন ! আমার পিতা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি নিষেধ করে থাকেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ কাজ করে থাকেন তাহলে কাকে এ ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে—আমার পিতা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লামকে ? সিরীয় লোকটি বললেন ঃ অনুসরণ তো করতে হবে রসূলের আদেশ ও কাজের। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তামাত্তু করেছেন।"

এ কথোপকথনে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরীয় লোকটির প্রতিবাদের জবাবে বলেননি যে, আমার পিতা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তামাত্তু করতে নিষেধ করেননি এবং নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটি তাঁর সাথে সম্পর্কিত করা ভুল। বরং নিষিদ্ধ করার বিষয়টি সঠিক বলে গ্রহণ করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার আসল ফতওয়ার ওপর তানকীদ করেছেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর নিষিদ্ধকরণ ফতওয়াকে রসূলের সুন্নাতের কষ্টিপাথরে যাঁচাই করে এবং শরয়ী মানদণ্ডে পরখ করে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমার পিতা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ফতওয়া হুজুরের কাজের খেলাফ হওয়ার কারণে অনুসরণযোগ্য নয় বরং বর্জনযোগ্য।

হযরত সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ঘটনা

ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কিত এ ধরনের আরো একটি ঘটনা আছে। হযরত সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং দাদা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ের একটি ফতওয়ার ওপর তানকীদ করেছেন এবং একটি সুন্নাতের মুকাবিলায় সে ফতওয়াটি বর্জন করেছেন।

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহ্‌রামের আগে সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন। পরন্তু ঈদের দিন ইহ্‌রাম খুলে যখন কুরবানী ও হলক (মাথা কামানো) করেন (তাওয়াফে যিয়ারত তখনো করা হয়নি) তখনও সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। বুখারী মুসলিম উভয় হাদীস গ্রন্থে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن عائشة قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك -(متفق عليه)

"হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ আমি নিজে ইহ্‌রামের আগে এবং ঈদের দিন তাওয়াফে যিয়ারতের আগে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম যার মধ্যে মিশ্‌ক থাকতো।"
–(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফে যিয়ারতের আগে এবং ইহ্‌রামের আগে উভয় অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। সুতরাং এ কাজটি জায়েয। কিন্তু হযরত উমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর এবং তাঁর ছেলে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উভয়ের মতে এ কাজটি নাজায়েয এবং উভয় অবস্থাতেই খুশবু লাগানো জায়েয় নয়। হযরত সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাপ-দাদার রায়ের সাথে একমত ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপরোক্ত হাদীসটি পেলেন তখন বাপ-দাদার রায়টি রসূলের হাদীসের নিরীখে পরখ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না পেয়ে প্রত্যাখ্যান করেন এবং উভয় অবস্থাতেই খুশবু ব্যবহার করা জায়েয বলে ঘোষণা করেন। কেননা রসূলের সুন্নাত দ্বারা তা জায়েয বলে প্রমাণিত। রসূলের সুন্নাতের মুকাবিলায় কারো কথা বা রায় নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। কিংবা সে কথা বা রায়ের অনুসরণকারী আদৌ জায়েয নয়। হযরত সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লামা সিন্ধী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি ইবনে মাযার টীকায় লিখেছেন ঃ

وقد عمل بمثل هذا سالم ابن عبد الله حين بلغه حديث عائشة فى الطيب قبل الاحرام وقبل الافاضة ترك قول ابيه وجده وقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان يتبع -

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহ্‌রামের আগে এবং তাওয়াফে যিয়ারাতের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা সম্বলিত হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস হযরত সালেম রাহ্‌মাতুল্লাহ আলাইহি পেলেন তখন তিনি

www.pathagar.com

হাদীসের অনুসরণ করলেন এবং তাঁর পিতা ও দাদার মত পরিত্যাগ করে বললেন ঃ রসূলের সুন্নাতই অনুসরণ অনুকরণের অধিকতর যোগ্য।"

এ ঘটনাটিও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ব বর্ণিত ঘটনার মতো এ সত্য উদ্ঘাটন করে যে, সাহাবায়ে কিরামগণ এ অর্থে সত্যের মানদণ্ড নয় এবং তাঁদের ব্যক্তিগত কথা মত ও ফায়সালা কখনো পরখ বা যাঁচাই-বাছাই করার উর্ধে হতে পারে না। অথবা তাদের ব্যক্তিগত কথা কুরআন ও হাদীসের নিরিখে যাঁচাই এবং শরীয়াতের কষ্টিপাথরে পরখ করার আদৌ প্রয়োজন নেই, বরং সর্বাবস্থায় তাদের কথা অবশ্য পালনীয়। অন্যথায় ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহুর এবং হযরত সালেম রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়ের তানকীদ করার অধিকার ও সাহস কস্মিনকালেও পেতেন না। এবং তিনিও এমন দু'জন ব্যক্তিত্বের যার একজন ছিলেন খেলাফতে রাশেদার অন্যতম—তার এ ধরনের তানকীদ করতেন না। এতে প্রমাণ হয় যে, প্রকৃত সত্যের মাপকাঠি এবং তানকীদ থেকে মুক্ত যদি কিছু থেকে থাকে তবে তাহলো শুধুমাত্র নবীর পবিত্র সত্তা এবং তার আনীত শরীয়াত। আর এর প্রকৃত ব্যাখ্যাকারী একদিকে আল্লাহর কিতাব এবং অন্যদিকে নবীর সুন্নাত।

কিনতারের মাসয়ালা

আল্লাহর ঘোষণা وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا আয়াতের قنطار শব্দটির তাফসীর করতে গিয়ে তাফসীরকারকগণ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ভাষণকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ একদা মসজিদে নববীতে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বললেন ঃ বিবাহে মেয়েদের অধিক পরিমাণে মোহর দাবী করা ঠিক নয়। উপস্থিত মহিলাদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের জোর প্রতিবাদ করে বললেনঃ আমীরুল মু'মিনীন আমরা আপনার কথা মানবো না আল্লাহর আদেশ মানবো? আল্লাহ বলেছেন ঃ وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا কিনতার অর্থ অনেক সম্পদ। আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, বিবাহে অধিক পরিমাণে মোহরানা ধার্য হতে পারে। আর আপনি বলছেন বিবাহে বেশী পরিমাণে মোহরানা ধার্য করো না। এখন আমরা কার অনুসরণ করবো আপনার না আল্লাহর? হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মহিলার প্রশ্নের উৎসাহ ব্যঞ্জক জবাব দিলেন। তিনি বললেন, জানা শোনায় সকলেই ওমরের চেয়ে বড়। বিবাহে যতবেশী পরিমাণে ইচ্ছা মহোরানা ধার্য করতে পার। ঘটনাটি ব্যক্ত হয়েছে এভাবে ঃ

قال عمر رضـ على المنبر لاتغالوا بصدقات النساء فقالت امرأة انتبع

www.pathagar.com

قولك ام قول الله واتيتم احداهن قنطارا الايه - فقال عمر رضـ كل احدا علم من عمر رضـ تزوجوا على ما شئتم اهـ

"হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মিম্বারে দাঁড়িয়ে স্ত্রীদেরকে বেশী পরিমাণে মোহরানা দেয়ার জন্যে বক্তৃতা করলেন। একজন মহিলা তানকীদ করে বললেন ঃ আপনার কথা শুনবো নাকি আল্লাহর কথা ? আল্লাহ বলেছেন, তোমরা তাদের কাউকে মোহর হিসেবে অনেক অর্থ দিয়েছো— তাতে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ ইলমের দিক দিয়ে সবাই আমার চেয়ে বড়। তোমরা যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করো।"

সাহাবীদের সোনালী যুগে পারস্পরিক তানকীদ করার যে স্বাধীনতা ছিলো এতে হযরত উমরের মতো জ্ঞানী ও প্রতাপান্বিত মুসলিম জাহানের খলীফার তানকীদ একজন সামান্য রমণীও জনাকীর্ণ সভায় নির্ভয়ে করতে পারতো। এমন বাক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ছিলো যে, একজন মহিলা মুখের উপর বলেছিলেন, মোহর বেশী পরিমাণে না নেয়ার আপনার হুকুম ও ফায়সালা কুরআনের মানদণ্ডে যাঁচাই-বাছাই করার পর সঠিক না হওয়ার কারণে এ হুকুম আমাদের জন্যে কার্যকরী করার উপযোগী নয়। আমরা এ হুকুম তামিল করতে অপারগ। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সমালোচনার প্রশংসা করে বললেন ঃ ইলমের দিক দিয়ে সবাই উমরের চেয়ে বড়। তারপর এ তানকীদ হাসিমুখে গ্রহণ করে ঘোষণা করলেন। تزوجوا على ما شئتم তোমরা ইচ্ছা মুতাবেক মোহর নিয়ে বিবাহ কর।"

ইতিহাসের পাতায় আজও হযরত উমরের মতো খলীফায়ে রাশেদ, নবীর উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী বরং নবীর উযীর ও পরামর্শদাতার সেসব কথা পাওয়া যায় যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে গোটা মুসলিম জাতির সামনে তানকীদের জন্যে পেশ করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন ঃ

"খলীফার মসনদে সমাসীন হওয়ার পর জনসাধারণের সামনে তিনি প্রথম যে ভাষণ দেন তাতে সকলকে তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তানকীদ করার সাধারণ অনুমতি দান করে বললেন ঃ من راى منكم فى اعوجا جا فليقومه আমার চরিত্র ও কাজে যে-ই কোনো নীতি বিরোধী কাজ বক্রতা দেখবে তা দূর করে আমাকে সঠিক পথে আনার পূর্ণ অধিকার তার রয়েছে। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা হাদীস ও শরীয়াতের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় যদ্বারা জানা যায় যে, সম্মানিত সাহাবীদের ব্যক্তিগত কথা, অভিমত ও ফায়সালার ওপর তানকীদ করা হয়েছে। এরূপ তানকীদকে তারা অসম্মানজনক কাজ বলে মনে করতেন

www.pathagar.com

না এবং নাজায়েয কাজ হিসাবেও সেগুলোকে গণ্য করা হতো না। সাহাবীগণ এ ধরনের তানকীদের ঊর্ধে ছিলেন না এবং আগেকার আলেমগণ তাদেরকে এ ধরনের তানকীদ থেকে মুক্ত মনে করতেন না।

পায়খানা পেশাব করার সময় কিবলামুখী হওয়ার প্রসংগ

পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলামুখী হওয়া কিংবা কিবলার পশ্চাৎমুখী হওয়া জায়েয নাজায়েয এ নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নাজায়েয হলে উন্মুক্ত মাঠ ও বসতি এলাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা অথবা উভয় প্রকার জায়গাতেই উভয় অবস্থাই তা নিষিদ্ধ কিনা, এ ব্যাপারে অধিকাংশ ফকীহ ও সাধারণ মুহাদ্দিসগণের মত হলো—প্রাচীর ঘেরা বসতিস্থানে কিবলামুখী হওয়া ও কিবলাকে পশ্চাতে রাখা উভয় অবস্থাই জায়েয। উন্মুক্ত মাঠ—যেখানে মানুষ ও কেবলার মাঝখানে কোনো প্রাচীর বা পর্দা নেই সেখানে অগ্রপশ্চাৎ উভয়ই নিষিদ্ধ। সাহাবীদের মধ্যে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীগণও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কে আবু দাউদ ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে নিম্নোক্ত রূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن مروان الاصفر قال رايت ابن عمر رضـ اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها ـ فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهى عن هذا قال بلى انما نهى عن ذلك فى الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيئ يسترك فلا بأس ـ(ابو داؤد ـج ـص ٣)

> "মারওয়ান আসফর বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখলাম তিনি নিজের সওয়ারীকে কিবলামুখী করে বসানোর পর সেদিক মুখ করে পেশাব করলেন। আমি তাঁকে বললাম ঃ কিবলামুখী হয়ে পেশাব করা কি নিষিদ্ধ নয় ? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই। তবে নিষিদ্ধ হলো খোলা মাঠে যেখানে কিবলাহ ও তোমার মাঝে কোনো আড়াল নেই। আর যেখানে পর্দা বা আড়াল থাকবে সেখানে কিবলামুখী হওয়ায় কোনো দোষ নেই।"–(আবু দাউদ খণ্ড ঃ ১ পৃঃ ৩)

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতামত ঃ হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ রায়ের ভিত্তি হলো আবু দাউদ ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস—হাদীসটি হলো ঃ

www.pathagar.com

عن ابن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته ـ(ابو داؤد ج ـص۲)

"ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমি একবার ঘরের ছাদে উঠলাম সেখান থেকে দেখতে পেলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি ইটের উপর বসে (নিজ ঘরে) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। সে সময় তিনি ছিলেন বাইতুল মাকদাসমুখী আর কিবলা ছিলো তাঁর পিছন দিকে।"

এ হাদীস দ্বারা জনবসতির মধ্যে কিবলাহ্ পশ্চাতে রাখা প্রমাণিত হয়। অথচ হাদীসেও কেবলামুখী হওয়ার মতো পশ্চাতে রাখাও নিষিদ্ধ হয়েছিলো। হাদীসে আছে ঃ

لاتستقبلوا القبلة بغائط اوبول ولا تستدبروها

"পেশাব-পায়খানার সময় কিবলাকে সামনে বা পিছনে করো না।"

আগের হাদীস দ্বারা যখন কিবলাকে জনবসতির মধ্যে পশ্চাতে রাখা বৈধ প্রমাণিত হয় তখন জনবসতির মধ্যে কিবলামুখী হওয়াও জায়েয। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "জনবসতির মধ্যে জায়েয হওয়ার আসল কারণ হলো যেহেতু মানুষ ও কিবলার মাঝখানে পর্দা ও প্রাচীর। সুতরাং খোলা মাঠেও যখন কোনো প্রাচীর বা পর্দা হবে তখন সেখানেও কিবলাকে সামনে পিছনে রাখা জায়েয হবে।"

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুও হুবহু এ অভিমত জনবসতির মধ্যে কিবলা সামনে পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা জায়েয মনে করেন। তিনি বলেন ঃ

نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم ان نستقبل القبلة ببول فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها ـ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের এক বছর আগে আমি তাকে কেবলামুখী হয়ে প্রয়োজন পূরণ করতে দেখেছি।"

এ উভয় রেওয়ায়েতের সনদের ওপর আবু দাউদ কোনো মন্তব্য করেননি। তাতে আবু দাউদের কাছে এ উভয় রেওয়ায়েতে দলীল হওয়ার যোগ্য বলে মনে হয়। যদি ধরে নেয়া হয় যে, সনদের দিক থেকে এ উভয় বর্ণনা দুর্বল তথাপি হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর

www.pathagar.com

নিশ্চিত অভিমত হলো পেশাব-পায়খানা করার সময় জনবসতির মধ্যে কিবলা সামনে পিছনে রাখা জায়েয। উন্মুক্ত ও খোলা মাঠে জায়েয নয়।

উভয় সাহাবীর মতের ওপর হানাফীদের তানকীদ

হানাফী মতাবলম্বী সমস্ত ফকীহগণ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতের বিরোধিতা করে বলেন— জনবসতি বা জনহীন খোলা মাঠ কিংবা মরুভূমি হোক, কোথাও কিবলাহকে সামনে বা পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা আদৌ ঠিক নয়। তারা উভয় রেওয়ায়েতের তানকীদ করেন হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েত দ্বারা। আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন ঃ

اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرّقوا او غرّبوا -

"তোমরা পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখো না। বরং পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে বসবে।"-(বুখারী আবু দাউদ)

লজ্জা শরম থাকলে এবার একটু চিন্তা করে দেখুন ! হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে সমস্ত হানাফী ফকীহগণের ফতওয়া দেয়া তাদের মাযহাব ও রায়ের তানকীদ করা নয় তো আর কি ? এ বিষয়ে সাহাবীগণের কথা ও মতামতের মধ্যে যে বিভিন্নতা পাওয়া যায় তার মধ্যে কতিপয় মতামতকে দলীল ও রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাঁচাই-বাছাই করার পর অপরাপর মতামতের মুকাবিলায় হানাফী ফকীগণ গ্রহণযোগ্য ও অগ্রাধিকার দিয়েছেন কি দেননি ? এবং কতিপয় মতামতকে বর্জনযোগ্য মনে করেছেন কি করেননি ? যদি জবাব হ্যাঁ সূচক হয় তাহলে এ কাজ তানকীদ ছাড়া আর কি ? যাঁচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর গ্রহণ, বর্জন ও প্রাধান্য দেয়ার অপর নামই তো তানকীদ। সুতরাং সম্মানিত সাহাবীগণ যদি সব ধরনের তানকীদ থেকে মুক্ত হতেন এবং তাঁরা নিজেরাই সত্যের মাপকাঠি হতেন তাহলে হানাফী ফকীহগণ হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতের বিপক্ষে ফতওয়া দিলেন কেন এবং তাঁদের মত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতের বিরোধী বলে কেন তানকীদ করলেন ?

জুময়া ও ঈদ একত্রিত হওয়া

জুময়ার দিনে ঈদ হলে জুময়ার নামায পড়া জরুরী কিনা অথবা কেবলমাত্র ঈদের নামায পড়াই জুময়ার জন্যে যথেষ্ট হবে—এ বিষয়টি নিয়েও আগেকার

www.pathagar.com

আলেমগণ মতবিরোধ করেছেন। যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ তিনজন সাহাবীর মতে ঈদের দিনের জুময়া অত্যাবশ্যক নয়। ঈদের নামাযই যথেষ্ট। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বরং এটাকেই সুন্নাত বলেছেন। তাঁদের মতের পক্ষে দলীল ঃ

عن اياس بن ابى رملة الشامى قال شهدت معاوية بن ابى سفيان وهو يسأل زيدبن ارقم قال اشهدت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عيدين اجتمعا فى يوم ؟ قال نعم ، قال فكيف صنع ؟ قال صلى العيد ثم رخص فى الجمعة فقال من شاء ان يصلى فليصلّ - (ابو داؤد . ج -١ ص ١٥٣)

"আয়াস বিন আবু রামলাহ শামী বলেন, আমি হযরত মুয়াবিয়ার খেদমতে এমন অবস্থায় হাজির হলাম যখন তিনি হযরত যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জুময়ার দিনে ঈদের নামায পড়ার সুযোগ কখনো হয়েছিলো কিনা জিজ্ঞেস করেছিলেন ? যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ হ্যাঁ। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি করেছিলেন ? যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ ঈদের নামায পড়ালেন আর জুমায়ার নামাযের জন্যে ইখতিয়ার দিয়ে বললেন ঃ কেউ ইচ্ছা করলে জুময়ার নামায পড়তে পারে।"

–(আবু দাউদ, খণ্ড-১, পৃঃ-১৫৩)

عن عطاء بن ابى رباح قال صلى بنا ابن الزبير فى يوم عيد فى جمعة اول النهار ثم رحنا الى الجمعة فلم يخرج الينا فصلينا وحدانا - وكان ابن عباس بانطائف فلما قدم ذكرنا ذالك له فقال اصاب السنة -(ابو داود)

"আতা বিন আবু রাবাহ বলেন, জুময়ার দিনে আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব সকালে আমাদের ঈদের নামায পড়ালেন। দ্বিপ্রহরে জোহরের সময় আমরা জুময়ার জন্যে গেলাম। কিন্তু তিনি আসলেন না। তারপর আমরা আলাদা আলাদাভাবে নামায পড়ে নিলাম। সে সময় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তায়েফে ছিলেন। তিনি তায়েফ থেকে ফিরে আসলে আমরা তাঁর কাছে ইবনে যুবাইরের এ ঘটনা বললাম। তিনি বললেন ঃ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু সুন্নাত মুতাবেক কাজ করেছেন।–(ঐ দ্রষ্টব্য)

www.pathagar.com

قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيد ان اجتمعا في يوم واحد فجمعها جميعا فصلا همار كعتين بكرة لم يزد عليها حتى صلى العمر ـ

"আতা বলেন, একবার ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে জুমআ ও ঈদুল ফিতর একই দিনে একত্রিত হয়ে যায়। ইবনে যুবাইর বললেন, আজ দু' ঈদ একত্রিত হলো তারপর উভয় ঈদকে একত্রিত করে সকাল বেলায়ই শুধুমাত্র দু' রাকয়াত নামায পড়ালেন, অতিরিক্ত পড়ালেন না। তারপরে আসর ছাড়া আর কোনো নামায পড়লেন না।"–(ঐ দ্রষ্টব্য)

উপরোক্ত তিন সাহাবীর অভিমতের এমন কোনো ভিত্তিহীন অভিমত নয়। হাদীসে মারফু তাদের অভিমতের ভিত্তি মারফু হাদীসে আছে ঃ

عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع فى يومكم هذا عيد ان فمن شاء اجزاه من الجمعة وانا مجمعون ـ

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ঈদ ও জুময়া একই দিনে হওয়ার সময়) বললেন ঃ আজকের দিনে দু'টি ঈদ একত্রিত হয়েছে। কেউ ইচ্ছা করলে শুধু ঈদের নামাযকেই যথেষ্ট মনে করতে পারে। তবে আমি জুময়ার নামায পড়বো।"–(আবু দাউদ, খণ্ড ১, পৃঃ১৫৩)

জুময়ার দিনে ঈদ হলে ঈদের নামাযই যথেষ্ট জুময়া পড়া জরুরী নয় ; বরং হুজুরের বাণীতে জুময়ার নামায ছেড়ে দেয়ার স্পষ্ট অনুমতি রয়েছে। এ কারণে যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবীদের মতে জুময়ার দিনে ঈদের নামায পড়া কেবলমাত্র জায়েযই নয় বরং জুময়ার নামায না পড়া সুন্নাতও বটে। আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জুময়ার নামায ত্যাগ করাকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সুন্নাত ঘোষণা করে বললেন اصاب السنة। তিনি সুন্নাত মুতাবেক কাজ করেছেন।"

এ মত কি তানকীদের উর্ধে

সম্মানিত সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি এবং তাঁদের সব ধরনের ফায়সালা ও ইজতেহাদী রায় সর্বপ্রকার তানকীদ ও যাঁচাই-বছাইয়ের উর্ধে। সাহাবীদের

www.pathagar.com

সম্পর্কে যারা এ দাবী করেন তাদের কাছে সবিনয় আরজ আপনাদের স্বীকৃত নীতির আলোকে যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ তিনজনের অভিমত কি তানকীদের ঊর্ধে ? এ তিনজন সাহাবী সত্যের মানদণ্ড কিনা ? যদি জবাব না বোধক হয় তাহলে আপনাদের গৃহীত নীতি ঠিক নয়। আর যদি জবাব হাঁ বোধক হয় যেমন আপনাদের স্বীকৃত অভিমত—তাহলে দয়া করে বলুন। শুধুমাত্র আপনারাই নন বরং জমহুরগণও এ অভিমতের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন কেন ? যে অভিমত কেবল তানকীদেরই ঊর্ধে নয় বরং সত্য ও ন্যায়ানুগও, শুধুমাত্র ন্যায়ানুগই নয় বরং ন্যায়ের মানদণ্ডও বটে, এমন অভিমতকে শরয়ী মাসয়ালার ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া কিংবা পরিত্যাগ করা যায় কি ? যে মত ও রায় গ্রহণ বা বর্জন করা ইচ্ছাধীন সে মতের সত্যের মাপকাঠি ও সব ধরনের তানকীদের ঊর্ধে হওয়ার কি তাৎপর্য হতে পারে ?

এর জবাবে আপনারা বড়জোর যা বলতে পারেন তাহলো, এ ব্যাপারে যেহেতু সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে এবং অধিকাংশ সাহাবীদের মত এই তিনজন সাহাবীর মতের অনুরূপ নয়। এ কারণে অধিকাংশ সাহাবীর মুকাবিলায় আমরা তিনজন সাহাবীর মতামতকে গ্রহণ করতে পারি না, বরং পরিত্যাগ করতে বাধ্য। অথবা বলা যায় এ তিনজন সাহাবীর অভিমত শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে দুর্বল এবং যে হাদীসের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা এ মত ব্যক্ত করেছেন হাদীসের প্রকৃত তাৎপর্য তা নয় যা তাঁরা বুঝেছেন। হাদীসের প্রকৃত তাৎপর্য হলো—জুময়ার দিনে ঈদ হলে জুময়া না পড়ার অবকাশ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রামবাসী, আওয়ালীবাসী ও শহরতলীর যেসব অধিবাসী মদীনা থেকে বেশ দূরে বসবাস করে তাদের জন্যে দিয়েছেন, কেননা তাদের জন্যে জুময়া ফরয ছিলো না। অধিকন্তু তখনো জুময়ার সময় হয়নি। যোহরের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা দূর দূরান্ত হতে আগত লোকদের জন্যে কষ্টদায়ক, তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব লোকদেরকে নিজ নিজ বাসস্থানে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি তাদের যাওয়ার জন্যে অনুমতি দিলেন। কিন্তু মদীনাবাসীদের সে অবকাশ দিলেন না। إِنَّا مُجَمِّعُونَ হাদীসের একথাটি সেদিকেই ইংগিত দিচ্ছে। হাদীসটির এরূপ ব্যাখ্যা উমর বিন আবদুল আযীযের একটি রেওয়ায়েতে বর্তমান আছে। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাবুল উম্মে সে রেওয়ায়েতটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদের শরাহ বজলুল মাজহুদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা তার উল্লেখ করছি।

www.pathagar.com

দু' ঈদ একত্রিত হওয়া অবস্থায় ইমাম শাফেয়ীর অভিমত

ইমাম শাফেয়ী রাহ্‌মাতুল্লাহ্ আলাইহি কিতাবুল উম্মে দু' ঈদের একত্রিত হওয়া শিরোনামে নিজের সনদ দিয়ে উমর বিন আবদুল আযীযের এ রেওয়ায়েতের উল্লেখ করেছেন ঃ

عن عمر بن عبد العزيز قال اجتمع عيد ان على عهد رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم فقال من احب ان يجلس من اهل العالية فليجلس من غير حرج - اهـ ديزل ج ٢ ص ١٧٢)

"উমর বিন আবদুল আযীয বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় একবার দু'টি ঈদের একত্রিত সমাবেশ ঘটে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আওয়ালীবাসীদের মধ্যে যারা ইচ্ছা করে তারা জুময়ার অপেক্ষায় বসতে পারে ; তবে চলে গেলে কোনো ক্ষতি নেই।"

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুরও অনুরূপ একটি ঘোষণা পাওয়া যায়। ইমাম শাফেয়ী রাহ্‌মাতুল্লাহ্ আলাইহি সে ঘোষণাটি কিতাবুল উম্মে নিজের সনদে উল্লেখ করেছেন ঃ

عن ابى عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال انه قد اجتمع لكم فى يومكم هذا عيد ان فمن احب من اهل العالية ان ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن احب ان يرجع فليرجع فقد اذنت له -(بذل المجهود - ج ٢ ص ١٧٢)

"ইবনে আযহারের মাওলা আবু উবাইদ বলেন ঃ একবার হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ঈদের নামাযে শরীক হই। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে নামায পড়ালেন। খোতবা দিলেন এবং বললেন ঃ আজ তোমাদের জন্যে দু'টি ঈদ একত্রিত হয়েছে। আওয়ালীবাসীদের মধ্যে যারা চায় তারা জুময়ার অপেক্ষায় বসতে পারে আর যারা চায় তারা চলে যেতে পারে। আমার পক্ষ থেকে তাদের জন্যে অনুমতি রইলো।"

উভয় রেওয়ায়েতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জুময়ার নামায না পড়ার অবকাশ প্রকৃতপক্ষে গ্রামবাসী ও আওয়ালীবাসীদের জন্যে ছিলো। মদীনা ও শহরবাসীদের জন্যে ছিলো না। ইমাম শাফেয়ী রাহ্‌মাতুল্লাহ্ আলাইহি এ দু'টি রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ্ বিন

www.pathagar.com

যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতের তানকীদ করতে গিয়ে বলেন ঃ

واذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الامام العيد حين تحل الصلوة ثم اذن لمن حضره من غير اهل المصر ان ينصرفوا ان شاؤا الى اهليهم ولا يعودون الى الجمعة والاختيار لهم ان يقيموا حتى يجمعوا او يعودوا بعد انصرافهم ان قدروا حتى يجمعوا وان لم يفعلوا فلا حرج ان شاء الله ـ

قال الشافعي ولا يجوز هذا الاحد من اهل المصران يدعوا ان يجمعوا الا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة وان كان يوم عيد ـ اهـ

"জুময়ার দিনে ঈদ হলে নামায পড়া জায়েয হওয়ার সময় হলেই ইমাম ঈদের নামায পড়াবেন। যারা আওয়ালীবাসী এবং শহরবাসী নয় তাদেরকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিবে। তারা যদি চলে যেতে চায় যেতে পারে, জুময়ার জন্যে আবার আসা প্রয়োজন নেই। আর ইচ্ছা করলে জুময়ার সময় পর্যন্ত শহরেই অপেক্ষা করতে পারে। অথবা ঘরে যাওয়ার পর জুময়ার জন্যে আসা সম্ভব হলে আসতেও পারে। না আসলে কোনো ক্ষতি নেই।

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঃ শহরবাসী কারো জন্যে জুময়ার নামায কোনো ক্রমেই ছেড়ে দেয়া জায়েয নয় ঈদের দিনে হলেও। তবে যাদের যুক্তিসংগত ওজর রয়েছে তাদের কথা আলাদা।

–(বজলুল মাজহুদ ঃ খঃ ২ পৃঃ ১৭২)

বলুন ! ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একথা উপরোক্ত তিনজন সাহাবীর ওপর তানকীদ নয় কি ? কুরআন ও হাদীসের আলোকে জুময়ার জন্যে যে সাধারণ শরয়ী বিধান নির্ধারিত আছে সে নিরিখে সাহাবীদের কথা ও মতকে পরখ ও যাঁচাই-বাছাই করা হয়েছে কিনা ? পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর প্রতিষ্ঠিত সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় তাদের রায়কে বর্জনযোগ্য মনে করা হয়েছে কিনা ? জবাব যদি হ্যাঁ বোধক হয়, তাহলে এ দাবী কিভাবে সংগত হতে পারে যে, সাহাবায়ে কিরাম সমগ্র উম্মতের জন্যে সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড এবং তাদের কথা-বার্তা ও মতামত সব ধরনের তানকীদ থেকে মুক্ত ও পবিত্র? এটা গোটা উম্মতের সর্বসম্মত আকীদা—এ দাবী কিভাবে করা যায় এবং প্রত্যেক সাহাবীর প্রতিটি কথা ও কাজ অবশ্য করণীয় একথার ওপর গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ঐকবদ্ধ্য ? উপরোক্ত তিনজন সাহাবীর অভিমত

www.pathagar.com

নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেবলমাত্র ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি করেছেন এমন নয় বরং হানাফীগণও তানকীদ করেছেন। দেওবন্দের কর্ম-কর্তাদের শিরোমণি ও ইমাম শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ অভিমতের ওপর যে সমালোচনা করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রায়

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথীদ্বয় যে হাদীসের ওপর ভিত্তি করে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন সে হাদীসটি ছিলো হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি এরূপ ঃ

قد اجتمع فی یومکم هذا عید ان فمن شاء جزاه من الجمعة وانا مُجَمِّعُونَ۔

"আজকে তোমাদের জন্য দু'টি ঈদের সমাবেশ ঘটেছে। যারা আজ জুময়ার নামায ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র ঈদের নামায পড়বে তাদের জন্যে এটা জায়েয। তবে আমরা জুময়া পড়বো।"

কিন্তু মুহতারাম মরহুম মাওলানা এ হাদীসটির এমন ব্যাখ্যা দান করলেন যা একদিকে উপরোক্ত তিনজন সাহাবীর ব্যাখ্যা থেকে ভিন্নতর, অপরদিকে তাঁদের মতামতের ওপর তানকীদ করাও বটে। হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন ঃ

اتفق ذالك فی عهد النبی صلی اللّه علیه وسلم بانه وافق یوم الجمعة یوم عید وكان اهل القری یجتمعون لصلوة العید ین مالایجتمعون لغیر هما كما هوا العادة فی اكثر اهل القری۔ وكان فی انتظار هم الجمعة بعد الفراغ من صلوة العید حرج علی اهل القری فلما فرغ رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم من صلوة العید نادی منادیه من شاء منكم ان یصلی فلیصل ومن شاء الرجوع فلیرجع وكان ذالك خطابا لاهل القری المجتمعین ثمّ۔

والقرینة علی ذالكَ انه قد صرح فیه بانا مجمعون۔ والمراد من جمع المتكلم فیه اهل المدینة فهذا یدل دلالة واضحة بان الخطاب فی قوله من شاء منكم ان یصلی الی اهل القری لا الی اهل المدینة ۔ ١ هـ

www.pathagar.com

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় একবার ঘটনাক্রমে জুমআ ও ঈদ একদিনে একত্রিত হয়ে যায়। গ্রামবাসীগণ অন্যান্য নামাযের তুলনায় দুই ঈদের নামাযে অধিকহারে উপস্থিত হয়ে থাকে। সাধারণ গ্রামবাসীদের এটাই অভ্যাস। ঈদের নামায পড়ার পর জুমআ পর্যন্ত অপেক্ষা করা তাদের জন্যে কষ্টকর। ঈদের নামায আদায় করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন ঘোষকের মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন যে, তোমাদের কেউ ইচ্ছা করলে এখানে অপেক্ষা করে জুমআর নামায পড়তে পার, আবার ইচ্ছা করলে নিজের গ্রামে ফিরে যেতে পারো। রসূলের এ ঘোষণা ছিলো উপস্থিত গ্রামবাসীদের জন্যে।"

একথার প্রমাণ হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন—"আমরা তো জুমআ পড়বো—এখানে 'আমরা' অর্থ মদীনাবাসী। এমনিভাবে من شاء منكم ان يصلى হাদীসের এ বাক্যাংশ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে গ্রামবাসীদেরকে মদীনাবাসীদেরকে নয়।

হাদীসের ব্যাখ্যায় মরহুম মাওলানার এ ভাষ্য। তিনজন সাহাবীর তানকীদ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

واما ابن عباس رضـ وابن الزبير فكانا اذ ذاك صغيرين غير انهما سمعا المنادى النداء باذ انهما وان لم يفهما ما اريد به فاخرابن الزبير صلوة العيد الى ماقبل الزوال وقدم الجمعة ولعله كان يرى جوار تقديم الجمعة على وقت الزوال كما يراه اخرون فصلى الجمعة وادخل فيه صلوة العيد فلذا لم يصل الظهر كما يدل عليه ظاهر الرواية ـ

وَاما ابن عباس فكان سمع باذنه ايضا مانودى به فى ذالك الوقت فلذا قال فيه انه اصاب السنة اى ما سمعته منه صلى اللّه عليه وسلم من قوله من شاء فليصل ـ اهـ

"তবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সময় শিশু ছিলেন। তাঁরা ঘোষকের ঘোষণা নিজ কানে শুনেছিলো। যদিও ঘোষণার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম ছিলেন না। ফলে ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈদের নামায সূর্য হেলে পড়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব করে এবং জুমআর নামায আগে এনে উভয় নামায একই সময়ে

এমনভাবে পড়তেন যেন ঈদের নামায জুময়ার নামাযে শামিল করে দিতেন। বাহ্যিক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনিও অন্যান্যদের মত জুময়ার নামায সূর্য হেলে পড়ার আগে পড়া জায়েয হওয়ার সমর্থক। এ কারণে তিনি সেদিন যোহরের নামায পড়েননি।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও সেদিন নিজ কানে নবীর ঘোষণা শুনে ছিলেন। সে জন্যে তিনি ইবনে যুবাইরের কাজ সম্পর্কে বললেন, "তিনি সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করেছেন। অর্থাৎ তিনি সে নির্দেশ মুতাবেক কাজ করেছেন যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি শুনেছি — কেউ চাইলে সে জুময়ার নামায পড়তে পারবে।"

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমতের ওপর মরহুম মাওলানা যে তানকীদ করেন তার সারমর্ম হলো— ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সময় ছোট থাকার দরুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর من شاء فليصل তাৎপর্য আদতে বুঝতেই পারেননি। এ "যে জুময়া ছেড়ে দিয়ে শুধু ঈদের নামায পড়তে চায় তা সে করতে পারে"—একজন ঘোষকের এ ঘোষণা মাত্র তাদের কানে প্রবেশ করেছিলো। ঘোষণাটি কাদের জন্য প্রযোজ্য এবং কারা এ ঘোষণার বহির্ভূত তা তাঁরা জানতেন না। এ কারণে তারা নিজেদের জ্ঞানানুযায়ী মনে করেছিলেন যে, সম্ভবত এ ঘোষণা শহরবাসী পল্লীবাসী আগত মেহমান সকলের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং তাঁরা এমন ক্ষেত্রে নিজেরা সে জ্ঞান মুতাবিক কাজ করেছেন এবং এ কাজকে সুন্নাত বলেছেন। অথচ রসূলের উদ্দেশ্য ছিলো গ্রামবাসী। অবকাশ ও অনুমতি তাদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিলো।

এটা কি সাহাবীদের ওপর তানকীদ করা নয়

এবার আপনি চিন্তা করে দেখুন ! এভাবে সাহাবীদের কথা ও কাজকে পরখ ও যাঁচাই-বাছাই তথা তানকীদ করা হয়েছে কি হয়নি ? যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কি ? আর যদি যাঁচাই-বাছাই হয়ে থাকে তাহলে সাহাবীদের তানকীদ করা নিষিদ্ধ এবং যারা তানকীদ করে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারিজ—একথা আপনারা কিভাবে বলতে পারেন ? ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ও মাওলানা মরহুমকে আপনারা কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারিজ মনে করেন নাকি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি ?

www.pathagar.com

তানকীদ করার জন্যে সমতার শর্ত দুর্বল অভিমত

বর্তমান যুগের কতিপয় আলেম সম্পর্কে শোনা যায় যে, তাদের মতে সাহাবীগণ নিজেরাতো একে অপরের তানকীদ করতে পারেন কিন্তু উম্মতের অন্য কেউ তাদের তানকীদ করতে পারেন না। অর্থাৎ তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী অথবা তাদের পরবর্তী যুগের কোনো আলেম, ইমাম, দীনের বিশেষজ্ঞ কারোরই দীনের ব্যাপারে সাহাবীগণের কোনো কথা বা কাজের তানকীদ করার কোনো অধিকার নেই যদিও তা তাদের ব্যক্তিগত কথা ও ইজতিহাদী ফায়সালাই হোক না কেন। কারণ, সমস্ত সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে সমভাবে শরীক ছিলেন এবং সাহাবা হওয়ার বিশেষণে একে অপরের সমান ছিলেন। সাহাবা হওয়ার বৈশিষ্ট্যে তাদের মধ্যে কেনো পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র নেই। সুতরাং দীনি মাসয়ালার ব্যাপারে একে অপরের তানকীদ করার অনুমতি পেতে পারেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের লোকগণ যতো বড় আলেম, ফাযেল, ইমাম, মুজতাহিদই হোক না কেউ যেহেতু তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি জ্ঞান লাভ করার ব্যাপারে তাঁদের সাথে শরীক নন এবং সাহাবা হওয়ার গৌরবও অর্জন করেননি এবং সাহাবীদের সমমর্যাদা সম্পন্ন হওয়া তো দূরের কথা তাঁদের চেয়ে অনেক গুণে নিম্ন স্তরের, সুতরাং দীনি মাসয়ালা ও প্রাসংগিক ব্যাপারসমূহে তাদের ওপর তানকীদ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? কেননা, সাহাবীগণ দীনের ব্যাপারে উম্মতের জন্য ইমাম ও কর্ণধার। তাদেরকে অনুসরণ করার জন্য সকল উম্মতের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। তানকীদ কেবল সে-ই করতে পারে যার জ্ঞান মর্যাদা ও অন্যান্য বিষয়ে যার তানকীদ করা হচ্ছে তার সমকক্ষ। একজন কম যোগ্যতা সম্পন্ন বরং অনেক নিম্নস্তরের লোক একজন উচ্চস্তরের যোগ্য লোকের তানকীদ জায়েয নয়।

ইল্‌ম, ফযিলত, বিদ্যা-বুদ্ধির পরিপক্কতায় সাহাবীদের সমকক্ষ বলে বিবেচিত হতে পারে উম্মতের মধ্যে কেউ এমন দাবী করতে পারে না। সুতরাং সাহাবীদের অথবা তাদের কোনো কথা বা সিদ্ধান্তের তানকীদ করার অধিকারও থাকতে পারে না যদি সেসব কথা ও সিদ্ধান্তসমূহ ব্যক্তিগত ও ইজতিহাদীও হয়।

দুর্বলতার কারণসমূহ

আমাদের মতে অভিমতটি যদিও মনমুগ্ধকর। কিন্তু দলীল ও বাস্তবতার আলোকে অভিমতটি শক্তিশালী নয় বরং দুর্বল এবং তাতে মনেও প্রবোধ আসে না। নিম্নবর্ণিত তিনটি কারণে আমরা এ মতটিকে দুর্বল মনে করি ঃ

www.pathagar.com

এক ঃ বিষয়বস্তুর সূচনায় আমরা একথা বলেছি যে, আলোচিত তানকীদ দ্বারা সাহাবায়ে কিরামদের খাটো করা কিংবা অবজ্ঞা করা অথবা কোনো অপবাদ দেয়া (মায়াযাল্লাহ) আদৌ আমাদের উদ্দেশ্য নয় ; বরং তাদের কথা ও ফায়সালাসমূহকে সার্বিকভাবে অবজ্ঞা বা উপক্ষো করাও আমাদের লক্ষ্য নয়। সাহাবীদের এ ধরনের তানকীদ করা নাজায়েয ও সম্পূর্ন হারাম।

আমরা আগেও বলেছি তানকীদ করার উদ্দেশ্য হলো সাহাবায়ে কিরামের ব্যক্তিগত কথা ও ইজতেহাদী ফায়সালা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে একথা অবহিত হওয়া যে, তাঁদের সেসব বক্তব্য ও ফায়সালা কুরআন-হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা ? সামঞ্জস্যশীল হলে গ্রহণযোগ্য হবে, অসামঞ্জস্যশীল হলে বর্জনীয় হবে। এ ধরনের তানকীদ সম্পর্কে শুরুতে যেসব দলীলের কথা বলা হয়েছে সেসব দলীলের প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক গাইরে মাসুম ব্যক্তির এমন তানকীদ করা জায়েয। এমনিভাবে প্রত্যেক এমন কথা ও ফায়সালাকে পরখ ও যাঁচাই-বাছাই বা তানকীদ করা যেতে পারে যেগুলো ভুল ও নির্ভুল উভয়টিই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেহেতু সাহাবায়ে কিরামগণও এ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নন—তারা নিজেরা মাসুম নন এবং তাদের বক্তব্য ও সিদ্ধান্তও ভুল বা নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং সাহাবীদের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত স্বতঃই তানকীদের আওতায় আসতে পারে। সে তানকীদ স্বয়ং সাহাবীগণ একে অপরের করুক কিংবা তাবেয়ী বা তাবে তাবেয়ীগণের মধ্য থেকে কেউ করুক। কেননা বিতর্কিত বিষয় এটা নয় যে, সম্মানিত সাহাবীদের কথা ও সিদ্ধান্তসমূহ কার তানকীদ করা থেকে মুক্ত আর কার তানকীদ থেকে মুক্ত নয়। বরং মতদৈততার বিষয় হলো স্বয়ং সম্মানিত পরম শ্রদ্ধেয় সাহাবীগণের এবং তাদের কথা ও ফায়সালাসমূহের মর্যাদা কি ? এগুলোকে পরখ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে কি পারে না ? আমরা প্রারম্ভে কুরআন ও হাদীসের যে দলীল এ প্রসংগে পেশ করেছি তাতে সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য ও ফায়সালাসমূহ তানকীদ করার আওতায় আসতে পারে। কেননা এ ধরনের তানকীদ থেকে কেবলমাত্র সেইসব ব্যক্তিত্বই মুক্ত হতে পারেন যারা স্বয়ং সত্য ও ন্যায়ে মানদণ্ড এবং যাদের বিরোধিতা করা নিষিদ্ধ। আর এ সম্মানে ভূষিত হতে পারে শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব ও রসূলের হাদীস। অন্য কারো কথা বা ব্যক্তিগত ফায়সালা নয়। কেননা তারা মাসুম হওয়ার সনদ প্রাপ্ত নন।

দুই ঃ এ মতামত দুর্বল হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, আমরা যখন তা বাস্তবের প্রেক্ষপটে অবলোকন করি তখন এটা দুর্বল বলে পরিলক্ষিত হয় এবং তাতে মনে প্রবোধ আসে না, তার সাথে ঐকমত্য হওয়াও সম্ভব নয়। কারণ, বাস্তবতার আলোকে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাবেয়ীন

www.pathagar.com

ও তাবে তাবেয়ীনগণ কথায় ও লিখায় সাহাবীদের ব্যক্তিগত কথা ও ইজতিহাদী ফায়সালাসমূহের ওপর এ ধরনের তানকীদ করেছেন। ছোটদের কলম ও ভাষায় বড়দের কাজ-কর্মের এরূপ তানকীদ করাকে কোনো অপরাধ বা অপমান মনে করা হয়নি এবং এটাকে খারাপ নজরেও দেখা হয়নি।

আগের আলোচনায় তানকীদের যেসব উদাহরণ পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে এমন উদাহরণও আছে যাতে সাহাবাদের পারস্পরিক তানকীদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার এমন উদাহরণও আছে যার মধ্যে তাবেয়ীন এবং তৎপরবর্তী আলেমগণের পক্ষ থেকে সাহাবীদের ব্যক্তিগত কথা ও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত-সমূহের ওপর তানকীদ করা হয়েছে। যেমন—হজ্জের সময় উমরার সাথে তামাত্তু করার ব্যাপারে হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিরীয় লোকটির সাথে কথপোকথনের মধ্যে স্বীয় পিতা ইসলামী দুনিয়ার দ্বিতীয় খলীফা ইল্‌ম ও আমলের শিরোমণি এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভংগীর সুস্পষ্ট তানকীদ ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন ঃ বিশ্বনবীর কাজ ও আমলের মুকাবিলায় আমার পিতা হযরত উমর রদিয়াল্লাহু আনহুর কথা অনুসরণযোগ্য নয়। এমনিভাবে ইহরামের আগে এবং ইহরাম খোলার পর তাওয়াফে যিয়ারাতের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করার ব্যাপারে হযরত সালেম স্বীয় পিতা হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং দাদা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর রায়ের স্পষ্ট তানকীদ করে বললেনঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় অবস্থাতেই সুগন্ধি ব্যবহার করতেন বলে উল্লেখ আছে। সুতরাং এরূপ করা জায়েয। বাপ দাদা উভয়ের কথা ও ইজতেহাদী রায় সে হাদীসের খেলাপ বিধায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইল্‌ম ও ফযিলাতের দিক দিয়ে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমকক্ষ কিংবা তাঁর চেয়ে বড় ছিলেন কেউ কি এমন কথা বলার সাহস করতে পারে ? অথবা হযরত সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা ও দাদা উভয়ের চেয়ে বড় আলেম কিংবা তাদের সমকক্ষ ছিলেন এমন কথা কি চিন্তাও করা যায় ? না, কখনো নয়।

তাছাড়া অধিক মোহর গ্রহণ করা প্রসংগে একজন সাধারণ মহিলা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তানকীদ করেছিলেন। পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলামুখী হওয়া প্রসংগে হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ের রায়ের হানাফী মুফতীগণ প্রকাশ্য সমালোচনা করে সে রায় ত্যাগ করেন। দু' ঈদের একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে ইবনে আব্বাস

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং যায়েদ বিন আরকামের সিদ্ধান্তের ওপর শাফেয়ী ও হানাফী সকলেই তানকীদ করেন। এসব ঘটনা দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, সাহাবীদের পরবর্তী যুগের তাবেয়ীন ও অন্যান্য ইমাম, মুজতাহিদ ও আলেম সকলেই ছোটখাটো মাসয়ালার ব্যাপারে সাহাবীদের ব্যক্তিগত কথা ও ইজতিহাদী ফায়সালাকে যাঁচাই-বাছাই ও পরীক্ষা -নিরীক্ষা করেছেন ? জবাব যদি হ্যাঁ বোধক হয়, এবং অবশ্যই তা হ্যাঁ বোধক হবে, তাহলে যারা তানকীদ করার জন্য ইলম ও ফযিলতের দিক দিয়ে সমান হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন তাদের এ অভিমতকে দুর্বল একথা বলতে কোনো দ্বিধা থাকতে পারে কি ?

তিন ঃ এটাও একটি অনস্বীকার্য সত্য যে, বর্তমান ইসলামী বিশ্বে চারটি মযহাবের যে ফিকহী বিধান চালু আছে এবং ফকীহদের রচনাবলীতে প্রত্যেক মযহাবের মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন, খুঁটিনাটিসহ সবিস্তারে সংকলিত আকারে পাওয়া যায়, তাতে আমরা দেখতে পাই যে, ইমামগণও একে অপরের ইলমী আলোচনা সমালোচনা করেছেন। মযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন অনেক চিন্তাশীল ও মুহাক্কিক আলেমেরও আবির্ভাব হয়েছে যারা তাদের অনুকরণীয় মযহাবের ইমামের ইজতিহাদী ফতওয়ার ওপর কুরআন ও হাদীসের আলোকে সুস্পষ্ট তানকীদ করেছেন। অধিকন্তু কোনো কোনো ইমামের ফতওয়াকে অপর কোনো ইমামের মুকাবিলায় প্রাধান্য পাওয়ার উপযোগী মনে করা হয়েছে। তাহলে আমরা কি বিশ্বাস করতে পারি যে, তারা সকলেই ইলম ও ফযিলতে একে অপরের সমান সমান ছিলেন ? অথবা ইমামদের অনুসারী আলেমগণ ইমামদের ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে সমকক্ষতার দাবী বলতে পারে ? অথবা এ ধরনের তানকীদ করাকে কেউ অপমান মনে করেছেন ?

মোটকথা, তানকীদ বা সমালোচনার বৈধতার জন্য ইলম ও ফযিলতের দিক দিয়ে সমান হওয়ার শর্ত আরোপ করা মূল বিষয়বস্তুর আলোকে অবশ্যই একটি দুর্বোধ্য শর্ত। কেননা দোষ-ত্রুটি অন্বেষণের অর্থে যে তানকীদ তা হারাম এবং নিষিদ্ধ। এজন্য ইসলামী শরীয়াতে আদৌ কোনো অবকাশ নেই। এ ক্ষেত্রে ইলম ও ফযিলতে সমান হওয়া ও না হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নবী নন এমন কারো কথা ও কাজ শরীয়তী দলীলের ভিত্তিতে যাঁচাই-বাছাই ও পরখ করার পরে গ্রহণ কিংবা বর্জন করা যে তানকীদ সে সম্পর্কে মূল বিষয় এ সাক্ষ্য দেয় যে, এখানে সমান হওয়ার কোনো শর্ত নেই। বরং ছোটরাও বড়দের তানকীদ করতে পারে এবং করে আসছে। কেউ ছোটদের এ তানকীদকে অপমান বা অবমূল্যায়ন করেনি। এমনিভাবে সম্মানিত সাহাবীদের ব্যক্তিগত অভিমত এবং ইজতিহাদী রায়সমূহ সম্পর্কে গোটা মুসলিম জাতির স্বীকৃত মত

www.pathagar.com

হলো—আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসের মুকাবিলায় তাদের ব্যক্তিগত কথা ও রায় কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য নয়। "কাউকে তানকীদ করা থেকে উর্ধে মনে করো না" জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ৬নং ধারার একথাটির তাৎপর্য এটাই।

তানকীদ প্রসংগে আরো ব্যাখ্যা

বিষয়টির অধিক ব্যাখ্যা এবং সহজে বুঝার জন্য এর সম্পূর্ণ অংশ এবং বিষয়টির হুকুম-আহকাম সবিস্তারে বর্ণনা করা এবং প্রতিটি অংশের আলাদা আলোচনা করা জরুরী যাতে বিষয়বস্তুর প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ঘাটন হয়ে যায়।

এক ঃ আলোচ্য বিষয়ের প্রথম অংশ হলো—কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার অধ্যায়ে সম্মানিত সাহাবীদের মর্যাদা কি ? তারা এ বিষয়ে সব ধরনের তানকীদ করা থেকে মুক্ত অথবা তারাও তানকীদের আওতায় আসতে পারেন ?

দুই ঃ দ্বিতীয় অংশ হলো—আমাদের কাছে তাদের পেশকৃত দীনের মৌলিক আহকাম ও আকীদাগত বিষয়সমূহ এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত বিষয় অথবা মৃত্যুর পরপারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের কথা তানকীদের ক্ষেত্র হতে পারে কি পারে না ? অন্যভাবে বলা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এসব বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে তাদের তানকীদ করা যায় কি যায় না ?

তিন ঃ দীনের বিস্তারিত বিধান এবং পূর্ণাংগ চিত্র যার মধ্যে সামগ্রিকভাবে আকায়েদের যাবতীয় বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত এবং আমলেরও বাস্তব বিশ্লেষণ, ইবাদাত এবং লেনদেনও অন্তর্ভুক্ত। নীতিমালা এবং নৈতিক বিধানও অন্তর্ভুক্ত আছে এবং অন্যান্য বিভাগ।

দীনের এ বিস্তারিত বিধান এবং পূর্ণাংগ চিত্র যা সাহাবায়ে কিরামগণ বিস্তারিতভাবে গোটা উম্মতের সামনে হাতে কলমে পেশ করেছেন সেগুলোতে তাদের মর্যাদা কি ? তাদের এসব বিবরণ গোটা উম্মতের জন্যে নির্ভরযোগ্য কিনা এবং তাদের পেশকৃত বিস্তারিত নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে অনাগত উম্মতগণ কোনোরূপ হস্তক্ষেপ বা পরিবর্তন করার অধিকার রাখে কিনা অথবা এ ব্যাপারে তারা সমালোচনার মুখোমুখী হতে পারে কিনা কিংবা ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে দীনের বিস্তারিত বিধানের মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের পরিবর্তন ও হস্তক্ষেপ করতে পারে কি ? এবং এ পরিকল্পনার আংশিক কিংবা সার্বিক পরিবর্তন পরিবর্ধন নিজের পক্ষ থেকে করবে কিংবা সাহাবীদের পেশকৃত দীনি নিয়মকে তানকীদ করে ত্যাগ করে দিবে ?

www.pathagar.com

চার ঃ বিষয়টির শেষ ও চতুর্থ অংশ হলো—সম্মানিত সাহাবীদের ব্যক্তিগত উক্তি ও ইজতিহাদী সিদ্ধান্তসমূহ। যেগুলো তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেননি এবং নবীর সাথে তারা সেগুলোক সুস্পষ্টভাবে সম্পর্কিতও করেননি, বরং জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে ও ক্ষেত্রে সেগুলো তাদের ব্যক্তিগত কথা এবং ইজতিহাদী ফায়সালা হিসেবে উম্মতের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, সেসব বিষয়ে তাদের স্থান কোথায় ? তাদের এসব ব্যক্তিগত কথা ও ইজতিহাদী ফায়সালাসমূহ তানকীদ যোগ্য না কোনো অবস্থায় তার তানকীদ করা যাবে না, বরং সর্বাবস্থায় এগুলো উম্মতের জন্যে অবশ্য অনুসরণীয়। বর্ণিত এ চারটি অংশের হুকুম নিম্নে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হলো।

আহকাম

প্রথম অংশের হুকুম ঃ প্রথম অংশটি কুরআন ও হাদীস রেওয়ায়েত সম্পর্কিত। সাহাবীগণ এ বিষয়ে কখনো তানকীদের পাত্র হতে পারেন না। বরং তাঁরা এ বিষয়ে সব ধরনের তানকীদ থেকে মুক্ত। গোটা উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে সংরক্ষিত কুরআন বর্ণনা করেছেন তার শতকরা একশ ভাগই সঠিক। বর্ণনার ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে বিন্দু পরিমাণও পরিবর্তন পরিপূর্ণ হয়নি। এ ব্যাপারে যে-ই সাহাবীদের তানকীদ করবে তার ঈমান বিপন্ন হবে। কেননা, এ বিষয়ে তানকীদ করার অর্থ হলো মুতাওয়াতের বা পরম্পরাগতভাবে বর্ণিত বিষয়ে সন্দেহ করা। আর মুতাওয়াতের বিষয়ে সন্দেহ করার সাথে ঈমান বহাল থাকতে পারে না। এমনিভাবে হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারেও সাহাবীগণ তানকীদ করা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কেননা, সমস্ত সাহাবীগণ আদেল-ন্যায়নিষ্ঠ একথার ওপর গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত একমত। হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণের যদি কখনো হাদীসের রাবীদের সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরী হয়ে পড়ে তাহলে সমগ্র রাবীদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কঠোর তানকীদ করা হয়। জারাহ্ ও তা'ছীল তথা যাঁচাই-বাছাই ও নিরীক্ষার মাধ্যমে এ চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়। চোখ বুজে কারো কথা গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু সম্মানিত সাহাবীগণ কখনো এমন আলোচনার আওতায় আসেন না এবং তাদেরকে অন্যান্য রাবীদের মতো এক্ষেত্রে তানকীদও করা হয় না। বরং তাদের সম্পর্কে হাদীসশাস্ত্রের সমস্ত ইমামের অভিমত হলো الصحابة كلهم عدول সমস্ত সাহাবাই আদেল বা ন্যায়বান—তবে তাদের মাধ্যমে যখন কোনো বিষয়ে ভিন্ন ও বিপরীতার্থক হাদীস বর্ণিত হয় তখন বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেয়ার জন্যে সাহাবীদের বিষয়টি আলোচনায় আনা

www.pathagar.com

হয় এবং নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে তাদের সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে বলা হয় যে, অমুক সাহাবীর মর্যাদা যেহেতু অমুক সাহাবীর চাইতে বেশী, অতএব তার রেওয়ায়েত অমুকের রেওয়ায়েতের তুলনায় প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। অথবা তিনি অন্য সবার তুলনায় অধিকতর জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। সুতরাং তার বর্ণনা প্রাধান্য পেতে পারে। বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মধ্যে প্রাধান্য দেয়ার বেলায় এমনিভাবে মর্যাদা, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা, ন্যায়নিষ্ঠতা, ধারণ, হিফজ (সংরক্ষণ) ইত্যাদি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত সুকুমার বৃত্তির বিভিন্নতার ভিত্তিতে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু তাদেরকে এরূপ বলে আদৌ তানকীদ করা হয় না যে, একজন নির্ভরযোগ্য, আদেল অপরজন অনির্ভরযোগ্য ন্যায়নিষ্ঠায় (মায়াজাল্লাহ) অথবা একজন সাহাবীর মূলত কোন ক্রটি নেই আর অন্যসব সাহাবীর অমুক অমুক ক্রটি রয়েছে। সুতরাং দোষ মুক্ত সাহাবী হাদীস অন্যদের হাদীস থেকে প্রাধান্য পাওয়ার অধিকতর যোগ্য।

দ্বিতীয় অংশের হুকুম ঃ উসূলে দীন বা দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ আকীদাগত বিষয়সমূহের রেওয়ায়েতের ব্যাপারেও সাহাবীগণ সব ধরনের তানকীদ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কেননা, উসূলে দীন ও আকিদাগত বিষয়ের উৎস হলো প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল এবং নিশ্চিত আহকাম। দীনের উসূল এবং আকীদাগত বিষয়ের মূলনীতি নির্ধারণ করা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারো কাজ নয়। বরঞ্চ গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় এ কাজ প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহর। আর নবী আলাইহিস সালাম আল্লাহর একজন খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে এ ব্যাপারে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাত্র। সুতরাং দীনের এসব উসূল এবং আকীদাগত বিষয় প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল এবং নিশ্চিত আহকামের ওপর নির্ভরশীল। সন্দেহাতীত ও নিশ্চিত সত্য কখনো তানকীদ বা সমালোচনার বস্তু হতে পারে না। এ বিষয়ে যেই তানকীদ করার ধৃষ্টতা দেখাবে তার সম্পর্ক সত্যপন্থীদের থেকে ছিন্ন হয়ে বাতিল পন্থীদের সাথে মিলিত হবে। সত্যপন্থী জামায়াতের সাথে সে কখনো শামিল হতে পারবে না। খাওয়ারেজ, মুতাযিলা এবং অন্যান্য বাতিল ফির্কাসমূহ এ ধরনের তানকীদ করার ফলেই জন্ম লাভ করেছে।

তৃতীয় অংশের হুকুম ঃ দীনের ব্যাপক নক্শা এবং বিস্তারিত বিধান যা সম্মানিত সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গ্রহণ করে উম্মতের সামনে পেশ করেছেন, যার মধ্যে আকীদা, দীনের ফরায়েয, ইবাদাতের পদ্ধতিসমূহ, চারিত্রিক ও নৈতিক নীতিমালা এবং দীনের অপরাপর শাখা-প্রশাখা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয়েও সাহাবীগণ কস্মিনকালেও তানকীদ

www.pathagar.com

করার পাত্র হতে পারেন না। কারণ, দীনের এ ব্যাপক চিত্র এবং পূর্ণাংগ বিধান স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তাঁর ২৩ বছরের জীবনে সুবিন্যস্ত হয়েছে।

সাহাবীগণ তা শুধুমাত্র রক্ষিত আকারে উম্মতের সামনে পেশ করেছেন। নিজেদের পক্ষ থেকে এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেননি। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যে রূপরেখা গঠিত হয়েছিলো হুবহু সেভাবেই পেশ করেছেন। এখন যদি এ ব্যাপারে সাহাবীগণ তানকীদ করার ক্ষেত্র ও পাত্র হন তাহলে একদিকে দীনের ওপর থেকে আস্থা উঠে যাবে অন্যদিকে সাহাবীদের পেশকৃত দীনি বিধানাবলীর ওপর তানকীদ করার কারণে যে কোনো ফিতনাবাজ লোক নিজের পক্ষ থেকে তার মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে থাকবে। যার ফলে দীনের আসল চেহারাই বিকৃত হয়ে যাবে। এবং কিয়ামত পর্যন্ত দীন একটি অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

অবশ্য নতুন পরিস্থিতি ও নতুন ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে কিয়াস ও ইজিতহাদের মাধ্যমে আহকাম উদ্ভাবন করা যায়। শরীয়াতের স্পষ্ট বিধান থেকে বিধানবিহীন ক্ষেত্রের জন্যে আহকাম গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে শর্ত হলো—ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে এবং দীনের মৌলিক নীতির মধ্যে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় হজ্জ, রোযা, নামায এবং যাকাত আদায়ের ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা ও কাজের মাধ্যমে যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন এবং সাহাবীগণ আমাদেরকে যে পদ্ধতির কথা বলেছেন অথবা নৈতিকতার যে নিয়মাবলী এবং দীনের অপরাপর শাখার যে বিস্তারিত বিবরণ সাহাবীগণ রসূলের আদর্শের আলোকে পেশ করেছেন, এগুলোর ওপর কোনো ব্যক্তি বা দল তানকীদ করতে পারবে না এবং নিজের পক্ষ থেকে এগুলোর মধ্যে কোনো রদ বদল করারও অধিকার কারো নেই। এ ব্যাপারে সাহাবীগণ সব ধরনের তানকীদ থেকে মুক্ত ও পবিত্র এবং সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড বটে। এসব ব্যাপারে তাদের অনুসরণ ও বিরোধিতা করার মাধ্যমে পরিচয় পাওয়া যাবে হক ও বাতিলের। যারা এ ব্যাপারে সাহাবীদের অনুসরণ করবে তারাই হক ও সত্যপন্থী। আর যারা তাঁদের পেশকৃত দীনি উসূল থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করবে তাদেরকে বাতিল পন্থী বলে গণ্য করা হবে। উম্মতের দল উপদলে বিভক্তির সময় যারা নিজেদের জীবনে সাহাবীদেরকে অনুসরণ করবে এবং আমার তরীকার অনুসারী হবে তারাই সত্য ও ন্যায়ের পরিচয় বহনকারী। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরোক্ত বাণীর এটাই তাৎপর্য।

www.pathagar.com

ستفترق امتی علی ثلث وسبعین ملة كلهم فی النار الا واحدة قيل من هی يا رسول الله ؟ قال الذين هم على انا عليه واصحابی - (اوكما قال) (ترمذی)-

"আমার উম্মত ৭০ ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এর একটি মাত্র ভাগ ছাড়া সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, সেটি কোন্ দল ? তিনি বললেন ঃ যারা আমার এবং আমার সাহাবাদের পেশকৃত বিধানের অনুসরণ করে।"

৪র্থ অংশের হুকুম ঃ প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ অংশ হলো সে বিষয় যা আমাদের আলেমগণের কাছে 'সাহাবাদের তানকীদ' শিরোনামে পরিচিত ও খ্যাত। এবং যা প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসেবে চলে আসছে এবং মতবিরোধ পূর্ণ বিষয় হিসেবে আজও তা চালু আছে। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে আলেমগণ বিভিন্ন চিন্তা ও দৃষ্টিভংগীর প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তারা নিজেদের দৃষ্টিভংগীর সমর্থনে বিভিন্ন ধরনের দলীল-প্রমাণাদি পেশ করেন। এ ধরনের বিরোধপূর্ণ বিষয়ে একাধিক দল ও মতের মধ্য থেকে একটির সাথে ঐকমত্য ও অপরাপরগুলোর সাথে মতানৈক্যও করা যায়। দলীলের ভিত্তিতে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্যও দেয়া যায়। উসূলে ফিকাহের আলেমদের ব্যাখ্যার আলোকে আমরা নিম্নে এ বিষয়টির গবেষণা তুলে ধরছি। পরিশেষে আমরা আমাদের মতে গ্রহণীয় কথারও উল্লেখ করবো।

সাহাবীদের তাকলীদ প্রসংগ

সাহাবীদের কথা সম্পর্কে উসূলে ফিকাহবিদ আলেমগণের মতপার্থক্য বর্ণনা করার আগে এ বিষয়ের প্রকারগুলোর বর্ণনা করা জরুরী মনে করি যাতে জানা যায় যে, আলেমদের মধ্যে বিরোধপূর্ণ বিষয় কোন্‌টি এবং কি ধরনের ফায়সালা ? আর যে বিষয় আলেমদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই বরং তা দলীল হওয়া অথবা না হওয়ার সম্পর্কে মোটামুটি ঐকমত্য আছে সেটাই বা কোন্ ধরনের কথা ?

সাহাবীদের কথা ও উক্তির প্রকারভেদ

সাহাবীদের কথা কতিপয় ভাগে বিভক্ত। এক প্রকারের কথা ইজমায়ে সাহাবার মর্যাদাসম্পন্ন। যেমন ঃ কোনো ব্যাপারে একজন সাহাবা ফতওয়া দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং অন্য সাহাবীগণ সে সিদ্ধান্তের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন এবং প্রকাশ্যে তা সঠিক বলে গ্রহণ করলেন। এমতাবস্থায় এ সিদ্ধান্তটিকে কেবল একজন সাহাবীর কথা বা সিদ্ধান্ত বলা

www.pathagar.com

যাবে না। বরং একথাটিকে সাহাবীদের একটি সামষ্টিক কথা এবং ঐকবদ্ধ্য সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করা হবে। একথার হুকুম ইজমায়ে সাহাবীর হুকুমের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ সর্বসম্মতিক্রমে তা হুজ্জত বা দলীল হবে এবং গোটা উম্মতের জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশ হিসেবে গণ্য হবে। এমন ধরনের কথার ওপর তানকীদ করার অধিকার মূলত কারো নেই। আর এরূপ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করাও কারো জন্যে জায়েয হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার হলো সেইসব কথা ও ইজতিহাদী ফায়সালা যেগুলো কুরআন ও হাদীসের খেলাফ বলে নিশ্চিতরূপে জানা যায়। এ ধরনের ব্যক্তিগত কথা ও গবেষণালব্ধ ফায়সালা গোটা উম্মতের সম্মিলিত মতানুযায়ী দলীল এবং অনুসরণযোগ্য নয় বরং সর্বসম্মতিক্রমে কুরআন ও হাদীসের মুকাবিলায় অবশ্যই পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়।

তৃতীয় প্রকার সেসব কথা ও ইজতিহাদী ফায়সালা যা সাধারণ সাহাবীদের কাছে খ্যাতি হয়েছে, কিন্তু কেউ এর বিরোধিতা করেনি, বরং সকলেই এ ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করেন। এ ধরনের ব্যক্তিগত কথা আলেমদের মতে হুজ্জত হতে পারে যদিও এগুলোর ওপর একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাতিবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 'আলমুয়াফিকাত' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত আলেম আবদুল্লাহ দারাজ দিময়াতী এ ধরনের কথা সম্পর্কে লিখেছেনঃ

اذا اشتهر ولم يخالفه احد هل يكون حجة فقط ام يعتبر احماعًا ؟ فيه خلاف۔

"যখন সাহাবার কথা কোনো ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং কেউ এর বিরোধিতা না করে তখন একথাটি কি কেবল হুজ্জতই হবে নাকি ইজমাও ঘোষণা করা যেতে পারে? এ বিষয় আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন।"
-(খঃ ৪ পৃঃ ৭৪)

খুব সম্ভব এ ইজমা 'নসসে সুকুতী' হওয়ার কারণে ইজমা হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ ধরনের কথার ইজমা হওয়াকে স্বীকার করেন না যদিও হানাফীগণ এটাকে ইজমা হিসেবেই গ্রহণ করে থাকেন।

সাহাবীদের চতুর্থ প্রকার কথা বা বক্তব্য হলো অন্যসব সাহাবীগণ যে বিষয়টির বিরোধিতা করেছেন। অর্থাৎ একটি ঘটনা সম্পর্কে সাহাবীদের দু'টি ভিন্নমুখী উক্তির উল্লেখ থাকলে পরবর্তী সময়ের ইমাম ও মুজতাহীদগণ সে উক্তিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ বা বর্জন করবে। যাচাই-বাছাই ও

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর যে কথাই কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবে সে কথাকে অন্য কথার ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। এখানে যেমন তানকীদ করার নিয়মাবলী পালন করা হবে এবং কুরআন ও হাদীসের কষ্টিপাথরে পরখ করার পর যে কথা প্রনিধানযোগ্য প্রমাণিত হবে তাই অগ্রাধিকার পাবে।

এমন অবস্থা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঃ

والمنقول عن الشافعى رح انه يجوز له تقليد الصحابى بشرط ان يكون ارجح نظره ممن خالفه صنهم والا تخير۔

"ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে—মুজতাহিদ নয় এমন লোকের জন্যে সাহাবীর তাকলীদ করা জায়েয। তবে শর্ত হলো তার দৃষ্টিতে সে কথাটি প্রতিপক্ষদের কথার চেয়ে অধিকতর অগ্রাধিকার যোগ্য হতে হবে। অন্যথায় যা ইচ্ছা তাই গ্রহণ করতে পারবে।"

সাহাবীদের যে কথা ও উক্তির বিপরীত কোনো কথা বা উক্তি খ্যাত ও পরিজ্ঞাত নয় এবং সে কথাটি সাহাবীদের মধ্যে প্রসিদ্ধিও লাভ করেনি—এমন কথাই সাহাবীদের কথার ৫ম ও শেষ প্রকার। এ শেষ প্রকার সম্পর্কে আলেমগণ যথেষ্ট মতবিরোধ করেছেন। নিম্নে মতভেদগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো ঃ

মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব

প্রথম মাযহাব ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে সাহাবীর কথা বা উক্তি হুজ্জত (দলীল) এবং অবশ্য অনুসরণীয় তা কিয়াস প্রসংগে হোক কিংবা এমন প্রসংগের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক যা যুক্তিগ্রাহ্য এবং কিয়াস থেকে নয়। এ উভয় অবস্থাতেই সাহাবীদের কথার তাকলীদ করা জরুরী। এর মুকাবিলায় কিয়াসের অনুসরণ করা জায়েয হবে না। হানাফী মতাবলম্বী আবু সায়ীদ বোরদায়ীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতেও উভয় অবস্থাতে সাহাবার কথার তাকলীদ করতে হবে। কিয়াসের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী হলে কিয়াসের ওপর কাওলে সাহাবীকে প্রাধান্য দিতে হবে।

ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অভিমতও প্রায় ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতের অনুরূপ। উভয়ের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। তাদের মতেও উভয় অবস্থাতেই সাহাবার কথার ওপর আমল করা ওয়াযিব। সাহাবীর কথার মুকাবিলায় কিয়াস বা অনুমানের ওপর আমল করা কোনো মুজতাহিদের জন্যই জায়েয নয়।

www.pathagar.com

উপরোল্লেখিত মতামতের স্বপক্ষের দলীলগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা এবং বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার জন্যে এর সেসব দলীলের ইলমী তানকীদ করা হয়েছে সেগুলোরও উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না।

হাম্বলী ও মালেকী মাযহাবের দলীলসমূহ

মালেকী মাযহাবপন্থী ইমাম শাতেবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 'আল মুওয়াফিকাত' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় সুন্নাত অনুচ্ছেদে 'নবম মাসয়ালা' শিরোনামে এ প্রসংগটির উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

سنة الصحابة سنة يعمل عليها ويرجع اليها ومن الدلائل على ذالك امور-

احدهما ثناء الله عليهم ومدحهم بالعدالة كقوله تعالى كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ- وقوله وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا كُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوا شُهَدَاءِ عَلَى النَّاسِ- الايه

ففى الاولى اثبات الا فضلية على سائر الاهم- وذالك يقضى باستقامتهم فى كل حال ..... وفى الثانية اثبات العدلة مطلقًا وذالكَ يدل على مادلت عليه الاولى- اهـ

"সাহাবীদের সুন্নাতও এক প্রকার সুন্নাত যা পালন করতে হবে এবং সেদিকে রুজু করতে হবে। এর কতিপয় দলীল আছে—প্রথমত, আল্লাহ তায়ালা তাদের গুণের কথা বলেছেন এবং ন্যায়ের সাথে তাদের প্রশংসাও করেছেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমারা উম্মতের সর্বোত্তম জাতি যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে।" আরো বলেছেন ঃ "এমনিভাবে তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানানো হয়েছে যাতে তোমরা লোকদের জন্যে সাক্ষী হতে পারো।"

প্রথম আয়াতে সমগ্র উম্মতের ওপর তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলতের কথা বলা হয়েছে এবং তাঁরা সর্বাবস্থায় হক ও ন্যায়ের ওপর সুদৃঢ় এ বিষয়টিও আয়াতে পাওয়া যায়। এর দ্বিতীয় আয়াতে তাঁদের পরিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠতা ও সত্যবাদিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে এ আয়াতটিতেও প্রথম আয়াতটির সমর্থন পাওয়া যায়। এ দলীল দ্বারা ইমাম শাতেবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তাহলো ঃ

واذا كان كذالك فقولهم معتبرو عملهم مقتدى به- اهـ

www.pathagar.com

"সাহাবীদের মর্যাদা যখন এই তখন তাঁদের কথা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হবে এবং তাদের কাজ অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।"

তিনি তার এ দাবীর স্বপক্ষে অন্য একটি দলীল পেশ করেছেন এভাবে ঃ

والثانی ما جَاء فی الحدیث من الامر باتباعهم وان سنتهم فی طلب الا تباع کسنة النبی صلی اللّه علیه وسلم قال علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدئین تمسکوابها وعضوا علیها بالنواجد وقال علیه السلام تفترق امّتی علی ثلث وسبعین ملة کلهم فی النار الاملة واحدة قالوا من هم یارسول اللّه ؟ قال ما انا علیه واصحابی ۔

ویروی فی بعض الاخبار اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم ۔ ١هـ

"দ্বিতীয় দলীল হলো—হাদীসে তাঁদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশ এসেছে এবং তাঁদের সুন্নাতকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মতো অনুসরণ করার দাবী রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার সুন্নাতের অনুসরণ করা অপরিহার্য এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণও জরুরী। তাঁদের সুন্নাত অনুযায়ী আমল করো এবং দৃঢ়তার সাথে সে পথ আঁকড়ে ধরো। নবী আলাইহিস সালাম আরো বলেছেন ঃ আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে তাদের একদল ছাড়া সকলেই জাহান্নামী হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! সে দলের লোক কারা ? তিনি বললেন ঃ যারা আমার ও আমার সাহাবীদের পথের অনুসরণ করবে।" কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "আমার সাহাবীগণ নক্ষত্ররাজির মতো উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় তাঁদের যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।"

তৃতীয় দলীল ঃ

والثالث ان جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجیح الاقاویل فقد جعل طائفة قول ابی بکر وعمر حجة ودلیلا وبعضهم عد قول الخلفاء الاربعة دلیلا وبعضهم یعد قول الصحابة علی الا طلاق حجة ودلیلا .... وما ذالك الا لما اعتقد وافی نفسهم وفی مخالفیهم من تعظیمهم وقوة مأخذهم دون غیرهم وکبر شانهم فی الشریعة وانهم مما یحب متابعتهم وتقلیدهم ۔ ١هـ

"তৃতীয় দলীল হলো জমহুর আলেম যখন ভিন্ন ভিন্ন উক্তির মধ্যে যে কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দেন তখন প্রথম অগ্রাধিকার দেন সম্মানিত

www.pathagar.com

সাহাবীদেরকে। একদল আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কথাকে হুজ্জত ও দলীল মনে করেন। আবার অন্য আলেমদের মতে খলীফা চতুষ্টয়ের কথা দলীল হিসেবে গণ্য। কারো মতে সাহাবীদের কথা সাধারণভাবে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য। সমস্ত সাহাবীগণ সম্পর্কে গোটা আলেম সমাজের অত্যন্ত ভক্তি ও অগাধ বিশ্বাস পোষণ করার কারণেই তাদের সম্পর্কে উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মযবুত দলীলসমূহের স্বীকৃতি এবং শরীয়াতে তাদের উচ্চাসনের সমর্থন আমাদের ওপর সাহাবীদেরকে অনুসরণ ও তাকলীদ করা এ উভয়টিই ওয়াজিব করে দেয়। তারপর ইমাম শাতেবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর সমর্থনে চতুর্থ ও শেষ দলীল এভাবে পেশ করেন ঃ

والرابع ما جاء في الاحاديث من ايجاب محبتهم وذم من ابغضهم وان من احبهم فقد احب النبى صلى اللّه عليه وسلم ومن ابغضهم فقد ابغض النبى صلى اللّه عليه وسلم وما ذاك الالشدة متابعتهم له والعمل لسنة مع جماية ونصرته ومن كان بهذا المثابة فهو حقيق بان يتخذ قدوة ويجعل سيرته قبلة ـ ١هـ (ج ٤ ص ٨٠)

"চতুর্থ দলীল হলো, হাদীসে গোটা উম্মতের সাহাবীদের সাথে মহব্বত রাখা অপরিহার্য করা হয়েছে এবং তাদের সাথে বিদ্বেষ রাখা নেহায়েত ঘৃণিত কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে। যারা তাদের সাথে মহব্বত রাখে তারা যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই মহব্বত রাখলো। আর যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তারা প্রকারান্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই বিদ্বেষ পোষণ করে। সাহাবা কিরাম এ মর্যাদা শুধু এ কারণে লাভ করেছেন যে, তাঁরা ছিলেন রসূলের একান্ত অনুগত। তারা রসূলের সুন্নাতের অনুসারী, সর্বাবস্থায় সাহায্যকারী ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। এ কারণেই তাঁরা নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার যোগ্য হন এবং তাদের জীবন চরিত অনুকরণ ও অনুসরণীয়।

ইমাম শাতেবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ চারটি দলীল ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মযহাবের সমর্থনে পেশ করেছেন। সাহাবীদের ব্যক্তিগত কথা এবং ইজতিহাদী ফায়সালা সাধারণভাবে দলীল হওয়ার যোগ্য এবং তাঁরা সব ধরনের তানকীদ থেকে মুক্ত এ দাবী উপরোক্ত দলীলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখিত দলীলগুলোর সমালোচনায় আলেমগণ যে মন্তব্য পেশ করেছেন তা নিম্নে বর্ণিত হলো।

www.pathagar.com

উপরোল্লেখিত প্রতিটি দলীল সম্পর্কে আলেমদের পক্ষ থেকে ইল্‌মী তানকীদ বা যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। ১ম ও ২য় দলীল সম্পর্কে "আল-মুয়াফিকাত" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় শায়খ আবদুল্লাহ দারাজ দিময়াতী নিম্ন বর্ণিত সমালোচনা করেছেন ঃ

صفاد الدليل الاول والثانى ان المراد السنة العملية اى اذا عمل الصحابة عملا لم ينقل لنا فيه سنة عن الرسول لاموا فقة ولا مخالفة فانا نعد هذا كسنة النبى صلى اللّه عليه وسلم ، ونقتدى بهم فيه - وعلى هذا يكون قوله فيما بعد ، فقو لهم معتبر وعملهم مقتداى به المراد بالقول القول التكليفى كما اذا رأينا الصحابى فى الحج مثلا يكبر او يلبى فى مكان مخصوص ، وليس المراد القول بمعنى الراى والا جتهاد - والا فمجرد المدح بالعدالة فى الديل الاول والاخر باتباع سنتهم فى الدليل الثانى لايفيدان ذالك فى الاجتهاد والرأى ، اهـ (ج ٤ ص ٧٤)

"প্রথম ও দ্বিতীয় দলীল দ্বারা সুন্নাত অর্থ আমলী সুন্নাত প্রমাণিত হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ সাহাবীগণ যখন এমন কোনো কাজ করেন যে কাজ রসূলের কোনো সুন্নাতের পক্ষে বা বিপক্ষে নয় তখন সে কাজকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মত মনে করে আমরা তার অনুসরণ করবো এবং সে ক্ষেত্রে সাহাবীকেই অনুসরণ করবো।

'সাহাবীদের কথা নির্ভরযোগ্য এবং তাদের কাজ অনুকরণযোগ্য' গ্রন্থ প্রণেতার একথায় এখানে قول উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'তাকলিফী' (অর্থাৎ যে শরয়ী হুকুমের জন্যে সে আদিষ্ট হয়েছে) যেমন, হজ্জের সময় আমরা তাদেরকে বিশেষ বিশেষ জায়গায় তাকবীর ও তালবীয়া পড়তে দেখি। (তাহলে এ ব্যাপারে আমরা তাদেরকে অনুসরণ করবো) কাওল বা কথা দ্বারা তাঁদের ব্যক্তিগত কথা এবং ইজতিহাদী রায় বুঝায় না। অন্যথায় প্রথম দলীলে শুধু ন্যায় নিষ্ঠতার প্রশংসা করা এবং দ্বিতীয় দলীলে তাদের সুন্নাতের অনুসরণ করা এ উভয়টি ব্যক্তিগত কথা ও ইজতিহাদী রায় দলীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়।"

এ তানকীদের সারকথা হলো, সাহাবীদের ব্যক্তিগত কথা ও ইজতিহাদী রায় নিয়ে বিতর্ক আছে। যেসব কথা শরয়ী আহকামের সাথে সম্পৃক্ত এবং যেগুলোর জন্যে তারা আদিষ্ট হয়েছেন এবং হুকুম মান্য করার জন্য সেসব কথা তাঁদের দ্বারা প্রণীত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিতর্ক নেই। প্রথম

www.pathagar.com

দলীলে তাদেরকে خير امة "উত্তম জাতি' বলা হয়েছে। দ্বিতীয় দলীলে তাঁদের সুন্নাত পালন করার নির্দেশ রয়েছে। এর দ্বারা তাঁদের ব্যক্তিগত কথা ও ইজতিহাদী রায় দলীল এবং অবশ্য পালনীয় হওয়ার কথা প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয় দলীলে বর্ণিত সুন্নাত দ্বারা সেইসব সুন্নাত হতে পারে যার ওপর ইজমা হয়েছে, ব্যক্তিগত কথা এবং ইজতিহাদী রায় নয়। উভয় দলীল দ্বারা যে কথাটি প্রমাণিত হয় তাহলো সাহাবীদের ইজমা দলীল। এতে কোনো দ্বিমত বা বিতর্ক নেই।

১ম ও ২য় দলীলের ন্যায় ৩য় ও ৪র্থ দলীলেরও 'আল মোয়াফিকাত' এর ব্যাখ্যাতা শায়খ আবদুল্লাহ দারাজ দিময়াতী সমালোচনা করেছেন। ইমাম শা'বী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তৃতীয় দলীলের শেষাংশে বলেছেন ঃ انهم مما يجب متابعتم وتقليدهم "সম্মানিত সাহাবীদের সাথে আলেমদের গভীর মহব্বত এবং অপূর্ব সম্মান প্রদর্শনের পরিণতিই হলো তাদের অনুসরণ এবং আনুগত্য অন্যদের জন্যে ওয়াযিব। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারীর ভাষ্য হলো ঃ

هذا هو المطلوب ولكنه لايسلم لزومه لما قبله ويعارضه ايضًا انهم طالما خالفوهم فى الامور الاجتهادية التى هى موضوع الكلام ولذالك فالمعول عليه ان مذهب الصحابى ليس بحجة على غير الصحابة كما انه ليس بحجة على الصحابة باتفاق فان كان غوض المسئلة وجوب الاخذ بسنتهم التى اتفقوا عليها فذالك مالا نزاع فيه الانه اهم انواع الاجماع وان كان الغرض ماجرى العمل عليه فى عهدهم وان لم يتفقوا عليه فهذا ليس بدليل شرعى يتقيد به المجتهد ـ ١هـ (ج ٤ ص٧٧)

"তাকলীদের এরূপ ওয়াযিব হওয়া যদিও কাঙ্খিত। কিন্তু তাযীম ও ইহতেরামের সাথে একে আবশ্যকীয় মনে করা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া এ দলীলের সাথে একথারও বৈপরিত্য দেখা যায় যে, আলেমগণ যদিও তাদের কথা অনুসরণ করেছেন। আবার এমন অনেক এবং আলোচ্য ইজতিহাদী বিষয়ের মত বিষয়ে তাদের সাথে মতানৈক্যও করেছেন। অতএব নির্ভরযোগ্য কথা হলো, সাহাবীর মযহাব সাহাবার নয় এমন ব্যক্তির জন্যে দলীল নয়। যেমন তা অন্য সাহাবাদের জন্য দলীল হতে পারে না। এখন যদি মাসয়ালার উদ্দেশ্য সাহাবীদের সেসব সুন্নাত হয় যার ওপর আমল করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াযিব তাহলে ব্যাপারটি আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত হবে। কেননা, এ ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই। বরং এ ধরনের

www.pathagar.com

সুন্নাত ইজমার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে একটি যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আর যদি সুন্নাত বলতে তাঁদের যুগে বাস্তবায়িত সুন্নাত উদ্দেশ্য হয় তাহলে ঐ সুন্নাত এমন কোনো শরয়ী দলীল নয় যার সাথে মুজতাহিদকে সম্পৃক্ত করা যায়। যদিও সুন্নাতটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হয়।"

চতুর্থ দলীলের তানকীদ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

وهذا الدليل الرابع كالاول ظاهر فى الاقتداء بافعالهم واقوالهم اتكليفية لا الاراء والمذاهب۔

"চতুর্থ দলীল ও প্রথম দলীলের মতো একথা সুস্পষ্ট যে, সাহাবীদের কাজ এবং আদিষ্ট কথার অনুসরণ করা যেতে পারে। তাদের ব্যক্তিগত ও ইজতিহাদী রায় ও মতামতকে নয়।"

মালেকী ও হাম্বলী মযহাবপন্থী আলেমদের দাবী হলো সাহাবীদের ব্যক্তিগত মতামত ও ইজতেহাদী রায় বোধগম্য হোক কিংবা না হোক তা অন্য উম্মতের জন্যে সাধারণভাবে দলীল হবে। উভয় অবস্থায়ই তার তাকলীদ ওয়াজিব এবং তা তানকীদের উর্ধে। যদিও এ দাবীর স্বপক্ষে বর্ণিত দলীলের ওপর সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অভিমত

এখন ইমাম শাফেয়ীর মত ও পথ দেখুন। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দু'টি মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে তিনি যে কথাটি অভিমত হিসেবে সর্বশেষ গ্রহণ করেছেন তাহলো, সাহাবার কথা মূলত হুজ্জত বা দলীল নয়। ইমাম শাতেবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি "আল মাওয়াকিফ" গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

والمنقول عنه فى الصحابى رضـ انه قال كيف اترك الحديث لقول من لوعاترته الحجته۔ ١هـ (ج ٤ ص ٧٨)

"সাহাবী সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি হাদীসকে এমন লোকের কথায় কেমন করে ত্যাগ করতে পারি যে, যদি আমি তার সমসাময়িক হতাম তাহলে দলীলের সাহায্যে তার মুকাবিলা করতাম।-(খণ্ড ৪ পৃঃ ৮৪)

হানাফীদের উসূলে ফিকাহের কিতাবেও ইমাম শাফেয়ীর মতামত এভাবে উল্লেখ হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وقال الشافعى فى قوله الجديد لاتقلد احد منهم اى لايكون قوله حجة وان كان فيما لايدرك بالقياس واليه ذهبت الاشاعرة والمعتزلة ـ

"ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির শেষ মতামত হলো, সাহাবীদের কারো তাকলীদ করা যাবে না। অর্থাৎ সাহাবার কথা দলীল নয়। সে কথাটি যদি এমন বিষয় সম্পর্কে হয় যা কিয়াসের মাধ্যমে পাওয়া যাবে না। আশায়েরা ও মুতাযিলা সম্প্রদায় এমতই গ্রহণ করেছেন।"

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর আল মুসতাসফা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৩৫ পৃষ্ঠায় باب الاصل الثانى من الاصول الموهومة قول الصحابى শিরোনামে আলোচনা প্রসংগে প্রথমে বলেছেন যে, কারো কারো মতে সাহাবাদের কথা সাধারণভাবে হুজ্জত। কারো কারো মতে কিয়াস ভিত্তিক নয় এমন বিষয়ে হুজ্জত। আবার কারো কারো মতে কেবলমাত্র আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কথা হুজ্জত হবে। তারপর তিনি বলেন ঃ

والكل باطل عندنا فان من يجوز عليه الغلط والسهوو لم تثبت عصمته فلا حجة فى قوله فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطاء وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة ـ وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف وكيف يختلف المعصومان كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر ابو بكر رضـ وعمر رضـ على من خالفهما بالاجتهاد على كل مجتهدان يتبع اجتهاد نفسه فانتفاء الدليل على العصمه وو قوع الاختلاف بينهم وتصريحهم ازمخالفتهم فيه ثلثه ادلة قاطعة ـ اهـ

"আমাদের মতে এ সমস্ত কথা (সাহাবাদের কথা হুজ্জত হওয়ার ব্যাপারে) বাতিল। কেননা, যার ভুল-ক্রটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং যার নিষ্পাপ ও নির্ভুল হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই তার কথা কোনো দলীলও নয়। তাই সাহাবীদের যখন ক্রটি-বিচ্যুতি হওয়া সম্ভব তখন তাদের কথা কিভাবে সনদ হতে পারে ? কোনো মুতাওয়াতের দলীল ছাড়া তাদের নিষ্পাপ ও নির্ভুল হওয়ার দাবী কিভাবে করা যায় ? এবং যাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেছে সে দলকে কিভাবে মাসুম চিন্তা করা যায় ? পরিশেষে দু'টি মাসুম দলের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়া কিভাবে সম্ভব ? যখন সাহাবা নিজেই সাহাবার সাথে মতপার্থক্য করাকে জায়েয হওয়ার ব্যাপারে.

www.pathagar.com

ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজেদের বিরুদ্ধে ইজতিহাদকারীদের প্রতিবাদ করেননি বরং ইজতিহাদী মাসয়ালায় প্রত্যেক মুজতাহিদকে তার নিজস্ব ইতজিহাদের অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন তখন এসব কিভাবে সম্ভব হতে পারে ? তাই সাহাবীদের নিষ্পাপ হওয়ার দলীল না থাকা তাদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়া এবং ভিন্ন মত পোষণ করাকে তাদের সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয মনে করা এ তিনটি কথা আমাদের মতের পক্ষে অকাট্য দলীল স্বরূপ।"

অতপর ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির গৃহীত সর্বশেষ মতটি এভাবে পেশ করেছেন ঃ

لايقلد العالم صحابيا كما لاتقلد عالما اخر -

"আলেম ব্যক্তি কোনো সাহাবার কিংবা অন্য কোনো আলেমের তাকলীদ করবে না।"

তারপর ইমাম গাযালী বলেন ঃ

وهو الصحيح المختار عندنا اذ كل مادل على تحريم تقليد العالم للعالم لايفرق فيه بين الصحابى وغيره - اه

"এটিই আমাদের কাছে স্বীকৃত ও অগ্রাধিকার লাভযোগ্য মত। কেননা, যেসব দলীলের ভিত্তিতে একজন আলেমের জন্য অপর কোনো আলেমের তাকলীদ করা হারাম, সেই একই দলীলের ভিত্তিতে কোনো সাহাবী ও অ-সাহাবীর মধ্যে পার্থক্য করা যায় না।"

অতপর ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মালেকী, হাম্বলী ও অন্যান্য যেসব লোকদের দলীলের উল্লেখ করেছেন যারা সাহাবীদের ফযিলতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত ও হাদীসমূহের ওপর ভিত্তি করে সাহাবীদের তাকলীদ করা জায়েয অথবা অপরিহার্য মনে করেন। তাদের সকলের জবাবে তিনি বলেন ঃ

قلنا هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد فى علمهم ودينهم ومحلهم عند الله تعالى ولا يوجب تقليدهم لاجوازا ولا وجوابًا -

"আমাদের মতামত হলো—এগুলো সবই হলো প্রশংসা। এসব প্রশংসা দ্বারা সম্মানিত সাহাবীদের আমল, তাদের দ্বীন এবং আল্লাহর দরবারে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করা অপরিহার্য হয়ে যায়। কিন্তু এসব প্রশংসা দ্বারা তাদের তাকলীদ করা জায়েয কিংবা ওয়াযিব হয়ে যায় না।"

www.pathagar.com

তারপর তিনি তাঁর এ জবাব শেষ করেছেন এভাবে ঃ

كل ذلك ثناء لايوجب الاقتداء اصلا -

"এগুলো সবই প্রশংসা ও স্তুতি। এর দ্বারা তাকলীদ জায়েযও হয় না বা বাধ্যতামূলকও হয় না।"

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যায় স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে সাহাবার তাকলীদ করা মূলতই জায়েয নয়। সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড হওয়া অথবা তানকীদের উর্ধে হওয়া তো দূরের কথা। একথাও প্রনিধানযোগ্য যে, এ মতটি কেবল ইমাম গাযালীরই মত নয় বরং অন্যান্য শাফেয়ী মতাবলম্বী মুজতাহিদগণও তা অনুমোদন করেছেন এবং সাহাবীদের তাকলীদ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লামা আমদী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ الاحكام فى اصول الاحكام -এর তৃতীয় খণ্ডে 'সাহাবীদের মযহাব' এর প্রাথমিক আলোচনায় আলেমদের মধ্যে প্রথম থেকে বিদ্যমান প্রসিদ্ধ বিতর্কিত প্রসংগগুলো উল্লেখ করেছেন। সে বিতর্কিত বিষয় হলো, আশায়েরা, মুতাযিলা, ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাই এর একটি উক্তি অনুযায়ী এবং ইমাম আবুল হাসান কারখী হানাফী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে সাহাবার কথা অ-সাহাবীর জন্যে হুজ্জত নয়। কারো কারো মতে কিয়াসের বিরোধী কথা হুজ্জত। আবার কতিপয় লোক সাহাবীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মযহাবকে নির্দিষ্ট করে তাদের কথা দলীল হতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা হুজ্জত। তারপর তিনি লিখেছেন ঃ والمختار انه ليس بحجة مطلقا স্বীকৃত কথা হলো, সাহাবীদের কথা কখনো হুজ্জত নয়।

আরো অগ্রসর হয়ে তিনি 'দ্বিতীয় মাসয়ালা' শিরোনামে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, সাহাবার মযহাব যখন হুজ্জত এবং অবশ্য পালনীয় নয় বলে প্রমাণিত হলো তখন অ-সাহাবীদের জন্যে তাদের তাকলীদ করা জায়েয হবে কিনা ? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ঃ والمختار امتناع ذالك مطلقا "স্বীকৃত ও অগ্রাধিকার যোগ্য মত হলো তাবেয়ীন ও মুজতাহেদীনের জন্যে সাহাবীদের তাকলীদ একেবারেই নিষিদ্ধ।"

উপরোল্লেখিত উদ্বৃতিসমূহের মাধ্যমে সাহাবার তাকলীদ অধ্যায়ে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং শাফেয়ী মতাবলম্বী মুজতাহিদদের অনুমোদিত অভিমত এটাই জানা গেলো যে, সাহাবীদের কথার অনুকরণ করা

www.pathagar.com

(তাকলীদ) যারা সাহাবী নয় তাদের জন্যে ওয়াযিবও নয় জায়েযও নয়। কেননা, তাদের মতে সাহাবীদের কথা মূলত হুজ্জতই নয়। সুতরাং তাদের কথার তানকীদ করাও জায়েয। তাঁরা সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড নয় এবং তানকীদেরও যে উর্ধে নয় একথাও জানা গেলো।

ইমাম শাওকানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রায়

ইমাম শাওকানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হুবহু এ মতই পোষণ করেছেন। 'সাহাবার কথা কখনো হুজ্জত নয়' তানকীদ থেকেও মুক্ত নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সহীহ্ হাদীসই সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড এবং সব ধরনের তানকীদ থেকে মুক্ত এ কথাগুলোকেই তিনি 'সত্য' বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং ارشاد الفحول الفصل السابع فى الاستدلال ، البحث الخامس فى قول الصحابى অধ্যায়ে তিনি এ ব্যাপারে নিজের ইজতিহাদী রায় পেশ করেছেন ঃ

والحق انه ليس بحجة فان الله سبحانه لم بعث الى هذه الامة الانبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وليس لنا الارسول واحد وكتاب واحد ـ وجميع الامة مامور باتباع كتابه وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم فى ذالك فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباغ الكتاب والسنة فمن قال انها تقوم الحجة فى دين الله عز وجل بغير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وما يرجع اليهما فقد قال فى دين الله بما لايثبت ـ

"হক হলো সাহাবীদের কাওল বা উক্তি হুজ্জত নয়। আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতের জন্য কেবলমাত্র আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। আমাদের কিতাব ও রসূল এক। উম্মতের সমস্ত লোক আল্লাহর এ কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করার জন্যে আদিষ্ট। এ ব্যাপারে সাহাবা ও অ-সাহাবার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বরং সকলেই শরীয়াতের বিধি-নিষেধ এবং কুরআন ও হাদীসকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশিত হয়েছে। যদি কেউ বলে—আল্লাহর দীনে কুরআন ও হাদীস অথবা কুরআন হাদীস সমর্থিত বিষয় ছাড়া অন্য কিছুও হুজ্জত বা দলীল হিসেবে গণ্য হতে পারে তাহলে সে দীনের ব্যাপারে অমূলক কথাই বললো।"

www.pathagar.com

হানাফীদের অভিমত

উপরে মালেকী ও শাফেয়ী এ দু'টি মতের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে মালেকী মযহাবে বিষয়টি সম্পর্কে চরম নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। আবার শাফেয়ী মযহাবে বিষয়টি সম্পর্কে অতিশয় নরম পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সংযত ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেছেন। তিনি ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতো চরম পন্থা কিংবা ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মত নরমপন্থা অবলম্বন করেননি। বরং তিনি সাহাবীদের কথা বা উক্তিকে ভাগ করেছেন। এক ধরনের কথা যা কিয়াস বিরোধী মাসয়ালার সাথে সংশ্লিষ্ট। আরেক ধরনের কথা যা কিয়াস সমর্থিত মাসয়ালার সাথে সম্পৃক্ত। কিয়াস বিরোধী কথাকে হুজ্জত (দলীল) এবং তার তাকলীদ করা ওয়াযিব এবং মুজতাহিদদের কিয়াসের ওপর অগ্রাধিকার তিনি এ কারণে দিয়েছেন যে, এ ধরনের কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এ প্রকৃতির কথা প্রকৃতপক্ষে সাহাবার নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মনে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সাহাবীর কথা বা উক্তি হওয়ার কারণে তা হুজ্জত বা অবশ্য পালনীয় নয় বরং কথাটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনার কারণেই হুজ্জত বা অবশ্য অনুকরণীয়। কিয়াসের সমর্থক সাহাবীর কথা সম্পর্কে হানাফীদের দু'টি মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি আবু সায়ীদ বুরদায়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, অপরটি ইমাম আবুল হাসান কারখী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির। আবু সায়ীদ বুরদাদায়ীর মতে এ ধরনের কথাও প্রথম প্রকারের কথার মতো দলীল এবং অবশ্য অনুকরণীয় হবে এবং মুজতাহিদদের কিয়াসের তুলনায় তা অবশ্যই অগ্রাধিকার যোগ্য হবে। ইমাম আবুল হাসান কারখীর মতে এ ধরনের কথা হুজ্জত বা অবশ্য অনুকরণীয় নয়। মুজতাহিদদের কিয়াসের ওপর এমন কথাকে অগ্রাধিকারও দেয়া যাবে না। বরং কুরআন ও হাদীসের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাঁছাই ও পরখ করতে হবে। যাচাই ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তা গ্রহণ করা হবে অন্যথায় পরিত্যাগ করা হবে।

আবু সায়ীদ বুরদায়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যিনি সাহাবীদের কথাকে মালেকীদের মত সর্বাবস্থায় হুজ্জত ও অবশ্য অনুকরণীয় মনে করেন তিনি তাঁর এ সিদ্ধান্তের পক্ষে যেসব দলীল পেশ করেছেন তাহলো—কিয়াসের বিরুদ্ধে সাহাবার কিয়াস পরিপন্থী উক্তি একটি 'মারফু' হাদীসের সমপর্যায়ভুক্ত। কেননা এখানে ইজতিহাদের কোনো অবকাশ নেই। এবং দীনের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম মিথ্যা বর্ণনা দিতে এবং মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত হতে পারেন না।

www.pathagar.com

সুতরাং নিশ্চিতভাবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, কথাটি তাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনার পরই রেওয়ায়েত করেছেন। এ কারণে তাদের কথা 'মারফু' হাদীসের নির্দেশের মতো শিরোধার্য এবং অন্য সব মুজতাহিদের কিয়াসের ওপর তাদের কথা অগ্রাধিকার পাবে। দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ কিয়াসের মুতাবেক হলে যদিও সাহাবার কথা একটি কিয়াসের মর্যাদা সম্পন্ন হয় তথাপি তা তানকীদের ঊর্ধে এবং মুজতাহিদদের কিয়াস থেকে অধিক অগ্রাধিকার যোগ্য। মুজতাহিদ এবং মুজতাহিদ নয় এমন সকলের জন্যে তাদের কথাগুলো অনুসরণ করা ওয়াজিব। কারণ, সাহাবীগণ শরীয়াতের মূল কুরআন নাযিল হওয়ার ক্ষেত্র, অবস্থান ও প্রকৃতির প্রত্যক্ষদর্শী এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাসাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ধন্য। দীনের আহকাম সম্পর্কে সবচেয়ে বিজ্ঞ এবং সর্বোত্তম যুগের লোক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। অতএব, তাঁদের ইজতিহাদী উক্তিসমূহ অন্যসব মুজতাহিদের ইজতিহাদী ফায়সালা ও কিয়াসের চেয়ে অধিকতর সঠিক হবে। সুতরাং তাদের কথার অনুসরণ করা গোটা উম্মতের জন্যে অপরিহার্য এবং সব ধরনের তানকীদ থেকে তাদের কথা ও ফায়সালা মুক্ত ও পবিত্র।

আবুল হাসান কারখী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঃ সাহাবার কথা যখন কিয়াস বিরোধী হয় তখন দু'টি সম্ভাবনার ভিত্তিতে তাঁদের কথা হুজ্জত ও অবশ্য অনুকরণীয় হয়। একটি হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে শুনেছে। দ্বিতীয়টি হলো সাহাবীগণ নিজেরাই বানিয়ে মিথ্যা বলছে। সাহাবীদের উচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথা নিশ্চিতভাবে উড়িয়ে দেয়া যায়। তাহলে প্রথম সম্ভাবনাকেই মানতে হবে। অর্থাৎ একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনে বর্ণনা করা হয়েছে এটা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু একথা যখন কিয়াসের অনুকুল বোধগম্য এবং যুক্তিসংগত অর্থবহ হবে তখন এর মর্যাদা ইজতিহাদ ও কিয়াসের চেয়ে বেশী নয়। সুতরাং এর তাকলীদ করা মুজতাহিদের জন্যে আবশ্যকীয় নয়। বরং এর মুকাবিলায় মুজতাহিদ নিজের ইজতিহাদের ওপরও আমল করতে পারে। একজন মুজতাহিদ যেভাবে কাওলে সাহাবার মুকাবিলায় নিজের ইজতিহাদের ওপর আমল করতে পারে, তেমনি একজন মুকাল্লিদও (অনুকরণকারী) তার বক্তব্য ও মতামতের মুকাবিলায় অপরাপর মুজতাহিদের ইজতিহাদের ওপর আমল করতে পারে। বস্তুত এ অবস্থায় সাহাবীদের কথা তানকীদ যোগ্য হতে পারে। কেননা, সম্মানিত সাহাবীদের ইজতিহাদেও মুজতাহিদের ইজতিহাদের ন্যায় ভুল ও নির্ভুল দু'টিই হতে পারে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে ঃ كل مجتهد يخطى ويصيب প্রত্যেক মুজতাহিদই ভুল করতে পারেন এবং সঠিক

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তেও পৌঁছতে পারেন। এ সাধারণ হুকুম সাহাবী ও অ-সাহাবী উভয়ের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। আর যখনই ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে তখন কুরআন ও হাদীসের মানদণ্ডে যাচাই-বাছাই ও পরখ করা কর্তব্য। গ্রহণযোগ্য হলে তাকলীদ করতে হবে। আর বর্জনযোগ্য প্রতীয়মান হলে তা ত্যাগ করতে হবে।

তবে উভয় দলের মধ্যে যে বক্তব্যটি নিয়ে বিতর্ক তা সাধারণ সাহাবীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ নয় এবং সে কথার ওপর মৌনতাও অবলম্বন করা হয়নি আবার প্রকাশ্যভাবে মেনে নেয়াও হয়নি। অন্যথায় সে বক্তব্যের মর্যাদা হতো একটি ইজমার মর্যাদার মতো। তাহলে তা সর্বসম্মতিক্রমে তানকীদের ঊর্ধে হতো এবং সমস্ত উম্মতের জন্যে হুজ্জত ও অবশ্য পালনীয় হতো। অধিকন্তু সাহাবার একথার বিরোধিতা অন্য কোনো সাহাবা প্রকাশ্যভাবে করেননি, অন্যথায় অন্য কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্যের তাকলীদ করা জরুরী হবে না। বরং কুরআন ও সুন্নাতের দলীলের ভিত্তিতে একথার মধ্য থেকে কোনো একটিকে অপরটির মুকাবিলায় গ্রহণ করা হবে এবং এভাবে তানকীদ ও যাচাই-বাছাই করার পর উত্তীর্ণ কথাটিকে প্রতিষ্ঠা এবং অ-উত্তীর্ণকে ত্যাগ করা হবে। এটাও এক ধরনের তানকীদ।

এর সাথে সে কথা সম্পর্কে এটাও জ্ঞাত না হওয়া যে, সে কথাটি কিতাবুল্লাহ অথবা সুন্নাতে রসূলুল্লাহর বিরোধী নয়। অন্যথায় ঐকথা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, হানাফীদের মতে সাহাবার কথা হুজ্জত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, কুরআন ও হাদীসের মুকাবিলায়ও তা হুজ্জত এবং অবশ্য পালনীয়। বরং এমতাবস্থায় সাহাবার কথা হুজ্জত বা দলীল না হওয়াই সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। শায়খ ইবনে হুমাম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফতহুল কাদীর গ্রন্থের জুময়া অধ্যায় খুতবার সময় কথা বলা প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী সময়ে ইমামদের ব্যাখ্যাসমূহের আওতায় প্রসংগটির উল্লেখ করা হবে। উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যার জন্যে হানাফী আলেমদের নীতিগত কথা নিম্নে বর্ণনা করা হলো। উসূলে ফিকাহের আলেমদের ব্যাখ্যাসমূহ ঃ

قال ابو سعيد البردعى تقليد الصحابى واجب حتى يترك به القياس لاحتمال السماع والتوقيف ولفضل اصابتهم فى نفس الرأى بمشاهدة احوال التنزيل ومعرفت اسبابه وهذا مختار فخر الاسلام والمصنف وغيرهم وهو مذهب مالك واحمد والشافعى فى قوله القديم - وقال ابو

www.pathagar.com

الحسن الكرخى لايجب تقليد الصحابى الافيما لايدرك بالرأى والقياس واليه مال القاضى ابو زيد وغيره ـ وقال الشافعى فى قوله الجديد لايقلد احدمنهم وهذا اخلاف في كل ما ثبت عنهم من غير اختلاف بينهم ومن غيران يثبت عنهم انه بلغ غير قائله فسكت عند سماعه مسلما له حتى لوشاع الحكم فسكتوا مسلمين يجب التقليد اجماعًا ـ اهـ

"আবু সায়ীদ বুরদায়ী বলেন, সাহাবীদের তাকলীদ করা ওয়াজিব। এর মুকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সাহাবার কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রুত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অধিকন্তু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নাযিল হওয়ার কারণসমূহ সম্পর্কেও তাঁরা ভালোভাবে জ্ঞাত আছেন বিধায় তাদের ইজতিহাদী রায় অধিকতর সঠিক। ফখরুল ইসলাম এবং লেখক প্রমুখের মত এটিই। ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পূর্ববর্তী কথায় এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। আবুল হাসান কারখী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঃ কিয়াস প্রতিকুল প্রসংগ ছাড়া কিয়াস অনুকুল প্রসংগে সাহাবীর তাকলীদ ওয়াজিব নয়। কাযী ইমাম আবু যায়েদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রমুখ একথার সমর্থন করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সর্বশেষ অভিমত অনুযায়ী কোনো সাহাবীরই তাকলীদ করা জায়েয নয়। তবে যেসব বিষয়ে সাহাবীর উক্তি বা মতামত বর্তমান এবং কেউ সে কথার বিরোধিতা করেনি সে কথার বেলায় উপরোক্ত নীতি প্রযোজ্য নয়। অধিকন্তু এটাও যদি জানা না থাকে যে, অপরাপর সাহাবীদের কাছে একথা পৌঁছেছে এবং তারা সে কথা গ্রহণ করার সময় মৌন রয়েছে। অন্যথায় যদি সাহাবীর একথা সাধারণভাবে খ্যাতিলাভ করে থাকে এবং অন্যান্যগণ গ্রহণ করার সময় মৌনতার ভূমিকা অবলম্বন করে থাকেন তাহলে তো সর্বসম্মতিক্রমে একথার তাকলীদ করা ওয়াজিব হবে।"

উসূলে ফিকাহের বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে সদরে শরীয়াত নিজের লিখিত "আল তাওজীহ" কিতাবে একথারই ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনটি মাযহাব সম্পর্কে উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। "আল তাওজীহ" এর নিম্ন লিখিত বাক্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন ঃ

www.pathagar.com

تقليد الصحابى واجب اجماعًا فيما شاع بينهم فسكتوا مسلمين له ولا يجب اجماعًا فيما ثبت الخلاف بينهم واختلف فى غيرهما وهو مالم يعلم اتفاقهم ولا اختلافهم فعند الشافعى لايجب لانه لمالم يرفعه لايحمل على السماع وفى الاجتهادهم وسائر المجتهدين سواء لعموم قوله تعالى فاعتبروا يا اولى الابصار۔

ولان كل مجتهد يخطى ويصيب عند اهل السنة وعند ابى سعيد البردعى يجب لقوله عليه السّلام اصحابِى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم۔ ولان اكثر اقوالهم مسموع من حضرة الرسالة وان اجتهدوا فرأيهم اصوب لانهم شاهدوا اموار دالنصوص ولتقدمهم فى الدين ببركة صحته النبى صلى اللّه عليه وسلم وكونهم فى خَير القرون وعند الكرخى يجب فيما لايدرك بالقياس لانه لاوجه له الا السماء او الكذب والثانى منتف ولا يجب فيما يدرك بالرأى لان القول بالرأى منهم مشهور والمجتهد يخطى ويصيب ۔والا قتداء فى بعض الموضع ان نسلك مسلكهم فى الاجتهاد ونجتهد كما اجتهدوا وهذا اقتداء ايض ١هـ۔

"যে কথা সাহাবীদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং সাহাবীগণ সে কথাটিকে গ্রহণ করতঃ মৌনতার ভূমিকা অবলম্বন করেছেন, সে কথায় সাহাবীর তাকলীদ করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। আর যে কথায় সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে এবং তাদের মতানৈক্য অথবা মতৈক্য সম্পর্কে জানা নাই ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহর মতে এমন কথার তাকলীদ করা সাধারণভাবে ওয়াজিব নয়। কেননা তারা যখন কথাটিকে রসূলের সাথে সম্পর্কিত করেননি তখন তা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছে বলে ধারণা করা যায় না। ইজতিহাদী বিষয়ে সাহাবা এবং অন্যান্য মুজতাহিদগণ সকলেই সমান ; কেননা فاعتبِروا ياأولى الابصار এ আয়াত উভয়কে শামিল করে।

সাহাবার তাকলীদ করা ওয়াজিব না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জায়ামাতের মতে প্রত্যেক মুজতাহিদের ইজতিহাদ ভুল ও শুদ্ধ উভয়ই ওয়াজিব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আবু সায়ীদ বুরদায়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে সাহাবার তাকলীদ করা ওয়াজিব। কারণ.

www.pathagar.com

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। তোমরা তাদের যে কোনো একজনের অনুসরণ করবে হিদায়েত পাবে। তাছাড়া তাদের অধিকাংশ কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শোনা। ইজতিহাদীর ব্যাপারেও তাঁদের রায় অধিকতর সঠিক। কেননা তাঁরা শরীয়াতের মূল আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী ; দ্বিতীয় নবীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের বরকতে দীনের ব্যাপারে তাঁরা অন্যান্যের চেয়ে অগ্রগামী ; তৃতীয় তাঁরা ছিলেন উত্তম যুগের মানুষ।

ইমাম কারখী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে কিয়াসের অনুকুলে নয় এমন সব বিষয়ে সাহাবার তাকলীদ করা ওয়াজিব। কারণ, এসব ক্ষেত্রে সাহাবার বক্তব্য হয় রসূলের কাছ থেকে শোনা হবে অথবা মিথ্যা বলে থাকবেন। তবে সাহাবীদের মিথ্যা বলা তো কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং কথাটি নিশ্চয়ই রসূলের কাছ থেকে শোনা হবে। বিবেক-বুদ্ধি ও কিয়াসের অনুকূলে সেসব বিষয়ে তাকলীদ করা ওয়াজিব নয়। কেননা ইজতিহাদী কথা বলার ব্যাপারেও তাঁরা প্রসিদ্ধ। আর মুজতাহিদ কখনো ভুল করে আবার কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়। কোনো কোনো অবস্থায় এ পদ্ধতিতেও সাহাবীদের অনুসরণ করা হয় যে, আমরা তাদের মতো ইজতিহাদী বিষয়সমূহে ইজতিহাদ করবো এটাও তাদের অনুসরণ বটে।

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মাযহাব

'তাওজীহ' গ্রন্থের রচয়িতার এ উক্তি থেকে সাহাবীর তাকলীদ করা সম্পর্কে তিনটি মাযহাব জানা গেলো। এক, ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মাযহাব হলো বিষয়টি বুদ্ধি-বিবেক ও কিয়াসের অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক না কেন সাহাবীর তাকলীদ করা মূলত জরুরী নয়। বুদ্ধি-বিবেক ও কিয়াসের পরিপন্থি ক্ষেত্রে সাহাবীর কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রুত হওয়ার যদিও সম্ভাবনা থাকে তথাপি সাহাবীগণ রসূলের সাথে কথাটিকে সুস্পষ্টভাবে সম্পর্কিত না করার কারণে আমরা কথাটিকে মারফু হাদীসের পর্যায়ে গণ্য করতে পারি না। আর বুদ্ধি-বিবেক ও কিয়াসের অনুকুল হলে কথাটি সাহাবীদের নিজস্ব ইজতিহাদী ফতওয়া বলে বাহ্যত মনে হয়। ইজতিহাদ করার ব্যাপারে সাহাবা ও অন্যসব মুজতাহিদগণ সমান। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের গৃহীত বিধান হলো (المجتهد قد يخطى وقد يصيب।) (মুজতাহিদ কখনো ভুল করেন এবং কখনো নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছে থাকেন।) এ বিধানানুযায়ী প্রত্যেকের ইজতিহাদই ভুল ও শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সমানভাবে বিদ্যমান থাকে। এজন্যে সাহাবার কথা ও ফতওয়ার মর্যাদা কিয়াসের চেয়ে

www.pathagar.com

বেশী নয়। সুতরাং অন্যান্য মুজতাহিদের জন্যে সাহাবার কথা মূলত হুজ্জত নয়, বরং এর মুকাবিলায় মুজতাহিদ এর নিজস্ব ইজতিহাদের ওপর আমল করতে পারে।

আবু সায়ীদ বুরদায়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে কতিপয় কারণে সাহাবীর তাকলীদ করা সর্বাবস্থায় ওয়াজিব এবং তার অনুসরণ জরুরী। তার কোনো ধরনের সমালোচনা করা যাবে না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমত গোটা মুসলিম জাতির জন্য সাহাবীদেরকে পথপ্রদর্শক ও পরিচালক রূপে পেশ করেছেন, তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছেন, আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়। যে কেউ তাদের অনুসরণ করলে হেদায়াত ও পথের দিশা পাবে। আর পথপ্রদর্শকের অনিবার্য দাবী হলো— গোটা উম্মত তাদেরকে নিজেদের নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করা, তাদেরকে অনুসরণ করা এবং তাদের কথা ও রায়কে তানকীদ করার লক্ষ্যস্থলে পরিণত না করা।

দ্বিতীয়, তাদের অধিকাংশ কথাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনা। তার শোনা কথাটি যদিও নবীর প্রতি সুস্পষ্টভাবে সম্বোধন করেননি তথাপি নবী থেকে শ্রুত হওয়াই অধিকতর সম্ভাবনাময়। এজন্যে তাদের কথা মারফু হাদীসের মর্যাদাসম্পন্ন বলা যায়। এবং গোটা উম্মতের জন্যে তাদের এসব কথা মারফু হাদীসের মতো অবশ্য পালনীয় ঘোষিত হতে পারে। যদি ধরে নেয়া হয়, এসব কথা তাদের ইজতিহাদী ফতওয়া। তবুও তাদের ইজতিহাদী ফায়সালার মুকাবেলায় অধিক নির্ভুল ও সত্যনিষ্ঠ এবং তাদের তাকলীদ ও ইত্তেবা সকলের জন্যে জরুরী। কেননা তারা শরীয়াতের উৎস, কুরআন নাযিলের কারণসমূহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত এবং স্বচক্ষে এগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন। পরন্তু তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলম ও খুটিনাটি বিষয়ে সকলের চেয়ে বেশী জ্ঞাত ছিলেন। সর্বোপরি তাঁরা ছিলেন ইসলামের সোনালী যুগ লাভের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান।

ইমাম কারখী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে বলা হয়েছে যে, সাহাবীর কথার তাকলীদ করা আদৌ অত্যাবশ্যক নয়, আবার সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করাও ঠিক নয়। বরং কিয়াসের প্রতিকূল হুকুমের ক্ষেত্রে তাদের কথা হুজ্জত এবং তাকলীদ ওয়াজিব হবে। কেননা এ ধরনের কথায় যুক্তিসংগতভাবে দু'টি সম্ভাবনা হতে পারে। এক, কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনা হবে। দুই, সাহাবী মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকবে। দ্বিতীয়টি নিসন্দেহে অপসারিত হলে প্রথমটি নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হবে। সুতরাং সাহাবার কথাটিকে হাদীসে মারফু এর মর্যাদা দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

কিয়াসের অনুকূল হুকুমের ক্ষেত্রে সাহাবার কথা কিয়াসের চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন নয়। তাই তার কথার তাকলীদ করা মুজতাহিদের জন্য ওয়াজিব নয়। এ ক্ষেত্রে নিজের ইজতিহাদের ওপর আমল করাও তার জন্যে জায়েয। اصحابى كالنجوم রসূলের এ হাদীসের জবাবে ব্যাখ্যা হলো সাহাবার কথার অনুসরণ করার পরিবর্তে এমন ব্যাপারে তাদের অনুরূপ ইজতিহাদ করা ও তাদেরকে অনুসরণ করার নামান্তর। কারণ, ইজতিহাদী বিষয়সমূহে ইজতিহাদ করাই ছিলো তাদের নীতি। তারা এরূপ বিষয়ে ইজতিহাদ করতেন এবং নিজ নিজ ইজতিহাদের উপর আমলও করতেন। আমরাও যদি ইজতিহাদী বিষয়সমূহে তাদের মতো ইজতিহাদ করে নিজেদের ইজতিহাদের অনুসরণ করি তাহলে এটাও তাদের এক ধরনের অনুসরণ হবে এবং এভাবে তাদের একতেদাও (অনুসরণ) করা হবে।

তাওজীহ গ্রন্থের প্রণেতার উপরোল্লেখিত বাক্য দ্বারা বিতর্কিত বিষয়টিও সুনির্দিষ্টভাবে জানা হয়ে গেলো। এ বিতর্কের অবতারণা তখনই হবে যখন সাহাবা প্রদত্ত ফতওয়া সম্পর্কে অন্যান্য সাহাবীগণ জ্ঞাত হয়েও মৌনতা অবলম্বন করেননি। মৌন থাকলে সেটা একটি ইজমার মর্যাদা লাভ করে যার বিরোধিতা করা কোনোক্রমেই জায়েয নয় এবং এর তানকীদ করারও কারো অধিকার নেই। এমনিভাবে সাহাবা প্রদত্ত এ ফতওয়ার সাথে অন্য কোনো সাহাবী মতপার্থক্য করেননি। অন্যথায় কোনো নির্দিষ্ট কথার তাকলীদ ও অনুসরণ করা জরুরী নয়। বরং দু'টি বিপরীতার্থক কথার মধ্যে যে কোনো একটিকে অপরটির মুকাবিলায় অগ্রাধিকার দেয়া হবে। নতুবা প্রত্যেকটি কথার তাকলীদ করা জায়েয হবে। মুজতাহিদ যে কোনো একজনের তাকলীদ করতে পারবেন।

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহম্মাদ উসমানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ব্যাখ্যা

শায়খুল ইসলাম ও হযরত মাওলানা শাব্বীর আহম্মদ উসমানী রাহমাতুল্লাহ এ বিষয়ে মতামত পেশ করেছেন তাও অপরাপর উসূল বা মূলনীতি শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ আলেমদের গবেষণা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। মরহুম মাওলানা সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ فتح الملهم -এর ভূমিকায় ৪৭ পৃষ্ঠায় اقوال الصحابة والتابعين শিরোনামে নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেছেন।

قال ابو سعيد البردعى تقليد الصحابى واجب يترك به القياس وهو مذهب مالك واحمد بن حنبل فى احدى الروايتين والشافعى رح فى قوله القديم - وقال ابو الحسن رح الكرخى وجماعة من اصحابنا لايجب تقليده الا فيما لا

www.pathagar.com

يدرك بالرأى والقياس واليه ميل القاضى الامام ابى زيد على ما يشير اليه تقريره فى التقويم وقال الشافعى رح فى قوله الجديده لايقلد احد منهم اى لايكون قوله حجة وان كان فيما لايدرك بالقياس واليه ذهبت الاشاعرة والمعتزلة۔

وقد اختلف عمل اصحابنا الحنفية فى هذا الباب فلم يستقر مذهبهم فى هذه المسئلة ولم ثيبت عنهم رواية ظاهرة فيها ومع ذالك فقد اتفق عمل اصحابنا بتقليد الصحابى فيما لايدرك بالقياس مثل المقادير الشرعية الّتى لاتعقل بالرأى حملا لقوله على السماع من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لانه لايظن بهم المجازفة فى القول ولا يجوزان يحمل قولهم على الكذب فان طريق الدين من النصوص انما انتقل الينا برواتيهم وفى حمل قولهم على الكذب والباطل قول يفسقهم وذالك يبطال روايتهم فلم يبق الاالرأى والسماع فمن ينزل عليه الوحى ولا مدخل للرأى فى هذا الباب فتعين السماع وصار فتواه مطلقة كروايته عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان حجة لاثبات الحكم به فكذا اذا افتى به ولا طريق لفتواه الا السماع ....

"আবু সায়ীদ বুরদায়ী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহি বলেন, সাহাবীদের তাকলীদ করা ওয়াজিব। এর মুকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম মালেক রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহি ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একটি উক্তি এবং ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির প্রথম যুগের মত এরূপই ছিলো। আবুল হাসান কারখী রাহ্মাতুল্লা আলাইহি এবং হানাফী মতাবলম্বী একটি দলের মতে সাহাবীর তাকলীদ করা ওয়াজিব নয়। তবে যে হুকুম কিয়াস ও বিবেক-বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সে ক্ষেত্রে তাকলীদ করা ওয়াজিব। কাযী ইমাম আবু যায়াদের মতও অনুরূপ। তাকবীমে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা এরই ইংগিত বহন করে। ইমাম শাফেয়ী রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, কোনো সাহাবীর তাকলীদ করাই জায়েয নয়। অর্থাৎ সাহাবীর কথা কোনোক্রমেই হুজ্জত নয় তা কিয়াসের পরিপন্থী হলেও এটা ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির নতুন অভিমত। আশায়েরা ও মুতাযিলাগণও এমত পোষণ করে থাকেন। হানাফীগণ এ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে তাদের কোনো

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট দৃষ্টিভংগি স্বীকৃত হয়নি। এ বিষয়ে তাদের কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনারও উল্লেখ নেই। তবে তারা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, কিয়াস পরিপন্থী বিষয়সমূহ যেমন—শরীয়তী মানদণ্ড যা বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা স্থির করা যায় না এমন বিষয়ে সাহাবীর তাকলীদ করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সাহাবীর কথাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনা কথা ধরে নিতে হবে। কেননা তারা নিজেদের অনুমান ও আন্দাজের ওপর একথা বলেছেন এমন ধারণা করা যায় না। আবার মিথ্যা বলেছেন বলেও কল্পনা করা যায় না। দীনের দলীল ভিত্তিক আহকাম তাদের রেওয়ায়াতের মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌছেছে। যদি তাদের এসব কথা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা হয়, তাহলে তারা ফাসেক সাব্যস্ত হবেন এবং দীনের ব্যাপারে তাদের সমগ্র রেওয়ায়েত বাতিল বলে গণ্য হবে। তারপর এ ক্ষেত্রে দু'টি মাত্র বস্তুর সম্ভাবনা থাকে। এক, এটা কিয়াস এবং সাহাবী ইজতিহাদী রায় হওয়া ; দুই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রুত হওয়া। তবে কিয়াস পরিপন্থী হুকুমে যেহেতু রায়ের কোনো দখল আদৌ নেই। সুতরাং শ্রুত হওয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে নির্দিষ্ট হবে। এবার সাহাবী প্রদত্ত ফতওয়া বা রায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করার মতো হয়ে যাবে। আর একথা নিশ্চিত যে, যদি সাহাবা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনার কথা উল্লেখ করতেন, তাহলে সে কথাটি অবশ্যই দলীল হিসেবে গণ্য হতো। এমতাবস্থায় ফতওয়াটিও এ ভিত্তিতে দলীল হবে যে, সাহাবার জন্যে তা শ্রবণকারী হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই।”

মরহুম মাওলানা আরো অগ্রসর হয়ে লিখেছেন ঃ

وهذا كله فيما لايدرك بالقياس فاما ما يعقل بالقياس فوجه قول الكرخى ان القول بالرأى من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مشهور واحتمال الخطأ فى اجتهادهم كائن لامحالة فقد كان يخالف بعضهم بعضا وكانوا لايدعون الناس الى اقولهم وكان ابن مسعود يقول ان اخطأت فمن الشيطان واذا كان كذالك لم يجب تقليد مثله بل وجب الاقتداء بهم فى العمل بالرأى مثل ماعملوا ـ وذالك معنى قوله "اصحابى كالنجوم" الخ ووجه قول ابى سعيد البردعى ان العمل برأيهم اولى بوجهين احدهما احتمال السماع والظاهر الغالب من حال الصحابى افتائه بالخبر لابالرأى الا عند الضرورة ـ

www.pathagar.com

ولا حتمال فضل اصابتهم فى نفس الرأى فرأى الصحابة اقوى من رأى غيرهم لانهم شاهدوا طرق النبى عليه السلام فى بيان احكام الحوادث ولان لهم زيادة جد وحرص فى بذل مجهود هم فى طلب الحق وزيادة احتياط فى حفظ الاحاديث والتامل فيما لانص فيه غاية التأمل وفضل درجة ليس لغير هم كما نطقت به الاخبار مثل قوله خير القرون قرنى الذين بعثت فيهم الخ وقوله انا امان لاصحابى واصحابى امان لامتى وغير ذالك من الاخبار والمثل هذه الفضيلة اثر فى اصابة الرأى وكونه ابعد من الخطاء فبهذه المعانى ترجح رأيهم على رأى غيرهم وعند تعارض الرأيين اذا ظهر لاحدهما نوع ترجيح وجب الاخذ بذالك۔ فكذا اذا وقع التعارض بين رأى الواحد منهم ورأى الوحد منا يجب تقديم رأيه على رأينا لزيادة قوة فى رايه من الوجوه التى ذكرناها ۔ اهـ

"কিয়াসের মাধ্যমে যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, এ বিস্তৃত বর্ণনা সেইসব সিদ্ধান্তের ব্যাপারে। আর যেসব সিদ্ধান্তে বিবেচনা দ্বারা উপনীত হওয়া যায় সে ক্ষেত্রে ইমাম কারখী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতের পক্ষে দলীল হলো দীনি বিষয়ে সাহাবীগণও নিজেদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফতওয়া দিয়েছেন এটি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাপার। তাদের ইজতিহাদ ভুল থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। এ কারণেই তাঁরা একে অপরের সাথে মতবিরোধ করতেন। এবং লোকদেরকেও তাদের মতের অনুসরণ করতে বাধ্য করতেন না। এ কারণেই হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ফতওয়া দেয়ার সময় বলতেন আমার ফতওয়া যদি ভুল হয় তাহলে সেটা শয়তানের পক্ষ থেকে হবে। সুতরাং সাহাবীদের ইজতিহাদে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যখন প্রমাণিত হলো তখন এমন ধরনের ইজতিহাদের তাকলীদ করাও ওয়াজিব নয়। বরং তাদের মতো নিজস্ব রায়ের অনুসরণ করে এ পদ্ধতিতে আমরাও তাদের অনুসরণ করতে পারি। 'আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল' রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীর তাৎপর্য এটাই। আবু সায়ীদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতের যুক্তি হলো সাহাবীদের রায়ের অনুসরণ করা আমাদের জন্যে দু'টি কারণে উত্তম। এক, রায়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শোনা সম্ভাবনা থাকে। কেননা সাহাবীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাদীস থেকেই ফতওয়া দিতেন ; নিজেদের রায়ের ভিত্তিতে নয়। তবে জরুরী অবস্থার

www.pathagar.com

কথা অবশ্যই সতন্ত্র। দুই, তাদের রায়ের অনুসরণ করা এ কারণে উত্তম যে, অন্যান্য মুজতাহিদদের রায় ও মতামতের তুলনায় তাদের রায় অধিকতর নির্ভুল ও শক্তিশালী। কারণ, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও ঘটনাবলীর হুকুম-আহকাম বর্ণনা করার সময় সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মপন্থাকে স্বচক্ষে দেখেছেন। অধিকন্তু তাঁরা সত্যানুসন্ধানে ছিলেন খুবই সচেষ্ট ও অত্যন্ত আগ্রহী। হাদীস স্মৃতিতে ধরে রাখার ব্যাপারেও তারা ছিলেন সকলের চেয়ে অধিক সতর্ক ও সচেতন। এমনিভাবে তারা কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল বহির্ভুত বিষয়সমূহেও অত্যন্ত কঠোরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। মর্যাদার দিক থেকে তারা এমন ফযিলতের অধিকারী যা অন্যদের জন্য প্রমাণিত নয়। হাদীসে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যারা আমার প্রেরণকালের মানুষ তারা সর্বোত্তম।' তিনি আরো বলেছেন, 'আমি আমার সাহাবীদের জন্যে আশ্রয় আর সাহাবীগণ গোটা উম্মতের জন্যে আমান।' এসব ফযীলতের কারণে তাঁদের রায় অধিক নির্ভুল নিরাপদ। এসব কারণেই সাহাবীদের রায় অন্যান্যদের রায়ের ওপর প্রাধান্য পাবে। দু'টি পরস্পর বিরোধী রায়ের মধ্যে যেটি প্রাধান্য পায় সেটাকে অনুসরণ করাই বিধিসম্মত। এমনিভাবে কোনো সাহাবী ও মুজতাহিদের রায়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সাহাবীর রায় অনিবার্যরূপে প্রাধান্য পাবে। কেননা তাঁদের রায় উল্লেখিত কারণে অন্যান্য মুজতাহিদদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য।"-(ফতহুল মুলহিমের ভূমিকা খণ্ড ১ পৃঃ ৪৭-৪৮)

উসূলে ফিকাহবিদ আলেমগণের উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যদিও আলেমদের মতামতের বিশদ বিবরণ ও অন্যান্য প্রাসংগিক কথা জানা গেলো, তথাপি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুকাবিলায় সাহাবীর কাওলের মর্যাদা কি একথা এখন পর্যন্তও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ রয়ে গেছে। সুন্নাতের মুকাবিলায়ও কি তাদের তাকলীদ করা জায়েয ? এবং তানকীদ থেকে মুক্ত অথবা সুন্নাতের মুকাবিলায় তাদের তাকলীদ করা জায়েয নেই ? এ ব্যাপারে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে এ দাবী করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মুকাবিলায় সাহাবার কথা তাকলীদ যোগ্য নয়। এ ব্যাপারে গোটা আলেম সমাজ একমত। কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন বলে উল্লেখ নেই। এর কতিপয় উদাহরণ মাসয়ালার প্রথমে "রসূলের হাদীস ও তানকীদ" শিরোনামে আলোচিত হয়েছে। এবার এ বিষয় সম্পর্কে কতিপয় ইমামের বিশদ ব্যাখ্যা নিম্নে লক্ষ্য করুন।

www.pathagar.com

আরো কতিপয় ইমামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عن الاوزاعی قال كتب عمر بن عبد العزيز انه لارأی لاحد فی كتاب اللّٰه ولا رأی الاحد فی سنة سنها رسول اللّٰه صلی اللّٰه عليه وسلم وانما رأی الائمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض فيه سنة من رسول اللّٰه صلی اللّٰه عليه وسلم ـ اهـ

"ইমাম আওযায়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, উমর বিন আবদুল আযীয তাঁর অধীনস্থ সকল প্রশাসককে লিখে দেন, কুরআনের মুকাবিলায় রায় পেশ করার অধিকার কারো নেই। সুন্নাতে রসূলের মুকাবিলায় কোনো রায় পেশ করার অনুমতিও কারো নেই। দীনের ইমামগণের রায় এমন হুকুমের বেলায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে সম্পর্কে কুরআনের কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি এবং এ ব্যাপারে নবীর কোনো সুন্নাত আছে বলেও জানা যায়নি।"(অন্যথায় এমন হুকুমের মুকাবিলায় রায় গ্রহণীয় নয়)

ইমাম আওযায়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং উমর বিন আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহ আলাইহির আগে অনেক বড় বড় সাহাবা ও তাবেয়ীগণ সুন্নাতে রসূলের মুকাবিলায় কারো রায় বা মত অনুসরণযোগ্য নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ

عن عبد اللّٰه ابن عباس وعطاء ومجاهدو مالك بن انس رضی اللّٰه عنهم انهم كانوا يقولون ما من احد الا وهو ماخوز من كلامه ومردود عليه الا رسول الله صلی اللّٰه عليه وسلم ـ

আলেমগণের এসব কথার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন ও সুন্নাতের মুকাবিলায় কারো কথা এবং সিদ্ধান্ত অনুসরণযোগ্য নয়। তিনি সাহাবা বা অন্য যে কোনো আলেম এবং সালেহ যেই হোক না কেন। একথাও জানা গেলো যে, রসূল ছাড়া আর কেউ এমন মর্যাদার অধিকারী নয়, যার সমস্ত কথা সর্বাবস্থায় অবশ্য পালনীয় হবে। বরং প্রত্যেকেরই কোনো কোনো কথা গ্রহণযোগ্য আবার কোনো কোনো কথা বর্জনযোগ্য হয়। এতে সাহাবা ও অ-সাহাবার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এদ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের কোনো কোনো কথা দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতে রদ করা যায় আর এরই নাম তানকীদ বা পরখ করা।

ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী মুয়াত্তায় আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে একটি রেওয়ায়েতের উল্লেখ করেছেন যার ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

عن ابن عمر انه قال لابأس بان يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة مالم تكن جنبا اوحائضا ـ(موطاص ٦٤)

"ইবনে উমর বলেন ঃ মহিলা অজু করার পর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষের অযু করতে কোনো দোষ নেই। তবে শর্ত হলো মহিলার নাপাক কিংবা ঋতুবর্তী না হওয়া।"

এ রেওয়ায়েতের পরিপ্রেক্ষিতে আলেমগণ বলেন, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতে ঋতুবতী ও অপবিত্র মেয়েলোকের উচ্ছিষ্ট পানি নাপাক। এমন পানি দ্বারা অযু কিংবা গোসল করা ঠিক নয়। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ মতের তানকীদ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ নাপাক ও ঋতুবতী মহিলার ব্যবহৃত অবশিষ্ট পানি পাক। পানি দ্বারা অযু ও গোসল করাতে কোনো ক্ষতি নেই। এমনিভাবে তাঁদের অযু ও গোসলের পর অবশিষ্ট পানি ব্যবহারেও কোনো ক্ষতি নেই। এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ভাষ্য ঃ

لابأس بفضل وضوء المرأة وغسلها وسورها وان كانت جنبًا او حَائضًا

"স্ত্রী লোকের অযু ও গোসলের পর অবশিষ্ট পানি এবং তাদের উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহারে কোনো দোষ নেই যদিও স্ত্রী লোকটি নাপাক কিংবা ঋতুবতী হয়।"–(মুয়াত্তা পৃঃ ৬৪)

'নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং উম্মেহাতুল মু'মিনীন একই পাত্রের পানি দ্বারা গোসল করে অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করেছেন' এ বাস্তবতার ভিত্তিতে ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতের তানকীদ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

بلغنان ان النبى صلى اللّه عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من اناء واحد يتنازعان الغسل جميعًا فهو فضل غسل المرأة الجنب ـ ١هـ صـ٦٤)

"একথা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা একই পাত্র থেকে পালাক্রমে পানি নিয়ে গোসল করতেন। আর সে পানি ছিলো নাপাক স্ত্রীলোকের ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানি।"

ইমাম মুহাম্মদের এ তানকীদের ব্যাখ্যা প্রসংগে লাক্ষ্ণৌর ফাযেল হযরত মাওলানা আবদুল হাই রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

يشير الى ان تقليد الصحابى واجب وقوله حجة عندنا مالم ينفه شئ من السنة وقد صرح به ابن الهمام فى كتاب الجمعة من فتح القدير وههنا قد نفى قول ابن عمر ورده بسنة فالعبرة بالسنة الابه ـ اهـ

"এতে একথারই ইংগিত পাওয়া যায় যে, সাহাবার কথার তাকলীদ করা ওয়াজিব এবং তাঁদের কথা আমাদের জন্যে হুজ্জত বা দলীল যদি সে কথা হাদীসের খেলাফ না হয়। ইবনে হুমাম রাহমাতুল্লাহ আলাই ফতহুল কাদীরে 'জুময়া' অধ্যায়ে একথাটির বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এখানে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর রায় হাদীস দ্বারাই খণ্ডন করেছেন। সুতরাং হাদীসই গ্রহণযোগ্য হবে, সাহাবার কথা নয়।"

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ব্যাখ্যা

ইমাম শাফেয়ী রাহতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঃ

لاحجة فى قول احدون رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم وان كثروا ـ لافى قياس ولا فى شىءٍ وما ثم الا طاعة اللّٰه ورسوله ـ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারো কথা হুজ্জত নয় যদিও তারা সংখ্যায় অনেক হয়। কিয়াস কিংবা অন্য কোনো বস্তুতেও হুজ্জত হতে পারবে না। এখানে শুধুমাত্র আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলেরই আনুগত্য করতে হবে। অন্য কারো নয়।"—(হুজ্জাতুল্লাহ পৃঃ ৩৭১)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ব্যাখ্যা

অপরাপর ইমামদের মতো ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বলও বলেন ঃ

ليس لاحد مع اللّٰه ورسوله كلام

"আল্লাহ ও রসূলের মুকাবিলায় কারো কোনো কথা বলার অধিকার নেই।"
—(হুজ্জাতুল্লাহ খঃ ১ পৃঃ ৩৭১)

উপরোক্ত কতিপয় উদাহরণ নমুনা স্বরূপ পেশ করা হলো। অন্যথায় এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে যাতে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহর মুকাবিলায় সাহাবীদের বিভিন্ন কথা ও ফতওয়া অগ্রহণীয় মনে করা হয়েছে। একথাটি একটি ইজমার মতো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কোনো আলেম এতে দ্বিমত পোষণ করেছেন বলে উল্লেখ নেই।

www.pathagar.com

শায়খ ইবনে হুমামের ব্যাখ্যা

এ কারণেই শায়খ ইবনে হুমাম ফতহুল কাদিরের 'জুময়া' অধ্যায়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

والحاصل ان قول الصحابى حجة فيجب تقليده عندنا مالم ينفه شيىء اخر من السنة ـ

"মোটকথা, আমাদের মতে সাহাবীর কথা হুজ্জত এবং তার তাকলীদ করা ওয়াজিব যদি তা কোনো হাদীসের খেলাফ না হয়।"

তানকীদ (যাচাই ও পরখ করা) প্রসংগের সারমর্ম

তানকীদ প্রসংগে উপরে যে আলোচনা হয়েছে তার সারমর্ম নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

এক ঃ আরবী ভাষায় 'তানকীদ' শব্দের দু'টি অর্থ। এক, দোষ তালাশ করা, ছিদ্রান্বেষণে নিয়োজিত থাকা। দুই, যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পরখ করা। অর্থাৎ কোন বস্তু গ্রহণযোগ্য কিংবা গ্রহণযোগ্য নয় তা দলীল ও যুক্তির নিরিখে অবলোকন করা।

দুই ঃ দোষ তালাশের অর্থে কোনো সাহাবা এবং আলেমের তানকীদ করা তো দূরের কথা একজন সাধারণ মুসলমানেরও এ ধরনের তানকীদ করা জায়েয নয়। কেননা এটা একটি হারাম অন্বেষণ যা শরীয়তের দৃষ্টিতে কারো জন্যেই জায়েয নয়। তবে এরূপ তানকীদ করার সাথে যদি দীনের এমন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এবং মহান শরীয়াতের কল্যাণ সম্পৃক্ত হয় যা না করলে তা ব্যাহত হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জারাহ ও তাদীলের অবস্থায় (হাদীস বর্ণনাকারী বা রাবীদের দোষ-গুণ পর্যালোচনা করার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ) হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ রাবীদের এ ধরনের তানকীদ করেছেন।

তিন ঃ যাচাই-বাছাই ও পরখ করা অর্থে যে তানকীদ তা এমন প্রত্যেকটি কথা ও কাজের করা যায় যার মধ্যে ভুল ও নির্ভুল উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যে কথা ও কাজ ভুল হওয়া সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ এবং যার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত এমন কথা ও কাজে এ ধরনের তানকীদ করা যাবে না।

যেহেতু নবী আলাইহিমুস সালামগণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিই মাসুম নয় ; সুতরাং ব্যক্তির কথা ভুলের আশংকা থেকে মুক্ত হতে পারে না। অতএব, সে তানকীদেরও উর্ধে হতে পারে না। আর নবীগণ যেহেতু নিসন্দেহে অকাট্যভাবে

www.pathagar.com

মা'সুম সুতরাং তাঁরা সব ধরনের তানকীদের উর্ধে এবং তাঁরা স্বতঃই সত্যের মানদণ্ড বা কষ্টিপাথর।

চার ঃ যাচাই-বাছাই ও পরখ করার অর্থে যে তানকীদ তা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস উভয়েরই সমর্থন রয়েছে। যতোবড় বুযর্গই হোক না কেন তার কথা কুরআন ও হাদীসের নির্ধারিত মানদণ্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করা হবে। যে কোনো কথা সেই বাছাই ও নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তা গ্রহণীয় হবে। আর উত্তীর্ণ না হলে পরিত্যক্ত হবে।

পাচ ঃ এ ধরনের তানকীদ জায়েয হওয়া নবীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মিরাযের ব্যাপারে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু ফতওয়ার তানকীদ করেছেন। এমনিভাবে অধিক পরিমাণে মোহর দাবী করার ব্যাপারে একজন মহিলা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তানকীদ করেছেন। এসব তানকীদ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সম্মানিত সাহাবীগণ একে অপরের এ ধরনের তানকীদ করাকে না জায়েয মনে করতেন না। এবং এ ধরনের তানকীদ করাকে অবজ্ঞা বা হেয়প্রতিপন্ন করারও ধারণা করতেন না। অন্যথায় আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত ইবনে মাসউদের এ তানকীদ সম্পর্কে একথা বলতেন না لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين (আমি তো পথভ্রষ্ট দিশেহারাদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।)

لاتسئلو نى ما دام هذا الحبر فيكم

"ইলমের অতলান্ত সাগরসম ব্যক্তি [ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু] তোমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় আমাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না।"

এমনিভাবে একজন মহিলার এ তানকীদের ঃ

انتبع قولك ام قوله اللّه عز وجل واتيتم احدا هن قنطارا

[উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তোমার কথা অনুসরণ করবো নাকি আল্লাহর কথা ? আল্লাহ বলেছেন ঃ আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের অধিক পরিমাণে মোহর দিয়েছো।] জবাবে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন না كل احد اعلم من عمر تزوجوا على ماشئتم "প্রত্যেকেই উমরের চেয়ে অধিক জ্ঞানী তোমরা যতো ইচ্ছা মোহরের বিনিময়ে বিয়ে শাদী করো।"

ছয় ঃ সাহাবায়ে কিরাম একে অপরের এ ধরনের তানকীদ করতেন যেমনিভাবে করতেন তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীগণ। সাহাবীদের কথার দলীলের ভিত্তিতে তানকীদ করা হতো। এরূপ তানকীদ করাকে কেউ কখনো অবজ্ঞা বা হীন করা মনে করেননি।

সাত ঃ নিম্নবর্ণিত তিনটি বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামদের তানকীদ করা যাবে না। (ক) কুরআনের বর্ণনায় ও হাদীসের রেওয়ায়েতে (খ) দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ এবং আকীদাগত বিষয়ে (গ) দীনের ব্যাপক নক্সা এবং বিস্তীর্ণ নিয়ম-কানুনে যার মধ্যে আকীদা, ফরায়েজ, দীনের বিস্তারিত বিবরণ এবং নৈতিকতার নিয়ম-পদ্ধতি সবই শামিল আছে।

আট ঃ অন্যান্য মুজতাহিদদের মুকাবিলায় সম্মানিত সাহাবীদের ব্যক্তিগত কথা ও ইজতেহাদী (উদ্ভাবনী) ফায়সালার তাকলীদ (অনুকরণ) করা ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং আবু সায়ীদ বুরদায়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রমুখের মতে ওয়াজিব। তবে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইমাম আবুল হাসান কারখী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে সাধারণভাবে ওয়াজিব নয়। বরং ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে সাহাবীর কথার তাকলীদ করা কখনো ওয়াজিব নয়। ইমাম কারখী রাহমাতুল্লাহ বলেন, কিয়াস বিরোধী মাসয়ালায় সাহাবীর কথা যদিও হুজ্জত এবং তাকলীদ যোগ্য হয় কিন্তু কিয়াসের অনুকূল মাসয়ালায় তাকলীদ যোগ্য নয়। এ অবস্থায় ইমাম কারখীর মতে সাহাবার কথা তানকীদ করা থেকে মুক্ত ও পবিত্র নয়।

নয় ঃ কুরআন ও হাদীসের মুকাবিলায় সাহাবীর কথা সর্বসম্মতিক্রমে তাকলীদ যোগ্য নয়। বরং বর্জন করা ওয়াজিব। অনেক দীনি মাসয়ালায় হাদীসের মুকাবিলায় সাহাবীর কথা পরিত্যক্ত হয়েছে। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূলুল্লাহর মুকাবিলায় সাহাবীর কথা অনুসরণ যোগ্য নয় এবং সেগুলোর তাকলীদ করাও জায়েয নেই—একথা ইমাম ও আলেমগণ নিজেদের রচিত কিতাবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

এ হলো বিষয়টির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। এবার আমরা উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে দেখবো যে, মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আহলে ইলমগণ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ছাড়া সাহাবা অথবা অপরাপর ইমাম যে কেউ হোক না কেন তাদেরকে তানকীদের উর্ধে মনে করে না, একথা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য কি এবং এ দাবী কতটুকুই বা সঠিক ?

এ বিষয়ের ওপর তাদের লিখিত বই-পুস্তক, প্রবন্ধ আমরা যতোটুকু অধ্যয়ন ও চর্চা করেছি তার প্রেক্ষাপটে বুঝতে পারছি না যে, তাদের অভিমত এবং তানকীদের ব্যাপারে তাদের এ দৃষ্টিভংগী—আল্লাহর রসূল ছাড়া কেউ সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড নয় আর কোনো ব্যক্তিই তানকীদের উর্ধে নয়।” বিগত

www.pathagar.com

ইমাম ও আলেমদের দৃষ্টিভংগি থেকে কেমন করে ভিন্নতর হলো ? কুরআন ও হাদীস যখন নবীগণ ছাড়া অন্য কাউকে সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড হিসেবে ঘোষণা করেনি, কাউকে তানকীদের ঊর্ধে বলেও প্রমাণ করেনি, সাহাবীগণও একে অপরের এমনি ধরনের তানকীদ করতেন, দীনের ইমামগণও কুরআন ও হাদীসের নিরিখে সাহাবীদের কথা ও ফায়সালাকে যাচাই-বাছাই ও পরখ করতেন এবং এভাবে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কতিপয় কথা গ্রহণ করেন এবং কোনো কোনো কথা বর্জন করেন, বরং কেউ কেউ তো সাহাবীর কথা হুজ্জত না হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। তাহলে মাওলনা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্ডিত মহোদয়গণ যারা জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ৬নং ধারায় "আল্লাহর রসূল ছাড়া কাউকে সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড না বানানো এবং কাউকে তানকীদের ঊর্ধে মনে না করার যে কথা লিখেছেন, তাদেরকে পরিশেষে কোন্ আইনের ভিত্তিতে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট বলে ঘোষণা দেয়া যেতে পারে ; যখন মাওলানা মওদূদীর অনেক আগে আগেকার আলেম ও ইমামগণ এ বিষয়টিকে আকীদা ও একটি বিধানরূপে গ্রহণ করে নিয়েছেন ? মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর আহলে ইলমগণ তানকীদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হলো সাহাবীর কথা স্বতই শুধু ব্যক্তিত্বের কারণে হুজ্জত এবং অবশ্য পালনীয় হতে পারে না। বরং কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য হওয়ার ভিত্তিতেই হুজ্জত এবং অবশ্য গ্রহণীয় রূপে ঘোষিত ও সাব্যস্ত হতে পারে। যখনই কথাটি কুরআন ও হাদীসের খেলাফ বলে প্রমাণিত হবে তখনই সেটা পরিত্যাজ্য হবে। এভাবে মত পোষণ করা এমন একটি আকীদা ও অভিমত যার ওপর গোটা আলেম সমাজ ঐকমত্য পোষণ করে আসছেন।

হাঁ, যদি মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর আহলে ইলম মহোদয়গণ তানকীদ দ্বারা অবজ্ঞা ও ঘৃণা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন অথবা দোষ তালাশ ও দোষ চর্চা করার অর্থ করে থাকেন তাহলে আমরা তাদের এ আকীদাকে সুস্পষ্টভাবে বিভ্রান্তিকর ও গোমরাহ এবং এ দৃষ্টিভংগীকে বাতেল বরং যিন্দিক বলে ঘোষণা করে দিবো। কেননা এ অর্থে সাহাবায়ে কিরামদের তানকীদ করাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত গোমরাহ ও যিন্দিক (আল্লাহর একত্ববাদে অবিশ্বাসী) বলে ঘোষণা করেছেন। শায়খুল হাদীস হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর প্রণীত সম্ভবত আল ইসাবায় সাহাবীদের এমন ধরনের তানকীদ করাকে 'যিন্দিক' বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই যখন বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, তানকীদ দ্বারা অবজ্ঞা করা কিংবা হেয় করা উদ্দেশ্য নয় এবং অপরের দোষ তালাশ করা বা ছিদ্রান্বেষণ করাও আমাদের লক্ষ্য নয় ; বরং আল্লাহর রসূল ব্যতিরেকে সাহাবায়ে

www.pathagar.com

কিরাম অথবা অন্যান্য বুযর্গানে দীন তথা গোটা মানব গোষ্ঠীর কথা ও কাজ কুরআন ও হাদীসের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই এবং পরখ করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ বাছাই ও নিরীক্ষায় যে কথা ও কাজই পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হবে তা গ্রহণীয় হবে আর পুরাপুরিভাবে উত্তীর্ণ না হলে পরিত্যক্ত হবে। এমতাবস্থায় তাঁকে গোমরাহ বলার দুঃসাহস সে ব্যক্তিই করতে পারে যে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে ঈর্ষা পোষণ করে থাকে। অথবা যে এ বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানও রাখে না। নিম্নে মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাপর আলেম ও জ্ঞানী-গুণী লোকদের এ বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বিবরণ উল্লেখ করা হলো। যাতে করে এখানে তানকীদ করার উদ্দেশ্য কি তা জানা যায় এবং কোন্ অর্থে সাহাবীদের তানকীদ করাকে জায়েয মনে করা হয়?

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ব্যাখ্যা

এ মাসয়ালা সম্পর্কে কেউ ব্যাখ্যা চেয়ে মাওলানা মওদূদীকে প্রশ্ন করেন —'সম্মানিত সাহাবীর তানকীদ করাকে আপনি কি জায়েয মনে করেন?' মাওলানা প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন ঃ

"আপনি আপনার ১৩নং অভিযোগে যে অর্থে তানকীদ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন সে অর্থে সাহাবীর তানকীদ করাতো দূরের কথা একজন সামান্য মুসলমানের এ ধরনের তানকীদ করাও আমার মতে সাংঘাতিক গোনাহের কাজ। অবশ্য আহলে ইলমদের মহলে তানকীদের যে অর্থ পরিচিত ও খ্যাত সে অর্থে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ ছাড়া কোনো মানুষকেই তানকীদের উর্ধে বলে আমি স্বীকার করি না। কোনো সাহাবীর কথা অথবা কাজ নিছক ব্যক্তিত্বের কারণেই দলীল নয়। বরং বিষয়টি গ্রহণ করা হবে কি হবে না তা সাহাবীর দলীল প্রত্যক্ষ করে রায় দেয়া হবে। দলীল হিসেবে কারো কথা যাচাই-বাছাই করার নামই তানকীদ। আর এ ধরনের তানকীদ করা কোন যুগে নাজায়েয ছিলো তা আমার জানা নেই। ফিকাহের অনেক মাসয়ালায় বিভিন্ন সাহাবীর বিভিন্ন উক্তিমূলক ও কর্মমূলক 'আসার' পাওয়া যায়। আমরা দেখি তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, ইমাম ও মুজতাহিদগণ দলীলের ভিত্তিতে সে সব আসারে কোনোটা গ্রহণ করেছেন আবার কোনোটা বর্জন করেছেন।

আপনি ফিকাহ শাস্ত্রের বিশদ বিবরণ সম্বলিত যে কোনো কিতাব খুলে দেখুন। এ ধরনের তানকীদের হাজার হাজার উদাহরণ পেয়ে যাবেন। যারা সাহাবীদের বিভিন্ন কথা ও কাজের পরীক্ষা ও যাচাই কার্য চালিয়েছেন তারা সকলেই কি আপনার মতে গোনাহগার ছিলেন?

www.pathagar.com

اصحابی کالنجوم। হাদীসটির তাৎপর্য যদি আপনি একথা গ্রহণ করেন যে, প্রত্যেক সাহাবীর কথা ও কাজের অনুসরণ করা ওয়াজিব, তাহলে এ তাৎপর্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো আলেম সমর্থন করেছেন বলে আমি পাইনি। আপনি পেয়ে থাকলে তাঁর নাম আমাকেও বলবেন। তবে সমগ্র জাতি নিজেদের দীনের প্রতিটি ব্যাপারে কোনো না কোনো সাহাবীর মাধ্যমেই পথনির্দেশনা লাভ করে থাকে। আর হাদীসটির উদ্দেশ্য এটাই।"-(তরজুমানুল কুরআন খঃ ৪৬ সংখ্যা ঃ ৩ মে, ১৯৫৬ইং)

এ মাসয়ালা সম্পর্কে মাওলানার কাছে অন্য একটি ব্যাখ্যা চেয়ে প্রশ্ন করা হলো—"যদি সাহাবীদের তানকীদ করা জায়েয সাব্যস্ত হয় তাহলে তানকীদ করার ফলে কুরআন হাদীসে বর্ণিত সাহাবীদের ফযীলত ও প্রশংসা স্বীকার করা ওয়াজিব থাকে না।" এর জবাবে মাওলানা নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেন ঃ

"তানকীদের অর্থ দোষ চর্চা করা একথাটা একটি অজ্ঞ জাহেল লোক তো মনে করতে পারে কিন্তু কোনো বিজ্ঞ জ্ঞানী লোক থেকে এ আশা করা যায় না যে, তিনিও শব্দটির এ অর্থই বুঝবেন। তানকীদের অর্থ যাচাই-বাছাই ও পরখ করা। এবং উপরোল্লেখিত গঠনতন্ত্রে এ অর্থের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তারপরও শব্দটির দ্বারা দোষ চর্চা ও ছিদ্রান্বেষণ করার বিকৃত অর্থ কেবল সে ব্যক্তিই গ্রহণ করতে পারে, যে ফিতনা প্রিয় ও অশান্তি সৃষ্টির প্রয়াসী। উপরন্তু সে বাক্যে একথারও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রসূলকে সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড ঘোষণা করার পর সে নিরিখে যার যে মর্যাদা সাব্যস্ত হবে তাকে সে স্তরেই রাখা হবে।" এ দ্বারা একথা কিভাবে প্রতীয়মান হলো যে, তাতে কুরআন হাদীসে বর্ণিত সাহাবীদের ফযীলত ও মর্যাদা মেনে নেয়া ওয়াজিব থাকে না ? কোনো একজন বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোকও একথা বলতে পারবে কি যে, রসূলকে সত্যের মাপকাঠি স্বীকারকারীর সামনে যখন রসূলের আনীত পবিত্র কালামুল্লাহ ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কোনো ব্যক্তি বা দলের প্রশংসা ও ফযীলত উপস্থাপন করা হবে তখন সে এ গুণাবলীকে স্বীকার করা ওয়াজিব বলে অস্বীকার করে বসবে ? এ আজব ধরনের স্তুতিমূলক অর্থ যদি অসৎ উদ্দেশ্যে না হয়ে থাকে তাহলে তো এমন জ্ঞানের জন্যে রোনাজারি করা উচিত। (জামায়াতে ইসলামী কি হকের পথে ?)

তারপর অপর একজন দায়িত্বশীল রোকন ও জামায়াতের একজন নেতার ব্যাখ্যা পেশ করা হচ্ছে ঃ

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর ব্যাখ্যা

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী সাহেব বর্তমানে যদিও জামায়াত থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে গেছেন, কিন্তু যে সময় সাহাবীর তানকীদ

www.pathagar.com

প্রসংগটির জোর আলোচনা চলছিলো তখন তিনি মজলিসে শূরার একজন দায়িত্বশীল সদস্য ছিলেন এবং সাংগঠনিক কমিটিরও তিনি একজন মেম্বার ছিলেন। তিনি তানকীদ প্রসংগে একটি প্রশ্নের জবাবে যা লিখেছেন তা নিম্নরূপঃ

জবাব

মুকাররামী ও মুহেব্বী,
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত বাক্যের ওপর যেসব ভদ্র মহোদয়গণ আপনাদের উদ্বৃতি দেয়া অভিযোগসমূহ উত্থাপন করেছেন আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আপনি তো শুধু অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছেন, অথচ কোনো কোনো মহল থেকে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়াও বের হয়েছে বলে আমি জানতে পেরেছি। সেসব লোকদের প্রতিভার প্রশংসা করতে হয় যারা এমন যুক্তিসংগত বরং ঈমান সম্বলিত বাক্যের অভ্যন্তর থেকেও কুফরী অনুসন্ধান করে বের করে।

এমন সত্য সনাতন বাক্যের ওপর কুফরী ফতওয়া প্রকাশ হওয়ার পর আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা সেসব ভদ্রমহোদয়গণের কাছে এবার যদি খালেস কুরআনও উপস্থাপন করেন তাহলেও তারা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। উপস্থাপিত কুরআন থেকে কোনো না কোনো কুফরীর লেশ বের করে উপস্থাপনার কারণেও কুফরীর ফতওয়া তাদের গায়ে সেঁটে দিবে। এমন প্রকৃতির লোকদের যে কোনোভাবেই নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত করা যাবে আমি সে সম্পর্কে আশাবাদী নই। সুতরাং এসব প্রশ্নের জবাব লিখতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করতে আমার মস্তিষ্ক কিছুতেই তৈরি ছিলো না। কিন্তু আপনার পীড়াপীড়িতে বরং জবরদস্তীতে একথাগুলো লিখতে বাধ্য হলাম। মনে রাখবেন, এতে যে সময় ব্যয় হবে তা আমি আপনার হিসেবের খাতায় লিখবো।

প্রশ্নগুলোর ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত জবাব এরূপ

(১) গঠনতন্ত্রের এ ধারাটি জামায়াতের সদস্যদের একথা বলার জন্যে সংযোজিত হয়নি যে, কার কার দোষ বের করে তার সমালোচনা করা যাবে আর কার কার যাবে না। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা ইকামাতে দীনের জন্যে হয়েছে। কারো দোষ চর্চা করার জন্যে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি যে, সে সম্পর্কে বিশেষভাবে একটি ধারা সন্নিবেশিত করা দরকার। আবার তাও এমন মৌলিক আকীদা হিসেবে যাতে জামায়াতের সদস্যগণ রসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া সমস্ত নবী ও গোটা উম্মতের দোষ নিয়ে আলোচনা সমালোচনাকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস বানিয়ে নেয়।

www.pathagar.com

তানকীদ শব্দের অর্থ যাচাই-বাছাই ও পরখ করা। ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি একমাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে একথা বলাই উদ্দেশ্য। কারো কোনো কথা নবীর কথা ও কাজের খেলাফ হলে তা কখনো দলীল হতে পারে না। এ ধারাটি বিন্যস্ত করার সময় আগেকার নবীদের প্রশ্ন যদিও আলোচ্য বিষয় ছিলো না বরং এ উম্মতের বিভিন্ন স্তরের লোকদেরকে কেন্দ্র করে ছিলো যারা স্বতঃই সনদ ও দলীল নয় বরঞ্চ সকলের কাজ ও কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত প্রকৃত মানদণ্ডের নিরিখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করার পরই হুজ্জত বা দলীল হতে পারে। কিন্তু তবুও এক্ষণে আমি এ আরয করছি যে, হুবহু এ নীতিটিই বিগত নবীদের বেলায়ও সরাসরি প্রযোজ্য। আমরা বিগত নবীদের তালীম ও হিদায়াত তো দূরের কথা স্বয়ং তাদের নবুয়াতকে এ কারণেই স্বীকার করি যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নবুয়াতকে সত্যায়িত করেছেন। যদি আমাদের নবী তাদের নবুয়াতকে সত্যায়িত না করতেন তাহলে আমরা তাদের কাউকে নবী হিসেবে গ্রহণ করতাম না। যখন তাদের নবুয়াত মূলত আমাদের নবীর সত্যায়ন ব্যতিরেকে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না তখন তাদের কথা ও কাজ স্বতই সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি হওয়ার অর্থ কি ?

বিগত নবীদের শিক্ষা অধিকাংশ হারিয়ে গেছে। তাদের শিক্ষার মধ্যে বিকৃতিও ঘটেছে। তাদের জীবনালেখ্যের অধিকাংশ প্রমাণবিহীন কিংবদন্তীর সমষ্টিরূপে আছে। তাদের শরীয়াতের অনেক আদেশ নিষেধ কুরআন দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অধিকন্তু তাদের শরীয়াতেও অনেক অপূর্ণতা ছিলো যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়াত দ্বারা পূর্ণতা লাভ করেছে। এ কারণে আমাদের জন্যে শুধু সেসব বস্তুই গ্রহণযোগ্য হবে যা আমরা কুরআন হাদীসের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়েছি। তাও আবার এ ভিত্তিতে নয় যে, সাবেক নবীদের তালীম আমাদের জন্য করণীয় বরং এ ভিত্তিতে যে, ইসলামী শরীয়াত এগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ কাঠামো থেকে মুক্ত হয়ে যদি আমরা বিগত নবীদের অনুসারীগণ কর্তৃক পেশকৃত সেসব নবীগণ সম্পর্কিত প্রত্যেক সাধারণ-অসাধারণ কথা গ্রহণ করি তাহলে আমরা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীতে পতিত হবো। অতএব, অতীত নবীগণ সম্পর্কে আমাদের সঠিক নীতি এটাই যে, তাঁদের যেসব জিনিস কুরআন সত্য বলে ঘোষণা করেছে সেগুলোকে আমরা সত্যরূপে গ্রহণ করবো আর যেগুলোকে খণ্ডন করেছে সেগুলো আমরা বাদ দিবো। আর যেগুলো সত্যও বলেনি আবার বাদও দেয়া হয়নি, সেগুলোর সত্য মিথ্যা কোনোটাই করবো না।

গঠনতন্ত্রের উল্লেখিত বাক্যে তানকীদ শব্দ থাকার কারণে যদি কোনো ব্যক্তি জালিয়াতি ও ধোঁকাবাজির অভিপ্রায়ে পূর্ববর্তী নবীদেরকেও তার লক্ষ্যস্থল

www.pathagar.com

বানাতে অনমনীয় থাকে তাহলে তার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ হলো আপনি অন্তত এতটুকু বুঝে নিন যে, তানকীদ শব্দের অর্থ দোষ তালাশ বা ছিদ্রান্বেষণ নয়। জাহেল ও মূর্খ মহলে শব্দটির প্রয়োগ হলে সে ক্ষেত্রে তানকীদ শব্দের অর্থ দোষ তালাশ করা বা ছিদ্রান্বেষণ করা সম্ভব হতো। কিন্তু আহলে ইলম বা বুদ্ধিজীবীগণ শব্দটিকে এ অর্থে প্রয়োগ করেন না। বরং যাচাই-বাছাই ও পরখ করার অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। আমি আগেই বলেছি যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরখ করা অর্থে শব্দটির প্রয়োগ সঠিক ও যথার্থ যে, নবীদের কোনো কিছুই খাতামুন নাবীয়ীন এর প্রদত্ত সত্য ও ন্যায়ের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই ও পরখ করা ছাড়া আমরা গ্রহণ করতে পারি না। আমরা তো দূরের কথা পূর্ববর্তী কোনো নবীও যদি নতুন করে পৃথিবীতে আগমন করেন তিনিও আমাদের শেষ নবীর দেয়া মানদণ্ডে বাছাই ও নিরীক্ষা করেই সবকিছু মানবেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই (অনুসরণ) করবেন। এ সত্যটি খোদ নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন ঃ

عن جابر عن النبی صلی الله علیه وسلم حین اتاه عمر رضـ فقال انا نسمع احادیث من یهود وتعجبنا افتری ان نکتب بعضها فقال امتهوکون انتم کما تهوکت الیهود والنصاری لقد جئتکم بها بیضا نقیة ولو کان موسی حیًا ماوسعه الا اتباعی ـ

"হযরত যাবের রাদিয়াল্লাহ আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। একবার হযরত উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে আবেদন করলেন আমরা ইহুদীদের থেকে এমন অনেক কথা শুনি যা আমাদের কাছে খুবই পসন্দনীয় মনে হয়। সেসব কথার উপকারী বাণীগুলো আমাদের লিখে নেয়া কি আপনি সংগত মনে করেন ? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরাও কি ইহুদী নাসারাদের মতো বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হতে চাও ? আমি এ শরীয়াতকে তোমাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করেছি। যদি মূসাও (আলাইহিস সালাম) জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তারও কোনো গত্যন্তর থাকতো না।"

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সম্পর্কে কেউ এমন ধারণা করতে পারবে না যে, তিনি ইহুদীদের এমন সব কথা পসন্দ করতেন যেগুলোকে 'ইসরাঈলীয়াত' বলা হয়। তিনি যদি পসন্দ করে থাকেন তাহলে এমন কথাই

www.pathagar.com

পসন্দ করেছেন যা বাস্তবিকই পসন্দ করার যোগ্য। কিন্তু নবী আলাইহিস সালাম সেগুলো টুকে রাখাও পসন্দ করলেন না। বরং কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারক ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠেছিলো। রসূলের আগমনের পর পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের তালীম ও তারবিয়াতকে অনুসরণ করা রসূলের অনুমতি ও সমর্থন ছাড়াই যদি সঠিক হতো তাহলে তা থেকে বিরত রাখতে এবং রসূলের চেহারা মুবারক ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠার হেতু কি ছিলো ? রসূলের দেয়া সত্য ন্যায়ের মানদণ্ডে যাছাই ও পরখ করা ছাড়াই যদি জানা যেতো যে, নবীগণের আনিত শিক্ষার কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি অসত্য, কোন্‌টি গ্রহণ করার স্বাধীনতা আছে এবং কোন্‌টি গ্রহণ করার স্বাধীনতা নেই, তাহলে তোমরা এভাবে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে না এবং তোমরাও কি ইহুদ ও নাসারাদের মতো বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে যাবে ? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা বলার কি কারণ থাকতে পারে ?

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরও তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো নবী বা রসূলের অনুসরণ যদি জায়েয হতো তাহলে তিনি কেন বললেন, যদি আজ মূসা আলাইহিস সালামও জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর কোনো উপায় থাকতো না ?

ঈমান সম্পর্কে বললে বলতে হয় যে, আমরা নবী ও রসূল হিসেবে সমস্ত নবীদের ওপর নিসন্দেহে ঈমান রাখবো আর 'ইত্তেবা' বা অনুসরণ করার ব্যাপারে বললে বলতে হয় আমরা কেবলমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই অনুসরণ অনুকরণ করবো। তাঁকে অনুসরণ করাই প্রকারান্তরে সমগ্র নবীদেরকে অনুসরণ করা। কেননা, পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষা ও হিদায়াতের বিশুদ্ধতা জানা এবং তাদের শিক্ষার কোন্ কোন্ কথা আজকের দীনে কাঙ্ক্ষিত ও কাঙ্ক্ষিত নয় তা জ্ঞাত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলেন বিশ্ব নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা। যদি কেউ রসূলের দেয়া কষ্টিপাথরে যাচাই ও নিরীক্ষা ব্যতিরেকে নিজেই কোনো বস্তুকে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সেটা নবীর শিক্ষা না হয়ে বরং বিকৃতকারীদের বিকৃতি হতে পারে। অথবা নবীর শিক্ষা তো ঠিক কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সে শিক্ষা শেষ নবীর মাধ্যমে রহিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার হিদায়াত জানা এবং হিদায়াতকে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সমস্ত উপায় রসূল ছাড়া সন্দেহযুক্ত। এ কারণে পূর্ববর্তী নবীদের মধ্য থেকে কোনো নবীর কথাই ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়, যতক্ষণ না সে কথাটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেয়া মাদদণ্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া না যাবে।

www.pathagar.com

পূর্ববর্তী নবীগণ সম্পর্কে আমি যাকিছু পেশ করলাম হুবহু সে কথাগুলো সাহাবীদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সাহাবীদের মধ্যে কেউ এ মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হননি যে, তিনি দীনের ব্যাপারে নিজেই হুজ্জত বা দলীল এবং তার প্রতিটি কথা রসূলের দেয়া মানদণ্ডে নিরীক্ষা করা ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যায়। শরীয়াতের ব্যাপারে কোনো কথা বলা তখনই বৈধ হবে যখন তাদের কাছে তার সমর্থনে রসূলের সনদ থাকবে। তাদের কোনো কথা স্বীকার করা তখনই আমাদের জন্যে জরুরী যখন সে কথাটি রসূলের দেয়া সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ডে যাচাই করার পর কথাটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হবো। সাহাবীর কথা যদি দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এ ধারণার ভিত্তিতে যে, তাঁরা যাকিছু বলেছেন তা রসূল থেকে শুনেই বলে থাকবেন। সুতরাং রসূলের কথা যদি সাহাবীর কথার বিপরীত হয় অথবা অন্য একজন সাহাবীর কথার বিপরীত হয়, তাহলে সাহাবীর সে কথাটির মর্যাদা একটি উক্তি বৈ আর কিছুই নয়। রসূলের বাণীর সাথে সাহাবীর যে কথা সাংঘর্ষিক তার আদৌ কোনো মূল্য নেই। আর অপর কোনো সাহাবীর কথার পরিপন্থী, কথার দুর্বলতা ও সবলতা, ন্যায় ও সত্যের মানদণ্ডে উত্তরণের উপর নির্ভর করে।

আমাদের ফিকাহ শাস্ত্রের মতবিরোধ হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ এটাই। উদ্ভাবিত মাসয়ালার কেউ সাহাবীদের মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন আবার কেউ অপর কোনো অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এটা বলা বাহুল্য যে, যেখানে একজনকে অপরজনের উপর প্রাধান্য দেয়ার প্রশ্ন উঠে সেখানে তানকীদ করা জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে বিভিন্ন কথার অনিবার্যরূপে পরখ করে দেখতে হয় যে, কার কথা নির্ভুল ও বিশুদ্ধ হওয়ার কাছাকাছি আর কার নয়।

পরিশেষে, চিন্তার বিষয় হলো সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব কেন নিজের ফিকাহর বুনিয়াদ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালার উপর রাখলেন ? আবার হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুই বা কেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালাকে বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করলেন। অপর দিকে ইবরাহীম নাখয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের ফিকাহর বুনিয়াদ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালার ওপর রাখলেন। এর কারণ তো এটাই যে, তানকীদ করার মানদণ্ডে যাচাই-বাছাই করার পর প্রথমে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ মক্কা ও মদীনার উল্লেখিত সাহাবীদের ইজতিহাদকে অধিকতর মযবুত ও দৃঢ় মনে করেছেন। আর সে মানদণ্ডে যাচাই করার পর পরবর্তী লোকগণ সাহাবীদের ইজতিহাদ ও গবেষণাকে অধিকতর মযবুত ও দৃঢ় মনে করেছেন।−(কিয়া জামায়াতে ইসলামী হকপর হ্যায় দ্রষ্টব্য)

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামী নেতৃবৃন্দের এরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়ার পর তানকীদ ও সত্যের মাপকাঠি প্রসংগে তাদের ভূমিকা কেমন করে ভুল হতে পারে তা আমরা বুঝতে পারছি না। তাদের এমন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারা যে সত্যটি আমাদের সামনে ফুটে উঠে তা হুবহু তাই যা আজ থেকে শত শত বছর আগেকার খ্যাতনামা ও বিজ্ঞ আলেমগণ পেশ করেছিলেন। তাদের অনুসৃত মত ও পথ সম্পর্কে আপনি বড়জোর একথা বলতে পারেন যে, আমরা তার সাথে একমত নই। আমরা সাহাবীদের তাকলীদ করা জরুরী মনে করি। তা কুরআন ও হাদীসের দলীল ভিত্তিক আহকামের খেলাপই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। যে কোনো মতামত পোষণ করার অধিকার আপনার আছে।

কিন্তু আপনার এ অধিকার আদৌ নেই যে, আপনি এমন একটি মত ও পথকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা বলে ঘোষণা করবেন যার সমর্থনে অধিকাংশ আলেমগণ মত প্রকাশ করেছেন অথবা মুসলিম মিল্লাতের আগেকার আলেম ও গবেষকদের একটি বিরাট দল এটাকেই অভিমত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। উপরে বিষয়বস্তুর যে ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে তার আলোকে এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ইজমার মর্যাদা লাভ করেছে যে, কুরআন ও হাদীসের মুকাবিলায় কারো কথাই হুজ্জত বা দললী নয় এবং অনুসরণ যোগ্যও নয়। যেসব কথা কুরআন ও হাদীস বিরোধী হওয়া সম্পর্কে জানা যায় না সেগুলোর তাকলীদের ব্যাপারেও আলেমগণ পারস্পরিকভাবে ঐকমত্য পোষণ না করে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আগের আলোচনায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। জামায়াতের মতামত তাদের অনেকের মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই গৃহীত ও স্বীকৃত মতকে কতিপয় ব্যক্তি কি এমন দলীলের ভিত্তিতে ভুল বরং গোমরাহী ঘোষণা করলেন তা আমরা জানি না।

এ অভিমত সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো এটা এমন একটি মত ও পথ যে সম্পর্কে বড় বড় আলেমগণ ইজমা হওয়ার দাবী পর্যন্ত করেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

وقد صح اجماع الصحابه كلهم اولهم عن اخرهم واجماع التابعين رح اولهم عن اخرهم واجماع تابعى التابعين اولهم عن اخرهم على الامتناع والمنع من ان يقصد منهم احد الى قول انسان منهم او ممن قبلهم فياخذه كله -

"এ বিষয়ে সমগ্র সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের ইজমা হয়ে গেছে যে, কেউ সমকালীন বা আগেকার যে কোনো মানুষের সব কথা

www.pathagar.com

মানতে এবং তার প্রত্যেকটি কথা গ্রহণ করতে চাইলে তা হবে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও না-জায়েয।”-(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ খঃ ১ পৃঃ ৩৬১)

যা হোক আলোচ্য তানকীদের অর্থ এটাই যে, সাহাবায়ে কিরাম ও অন্য বুযর্গানে দীনের কথা ও কাজকে শরীয়তী দলীলের আলোকে যাচাই করে তাদের কথা ও কাজের মধ্যে যেগুলো কুরআন ও হাদীসের আহকামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলো গ্রহণ করা আর যেগুলো সাংঘর্ষিক সেগুলো পরিত্যাগ করা। এভাবে তানকীদ করাকে সাহাবায়ে কিরাম অথবা অন্যসব বুযুর্গদের অবমাননা ও হেয় করা বলে দাবী করা আমাদের মতে নিশ্চিতভাবে ভুল। এরূপ তানকীদ করাকে তারাই অবজ্ঞাসূচক বা নাজায়েয বলতে পারে যারা তানকীদ (যাচাই-বাছাই ও পরখ করা) ও তানকীসের (খাটো বা হেয় করা) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে অক্ষম। অথবা তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া নিজেদের নেতার দাসত্বে এমনভাবে বাধা পড়েছেন যে, তাদের সমস্ত কথা ও কাজকে সব ধরনের ভুল থেকে মুক্ত ও পবিত্র বলে জানে এবং বুযর্গ থেকে কোনো ভুল ও ত্রুটি সংঘটিত হওয়া অসম্ভব মনে করে থাকে। এ ধরনের মর্যাদা ও উচ্চাসন নবী ও রসূলগণ ছাড়া উম্মতের অন্য কারো লাভ করা অসম্ভব তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিভিন্ন জাতির ইতিহাস সাক্ষী যে, নবী ও রসূলদের উম্মতের কতিপয় পুণ্যাত্মা বুযর্গ, ধর্মীয় নেতা, দলীয় আমীর, পীর, মাশায়েখ ও আলেমগণের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মহব্বত এবং সম্মান দেখানোর জঘন্য আবেগের কারণেই এ ধরনের বড়ত্বের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে এবং ধর্মীয় নেতাদের ব্যক্তিগত কথা ও কাজকে যাচাই-বাছাইয়ের (তানকীদ) ঊর্ধে মনে করার বিপজ্জনক মনোবৃত্তি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে তাদের ব্যক্তিগত কথা ও কাজই ধীরে ধীরে প্রকৃত দীনের মর্যাদায় সমাসীন হয়ে বসেছে। তারপর পরবর্তী সময়ে এসব অনুসরণীয় বুযর্গ ও মাশায়েখদের ব্যক্তিগত কথা ও কাজ দীনে হকের মসনদে হুকুমদাতারূপে বসেছে। এমতাবস্থায় সেসব বুযর্গ ও পীর মাশায়েখদের কথার মুকাবিলায় আসল ও প্রকৃত দীন ও অতি সহজেই পরিত্যক্ত হয়েছে এবং অত্যন্ত সহজ-সরল পন্থায় দীনে ইলাহী বিকৃতির শিকার হয়েছে।

এটা এমন একটা সত্য যে, যারা জাতিসমূহের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যও অবগত আছেন মাশায়েখ ও বুযর্গানে দীনের অবস্থা সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত এবং তাদের ভক্ত-অনুরক্ত ও মুরীদদিগের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত তারা এ সত্যকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করতে পারবেন না। এ বাস্তবতার কারণেই ইসলাম শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীসকেই সত্যের একমাত্র মাপকাঠি ও মানদণ্ড হিসেবে

www.pathagar.com

ঘোষণা করেছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর সবাইকে সমানভাবে নির্দেশ দিয়েছে ঃ

فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ـ

এবং এটাকেই ঈমানের কষ্টিপাথর সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে ঃ

اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ

পরিণাম ও ফলাফলের দিক থেকেও এটাকে উপকারী ও সর্বোত্তম বলা হয়েছে ঃ

ذَالِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاوِيْلاً ـ

এটাকেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবনের শেষ লগ্নে একটি আলোক বর্তিকারূপে উম্মাতের সামনে পেশ করে বললেন ঃ

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما ، كتاب اللّٰه وسنة رسوله

"আমি তোমাদের কাছে দু'টি মূল্যবান জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে বস্তু দু'টি দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কখনো পথ হারা হবে না। এর একটি হলো কিতাবুল্লাহ, অপরটি সুন্নাতে রসূলুল্লাহ।"

সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড হওয়ার অর্থ কি

মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট আহলে ইলমগণ সম্মানিত সাহাবীদের ব্যক্তিগত কথা ও উক্তিসমূহকে যদিও তানকীদের উর্ধে মনে করেন না এবং তাদের কথাকে সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড হিসেবে মানেন না। তবুও তারা সমস্ত সাহাবায়ে কিরামকে সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মেনে থাকেন। তারা বলেন ঃ যে বিষয়ে সাহাবীদের ইজমা হয়ে গেছে সেটা অবশ্যই সত্য এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে হুজ্জত বা দলীল হবে। গোটা মুসলিম জাতি এটাকে অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর। কতিপয় প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মাওলানা লিখেছেন তাতে উপরোক্ত সত্যটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

"আমাদের মতে সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি বলতে বুঝায় এমন কিছুকে যার অনুরূপ হওয়া ন্যায় ও সত্য এবং পরিপন্থী হওয়া বাতিল। এ দৃষ্টিভংগীতে সত্যের কষ্টিপাথর হলো কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। সম্মানিত সাহাবীগণ হক ও ন্যায়ের কষ্টিপাথর নন বরং কুরআন ও হাদীসের নিরিখে তারা

www.pathagar.com

পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ ও সফলকাম। কুরআন ও হাদীসের নিরিখে যাচাই-বাছাই ও পরখ করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সাহাবায়ে কিরাম সত্য ও ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কুরআন ও হাদীসের সামান্যতম বিরোধিতাও অসম্ভব ব্যাপার। তাই আমরা তাদের ইজমাকে হুজ্জতরূপে গ্রহণ ও স্বীকার করে থাকি।"-(তরজুমানুল কুরআন রাসায়েল ও মাসায়েল খঃ ৫৬ সংখ্যা ঃ ৫)

সাহাবায়ে কিরামগণ সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি কিনা এবং তাদের ব্যক্তিগত কথা ও ইজতিহাদী ফায়সালা তানকীদের উর্ধে কিনা এ সম্পর্কে উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা। কিন্তু এর তাৎপর্য কখনো এটা নয় যে, জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট আহলে ইলম জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে সাহাবীদের আছার (সাহাবাদের বাণী) কোনো স্তরেই নির্ভরযোগ্য নয়। অথবা তাদের আসার দ্বারা দীনি মাসয়ালায় কোনো দলীল প্রমাণের কাজ করা যাবে না।

যারা জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য ভাণ্ডার সম্পর্কে অবগত অথবা মাওলানা মওদূদীর রচিত গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করেছেন তারা খুব ভালো করেই জানেন যে, তিনি দীনের বিভিন্ন মাসয়ালায় কুরআন ও হাদীসের পর সাহাবীদের আসার থেকেও দলীল গ্রহণ করেছেন। এমনকি তাবেয়ীন আয়িম্মায়ে মুহাদ্দিসীন ও মুজতাহেদীনদের কথা থেকেও বিভিন্ন মাসয়সালা ইসলামের দৃষ্টিভংগী পেশ করতে প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন। কেননা মুসলিম জাতি কোনো সময়ই সাহাবীদের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে পারে না। সাহাবীগণ মুসলিম জাতির অমূল্য রতন। এ অমূল্য রত্ন থেকে মুসলমান জাতি কখনো কোনো অবস্থাতেই মুক্ত ও বেপরওয়া থাকতে পারে না। আলোচনা ও পর্যালোচনা শুধু এ বিষয় নিয়ে যে, সাহাবীদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ কুরআন ও হাদীসের মতো সর্বাবস্থায় স্বতই অবশ্য পালনীয় কিনা অথবা সেগুলো গ্রহণ করার আগে কথা ও কাজগুলো কুরআন ও হাদীসের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যশীল তা অবলোকন করা জরুরী কিনা ? এ ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিভংগী হলো কুরআন হাদীস ছাড়া সাহাবায়ে কিরামের আছার অথবা তাবেয়ীন এবং আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনদের কথা সে সময় অনুসরণ ও তাকলীদযোগ্য বিবেচিত হবে যখন কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, বিরোধিতা হবে না। অন্যথায় বিরোধ হওয়ার সময় কুরআন ও হাদীসের আমল করাই নির্ধারিত হবে। এমতাবস্থায় সাহাবীদের আছার অথবা তাবেয়ীন ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীদের কথা কুরআন হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণ ও অনুসরণযোগ্য হবে না। আর এটা এমন একটি দৃষ্টিভংগি ও অভিমত যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে এবং কেউ তা অস্বীকার করেনি।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

দাজ্জাল সম্পর্কিত প্রশ্ন

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এবং বর্তমান যুগের বিশেষ মতবাদের ধারক সম্মানিত কতিপয় আলেমের মধ্যে যেসব বিষয়গুলো বিতর্কিত এবং যেগুলো মৌলিক বিষয় হিসেবে উল্লেখিত তন্মধ্যে দাজ্জাল সম্পর্কিত বিষয়টি অন্যতম। এ বিষয়েও মাওলানা মওদূদীকে অভিযুক্ত করতে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে।

কতিপয় প্রশ্নের জবাবে মাওলানা মওদূদী এ প্রসংগে যে ইলমী গবেষণা পেশ করেছেন যাকে কেন্দ্র করে কিছুসংখ্যক আলেমের পক্ষ থেকে যে প্রতিবাদ করা হয়েছে তা পেশ করার আগে এ বিষয়ে পূর্ববর্তী আলেমগণ তাদের রচিত কিতাবসমূহের যে ইলমী গবেষণা ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তা তুলে ধরা অধিক সংগত ও উপকারী মনে করি। তারপর সে আলোকে মাওলানা মওদূদীর গবেষণা এবং অভিযোগকারীগণের উত্থাপিত অভিযোগের গবেষণামূলক পরীক্ষা করা হবে। অতপর এ বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ সত্য ও সঠিক এবং কার অভিমত আগেকার বিজ্ঞ আলেমদের অভিমত ও গবেষণার সাথে সামঞ্জস্যশীল তা জানা যাবে।

দাজ্জাল শব্দের অর্থ

'দাজ্জাল' (رجّال) শব্দটি فعّال শব্দের ওজনে আধিক্য বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়। দাজলুন (رجل) ধাতু থেকে শব্দটি নির্গত। দজল শব্দের অর্থ কোনো বস্তুর ওপর আবরণ দিয়ে লুকিয়ে রাখা। বড় মিথ্যাবাদীকে এ কারণে দাজ্জাল বলা হয়। এ জন্য যে, সে সত্য কথাকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে দেয়। শরীয়াতের পরিভাষায় এমন লোকদের সম্পর্কে দাজ্জাল বলা হয় যারা এমন পদ ও মর্যাদার দাবী করে, যে পদে তাদের সফলকাম হওয়া শরীয়াতের দৃষ্টিতে অসম্ভব ও দুরূহ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দাজ্জাল শব্দের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

هو فعّال بالتشديد من الدجل وهو التغطية وسمى الكذاب دجالا لانّه يغطى الحق بباطله ... وقال ابن دريد سمى دجالا لانه يغطى الحق بالكذب

"দাজ্জাল" শব্দটি فَعَّالٌ শব্দের ওজনে 'দজল' মূল ধাতু থেকে অনুসৃত। দজল শব্দের অর্থ পর্দার মধ্যে কোনো বস্তুকে লুকানো। যে বেশী মিথ্যা কথা বলে সত্যকে বাতিলের আবরণে লুকিয়ে ফেলে। ইবনে দুরাইদ

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ দাজ্জালও সত্য ও ন্যায়কে বাতিল ও মিথ্যার আবরণে ঢেকে ফেলে বলেই তাকে দাজ্জাল বলা যুক্তিসঙ্গত।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর যারা মিথ্যা নবুয়াতের দাবী করেছে তারাও সত্য ও ন্যায় কথাকে বাতিল ও মিথ্যার আবরণে ঢেকে ফেলেছিলো। এ কারণে নবী আলাইহিস সালাম তাদেরকেও দাজ্জাল ঘোষণা করেছেন। সর্বশেষ যে বড় দাজ্জালের আগমন ঘটবে সেও যেহেতু সবচেয়ে বড় সত্যকে গোপন করবে অর্থাৎ আল্লাহর উলুহিয়াতকে অস্বীকার করবে। সুতরাং সে-ই হবে সবচেয়ে বড় দাজ্জাল। তাকে দাজ্জালে আকবার বলা হবে।

দাজ্জাল শব্দের অর্থ ছাড়াও হাদীসের ইমামগণ দাজ্জাল সম্পর্কে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আরো কতিপয় গবেষণার ওপর ব্যাপক আলোকপাত করেছেন। তবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য থাকার কারণে আমরা এখানে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের বিশ্লেষণ পেশ করছি। কেননা, এখানে যে বিষয়ের বিশ্লেষণ পেশ করা উদ্দেশ্য তা এ পাঁচটি বিষয়ের সাথেই প্রধানত সম্পর্কিত। আর এগুলোর গবেষণার মাধ্যমেই প্রকৃত বিষয়ের সত্যতাও স্পষ্ট হয়ে যাবে। পাঁচটি বিষয় হলো ঃ

(১) দাজ্জালের অস্তিত্ব (২) দাজ্জালের পরিচয় চিহ্ন (৩) ব্যক্তিত্ব (৪) আবির্ভাবের স্থান (৫) আবির্ভাবের সময়।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে এবং হাদীসের আলোকে এগুলোর বিশ্লেষণ পেশ করা হবে। নীচে যথাক্রমে এগুলো বর্ণনা করা হলো ঃ

দাজ্জালের অস্তিত্ব ও পরিচয় চিহ্ন

বর্ণনাসমূহ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস দ্বারা দাজ্জাল সম্পর্কে যেসব অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হিসেবে স্বীকৃত বিষয় বেশ কয়েকটি তন্মধ্যে একটি হলো, দাজ্জাল কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে একজন নির্দিষ্ট মানুষের আকৃতিতে প্রকাশ পাবে। সে মুসলিম জাতির মধ্যে একটি বিরাট বিপর্যয় ঘটাবে। তার কারণে জাতি একটি বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। অতপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আসবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। দ্বিতীয় জিনিস হলো দাজ্জালের পরিচয় চিহ্ন। দাজ্জালের পরিচয় চিহ্নগুলো সহীহ হাদীস ও বর্ণনা থেকে প্রবাদ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতও এ বিষয়ে একমত। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দাজ্জালের হাদীসের ব্যাখ্যায় নিম্নবর্ণিত জিনিসগুলোর উল্লেখ করেছেনঃ

www.pathagar.com

قال القاضی عیاض فی هذه الاحادیث حجة لاهل السنة فی صحة وجود الدجال وانه شخص معین یبتلی الله به العباد ویقدر علی اشیاء کاحیاء المیت الذی یقتله وظهور الخصب والانهار والجنة والنار .... ثم یقتله عیسی بن مریم ١هـ

"কাযী আয়াজ বলেছেন ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কাছে যেসব হাদীস দলীল সেসব হাদীস দ্বারা দাজ্জালের অস্তিত্ব প্রমাণিত এবং সে একজন নির্দিষ্ট মানুষের আকৃতিতে আবির্ভূত হবে। তার কারণে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে একটি বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন। কতিপয় জিনিসের ওপর তাকে ক্ষমতা দেয়া হবে। যেমন–যাকে সে হত্যা করবে সেই মৃতকে তৎক্ষণাৎ জীবিত করা। অথবা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেয়া, অথবা নদীসমূহ প্রবাহিত হওয়া। তার সাথে বেহেশত ও দোযখ থাকা। এ সবের পর ঈসা আলাইহিস সালাম এসে তাকে হত্যা করবেন।"

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা এবং সহীহ্ হাদীস 'বৈশিষ্ট্য এবং দাজ্জালের অস্তিত্ব' এমন দু'টো জিনিস যে সম্পর্কে সহীহ্ হাদীসমূহ পরস্পর বিরোধী নয়। এতে দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দাজ্জালের অস্তিত্ব ও তার পরিচয় জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব কথা বলেছেন সেগুলোর সবই অহী ভিত্তিক জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ দু'টি বস্তুর ওপর ইলমে অহী গোটা উম্মতকে নির্দেশনা দিয়েছে। এ কারণেই দাজ্জালের আবির্ভাব ও তার পরিচয় জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যসমূহকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আকীদারূপে স্বীকার করেছেন, কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি। নিম্নে দাজ্জালের দশটি পরিচয় জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতসহ উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) কানা (একচক্ষু বিশিষ্ট্য (২) লাল রং হওয়া (৩) কপালে ك - ف - ر (কাফ–ফা-রা) অথবা (আরবী) কাফের শব্দ লেখা থাকবে (৪) মদীনায় প্রবেশ করবে না (৫) দাজ্জালের আবির্ভাবের ফলে মদীনায় তিনবার ভূমিকম্প হবে, (৬) একজন নেককার লোককে হত্যা করার পর জীবিত করতে পারবে, (৭) খানাপিনা সাজ-সরঞ্জাম সাথেই থাকবে (৮) বেহেশ্‌ত ও দোযখের ছবিও তার সাথে থাকবে (৯) চল্লিশ দিন ভ্রমণ করবে (১০) পরিশেষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এসে তাকে হত্যা করবেন। যেসব সহীহ্ হাদীস ও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত এ পরিচয় জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যসমূহের উল্লেখ আছে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

(١) عن عبد اللّٰه ابن عمر رضـ قال قام النبى صلى اللّٰه عليه وسلم فى الناس فاثنى على اللّٰه بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال انيلاننذر كمره وما من نبى الا وقد انذره قومه ولكنى ساقول لكم فيه قولا لم يقله نبى لقوم اندا عور وان اللّٰه ليس باعور - (بخارى)

"আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন ঃ একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তব্য পেশ করার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। আল্লাহর প্রশংসার পর তিনি দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের ফেতনা সম্পর্কে সারধান করে দিচ্ছি। প্রত্যেক নবীই তাঁর কাওমকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তবে আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের এমন কথা শুনাবো যা কোনো নবীই তাঁর কাওমকে শুনাননি। আর সেটা হলো দাজ্জাল এক চোখ বিশিষ্ট (কানা) হবে। আর আল্লাহ তায়ালা তো কানা নন। (সুতরাং তোমাদের তার প্রতারণায় প্রতারিত না হওয়া উচিত)। বুখারী এ বর্ণনায় দাজ্জালের ১নং পরিচয় কানা হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(٢) عن عبد اللّٰه ابن عمر ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم قال بينا انا نائم اطوف بالكعبة فاذا رجل ادم قلت من هذا قالو ابن مريم ثم ذهبت التفت فاذا رجل جسيم احمر .... اعور العين كان عنه عنبة طافية قالوا هذا الدجال - (بخارى)

"ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একবার স্বপ্নে দেখলাম আমি কাবা শরীফ তাওয়াফ করছি। হঠাৎ আমি এমন একজন লোকের সাক্ষাত পেলাম যার পায়ের রং ছিলো গোধূম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকটি কে ? ফেরেশতাগণ বললেন ঃ হযরত ঈসা বিন মরিয়াম। তারপর আমি এদিক সেদিক দৃষ্টি দিয়ে লাল রংয়ের মোটা এক চোখ বিশিষ্ট একজন কানা লোক দেখলাম। তার চোখ ছিলো আংগুর ফলের মতো ফোলা। ফেরেশতাগণ বললেন ঃ এ লোকটিই দাজ্জাল।"

এ রেওয়ায়েতে দাজ্জালের দ্বিতীয় পরিচয় জানা যায় যে, তার গায়ের রং লাল।

www.pathagar.com

(٣) عن انس رضـ قـال قـال الـنبى صلى الـلّـه عليـه وسلم مـا بعث نبى الا انذر امـتـه الا عـور الـكذاب الا انه اعـور وان ربكم ليس باعـور وان بين عينيه مكتوب كافر۔

"হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোনো নবী পাঠানো হয়নি যিনি তার সম্প্রদায়কে মিথ্যাবাদী কানা দাজ্জালের প্রতারণা সম্পর্কে সাবধান করেননি। মনে রেখো ! দাজ্জাল হবে এক চোখ বিশিষ্ট, কানা। আর তোমাদের রব কানা নন। পরন্তু দাজ্জালের কপালে কাফের শব্দটি লেখা থাকবে।"

মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়েতে আছে তার ললাটে (مكتوب بين عينيه (ك ف ر۔(مسلم) কাফের লেখা থাকবে। এ রেওয়ায়েতে প্রথম পরিচয়ের সাথে তৃতীয় পরিচয় হিসেবে তার কপালে কাফের লেখা থাকার কথা বলা হয়েছে।

(٤) عن ابى بكرة عن الـنبى صلى الـلّـه عليه وسلم قال لايدخل الـمدينة رعب الـمسيح لـها سبعة ابواب على كل باب ملـكان۔ (بخارى)

"হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ মদীনায় দাজ্জালের ভয়ভীতি প্রবেশ করতে পারবে না। সে সময় মদীনায় সাতটি দরযা থাকবে। প্রত্যেক দরযায় দু'জন ফেরেশতা পাহারা দিবেন।"

(٥) عن انس بن مـالك قال قال الـنبى صلى الـلّـه عليه وسلم يجيئ الـدجال حتى ينزل فى ناحية الـمدينة ثم ترجف الـمدينة ثلث رجفات فـيخرج الـيه كل كافـر ومنافق۔ (بخارى رحـ)

"আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দাজ্জাল মদীনার পাশে এসে হাজির হবে। তারপর মদীনায় তিনবার ভূমিকম্প হবে। তাতে সব কাফের ও মুনাফিক মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের পক্ষাবলম্বন করবে।"–(বুখারী)

এ উভয় রেওয়ায়েতে ক্রমান্বয়ে ৫ ও ৬ নম্বর পরিচয়ের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। যখনই মদীনার এক পাশে এসে হাজির হবে তখনই মদীনায় তিনবার ভূকম্প হবে।

(٦) عن ابى سـعـيـد قـال حـدثنا رسـول الـلّـه صلى الـلّـه عليـه وسلم يومًا

حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنابه انه قال ياتى الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التى تلى المدينة فيخرج اليه يومئذ رجل وهو خير الناس فيقول اشهد انك الدجال الذى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال ارأيتم ان قتلت هذا ثم احييته هل تشكون فى الامر فيقولون لا ـ فيقتله ثم يحيه فيقول الله ما كنت فيك اشد بصيرة من اليوم فيريد الدجال ان يقتله فلا يسلط عليه ـ (بخارى)

"হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, মদীনায় প্রবেশ করা তার জন্যে নিষিদ্ধ থাকবে। মদীনার বাইরে সে একটি পাথরময় ভূমিতে অবতরণ করবে। মদীনার একজন বড় নেককার লোক তার সাথে মুকাবিলা করার জন্যে বের হয়ে আসবেন। তিনি বলবেন ঃ আল্লাহর কসম ! তুমিই সেই দাজ্জাল যার কাহিনী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তাতে দাজ্জাল নিজের সাথীদেরকে বলবে যদি আমি এ লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করতে পারি তাহলেও কি তোমরা আমার সম্পর্কে সন্দেহ করবে ? লোকেরা বলবে ঃ না। তখন দাজ্জাল লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। কিন্তু নেককার লোকটি বলবে ঃ আল্লাহর কসম ! তোমার দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে আজ আমি নিশ্চিত হলাম। দাজ্জাল পুনরায় তাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করবে কিন্তু তখন আর হত্যা করতে পারবে না।"–(বুখারী)

এ ব্যাপারে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু যে রেওয়ায়েত ইমাম বুখারী বর্ণনা করছেন, সেখানে সুস্পষ্টভাবে এ শব্দগুলোর উল্লেখ আছে ঃ

على انقاب المدينة ملئكة لايدخلها الطاعون ولا الدجال ـ

আরো আছে ঃ

والمدينة ياتيها الدجال فيجد الملئكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ـ

www.pathagar.com

অর্থাৎ মদীনার ফটকে ফেরেশতাগণ প্রহরীরূপে দাঁড়িয়ে মদীনাকে হেফাজত করবেন। মদীনাতে প্লেগ, মহামারী এবং দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। (দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ না করার অধ্যায়।–বুখারী)

দশটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উপরোল্লেখিত রেওয়ায়েতে দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা স্পষ্টই উল্লেখ আছে। একটি হলো দাজ্জাল সে সময়ের একজন নেককার লোককে হত্যা করবে। তারপর তার কথানুযায়ী আল্লাহ তায়ালা লোকটিকে জীবিত করে দিবেন।

(৭) عن مجاهد قال انطلقنا الى رجل من الانصار فقلنا حدثنا بما سمعت من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى الدجال فذكر حدثنا فيه : تمطر الارض ولا ينبت الشجر ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ومعه جبل خير وفى رواية معه جبال الخبز وانهار الماء-(احمد، يحوا له فتح البارى ج ١٢ص٧٨)

"মুজাহিদের ভাষ্য ঃ আমরা একজন আনসারী সাহাবীর কাছে গেলে দাজ্জাল সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তিনি যাকিছু শুনেছেন তা আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, সে সময় অতিবৃষ্টির দরুন ফসল উৎপাদন হবে না। তার সাথে বেহেশত-দোযখ থাকবে। তবে তার বেহেশত প্রকৃতপক্ষে দোযখ আর দোযখ আসলে বেহেশত হবে। খাদ্য দ্রব্য তার কাছে প্রচুর পরিমাণে থাকবে। অন্য রেওয়ায়েত আছে—পাহাড় পরিমাণ খাদ্য ভাণ্ডার তার সাথে থাকবে।"–(আহমদ ফতহুল বারী খঃ ১৩ পৃঃ ৭৮)

এ রেওয়ায়েতে দশটি বৈশিষ্ট্যের ৭ম ও ৮ম এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ আছে। একটি হলো, দাজ্জালের কাছে খাদ্য সম্ভার প্রচুর পরিমাণে হবে। দ্বিতীয়টি হলো, বেহেশত ও দোযখের চিত্রও তার সাথেই থাকবে।

(৮) عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الدجال فقال ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرأ حجيج نفسه واللّه خليفتى على كل مسلم قلنا وما لبثه فى الارض قال اربعون يوما ..... ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله-

"নাওয়াস বিন সাময়ান বলেন ঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের কথা প্রসংগে বললেন ঃ যদি সে আমার জীবদ্দশায় আবির্ভূত হয়, তাহলে আমি নিজেই তার মুকাবিলা করবো। কিন্তু যদি আমার

www.pathagar.com

অনুপস্থিতিতে তার আবির্ভাব ঘটে তাহলে প্রত্যেককেই নিজের পক্ষ থেকে তার সাথে মুকাবিলা করতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালাই আমার পক্ষ থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে হিফাজত করবেন। আমরা আরয করলাম দাজ্জাল দুনিয়ার বুকে কতদিন অবস্থান করবে? তিনি বললেন ঃ ৪০ দিন। তারপর ঈসা ইবনে মরিয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করতঃ তাকে হত্যা করবেন।"–(আবু দাউদ, দাজ্জালের আবির্ভাব অধ্যায়)

এ হাদীসে দশটি বৈশিষ্ট্যের শেষ দু'টির কথা বলা হয়েছে। একটি হলো দাজ্জালের ৪০দিন অবস্থান করা। অপরটি হলো হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক তার নিহত হওয়া। সহীহ্ ও প্রমাণভিত্তিক রেওয়ায়েতে দাজ্জালের উপরোক্ত দশটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ আছে। এসব রেওয়ায়েতের অধিকাংশ যদিও বুখারী শরীফে আছে তথাপি হাদীসের অন্যান্য সব কিতাবে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত আছে সেগুলোও কিছুমাত্র অভিন্ন নয়। সমস্ত রেওয়ায়েতেই দাজ্জালের এসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যদিও কোনো রেওয়ায়েতে কম, কোনো রেওয়ায়েতে বেশী বর্ণিত হয়েছে। কম বেশীর পার্থক্য ছাড়া আসল বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় কোনো মতবিরোধ নেই। আর এটা এ সবেরই প্রকাশ্য আলামত যে, দাজ্জালের আবির্ভাব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীগুলো ইলমে অহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত, কোনো ধারণা ও দ্বিধা-সংকোচের বিন্দুমাত্র দখল নেই।

দাজ্জালের স্বাতন্ত্র

এবার কথা হলো—উপরোক্ত দশটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিটি কে? সে কি এমন কোনো ব্যক্তি যার সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি, তাকে নির্ধারণ করাও সম্ভব হয়নি, বরং কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে উল্লেখিত পরিচিতিসহ প্রকাশ পাবে? অথবা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় জন্মলাভ করে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অথবা কোনো দ্বীপে বর্তমানে সে অন্তরীণ অবস্থায় আছে। কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হলে সে ঐ দ্বীপ থেকে বের হয়ে উম্মতের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ ছড়াবে। কিংবা যদি অদৃশ্য হয়ে থাকে তাহলে সেই সময় প্রকাশ পাবে?

হাদীস ও রেওয়ায়েত দ্বারা যতোটুকু জানা যায় তাতে দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্রের ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানারই কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি দাজ্জাল ছিলো যে সে সময় অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হলে প্রকাশ পাবে অথবা আজও কোথাও অন্তরীণ অবস্থায় আছে তার প্রকাশ পাবার সময় প্রকাশিত হয়ে

www.pathagar.com

স্বাধীনভাবে দুনিয়াতে ফিতনা ছড়াতে থাকবে—একথা দৃঢ়ভাবে জানা যায়নি। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কোনো চূড়ান্ত ফায়সালা দেননি। বরং দাজ্জাল সম্পর্কিত সমস্ত রেওয়াত থেকে শুধুমাত্র একথা নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, দাজ্জালের আবির্ভাব কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম আলামত। কিয়ামত নিকটবর্তী হলে অন্যান্য আলামতসমূহের মতো দাজ্জালও একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির আকৃতিতে আবির্ভূত হবে এবং তার উপরোল্লেখিত দশটি বৈশিষ্ট্য থাকবে। এ লোকটি সবচেয়ে বড় দাজ্জাল যে পরে আবির্ভাব হবে—রসূলের যামানার কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীর দ্বারা এমন কোনো চূড়ান্ত ফায়সালায় পৌঁছা যায় না যার ওপর ভিত্তি করে শরীয়াতের দৃষ্টিতে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড় দাজ্জালরূপে বিশ্বাস করতে উম্মতকে বাধ্য করা যায় এবং এ আকীদা ও বিশ্বাসকে ইসলামী আকীদার মধ্যে পরিগণিত করা যায়।

এ কারণেই দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র সম্পর্কে আগেকার আলেমগণও কোনো একটি সিদ্ধান্তে একমত হননি। কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে সমবেতভাবে এ ফায়সালা করেননি যে, এ লোকটিই সবচেয়ে বড় দাজ্জাল হবে। বরং এ ব্যাপারে তারা পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করতেন বলে পরিদৃষ্ট হয়। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা পূর্ববর্তী আলেমদের মতামত উপস্থাপন করার সময় দেখাবো যে, তারা এ ব্যাপারে কেন একটি সিদ্ধান্তে একমত ছিলেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এবং আগেকার আলেমদের মতবিরোধ থেকেই একথা জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাজ্জাল সম্পর্কে অহীর মাধ্যমে কোনো অকাট্য জ্ঞান দেয়া হয়নি। অন্যথায় এ ব্যাপারে রেওয়ায়েত-সমূহে এমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ বৈপরীত্য থাকতো না এবং উলামায়ে সলফীদের মধ্যেও এমন কঠিন মতবিরোধ হতো না। কেননা আল্লাহর অহীতে কখনো সামঞ্জস্যহীন বৈপিরিত্য থাকতে পারে না এবং ইসলামের আকীদাগত ও মৌলিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে না। বরং অহীর মাধ্যমে নবীকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা শুধুমাত্র পরিচয়জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যসমূহ। কোনো সময় নবী আলাইহিস সালাম কোনো ব্যক্তির মধ্যে সবচেয়ে বড় দাজ্জালের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যসমূহ আছে বলে জানতে পারলে সে ব্যক্তিই দাজ্জাল হওয়ার আশংকা ও ধারণা পোষণ করেছেন। অনুরূপভাবে কোনো সময় আবার অন্য কোনো ব্যক্তির মধ্যে দাজ্জালের পরিচয় জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারলে সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলতেন সম্ভবত এ ব্যক্তিই বড় দাজ্জাল। যেসব রেওয়ায়েত থেকে কোন কোন ব্যক্তি দাজ্জাল হওয়ার আশংকা ও ধারণা পোষণ করা হয়েছে সেগুলো আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি।

উপরন্তু মুহাদ্দিসগণ এসব হাদীসকে কেন্দ্র করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তার আলোকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চূড়ান্তভাবে দাজ্জাল বলা যায় কিনা তার ওপরও আমরা আলোকপাত করবো।

ইবনে সাইয়াদ

عن محمد بن جابر بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد اللّه يحلف باللّه ان ابن الصّياد الدجال قلت تحلف باللّه قال فى سمعت عمر رضـ يحلف على ذالك عند النبى صلى اللّه عليه وسلم فلم ينكره النبى صلى اللّه عليه وسلم -(بخارى)

"মুহাম্মদ বিন জাবের ইবনুল মুনকাদির বলেন, আমি নিজে দেখেছি জাবের বিন আবদুল্লাহ আল্লাহর শপথ করে বলেছেন ঃ ইবনে সাইয়াদই দাজ্জাল। আমি বললাম ঃ তুমি কসম করছো কেন ? হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ আমি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছি যে, তিনি ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে কসম করেছেন, অথচ নবী আলাইহিস সালাম তা অস্বীকার করেননি।"-(বুখারী)

اخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر قال لقيت ابن صياد فاذا عينه قد طفئت قلت متى طفئت عينك قال لادرى والرحمن قلت كذبت لاتدرى وهى فى رأسك فمسحها ونخر ثلاثا .... فذكرت ذالك الحفصة رضـ فقالت حفصة اجتنب هذا الرجال فانما يتحدث ان الدجال يخرج عند غضبة يغضبها - انتهى (فتح البارى ج ١٢ صـ ٢٧٧)

"আবদুর রাজ্জাক রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ সনদসহ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ ইবনে সাইয়াদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। আমি দেখলাম তার দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আমি বললাম কখন নষ্ট হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ রহমানের কসম ! আমি জানি না। আমি বললাম তুমি মিথ্যা বলছো, কিভাবে তোমার অজানা থাকবে ? তোমার চোখ তো তোমার মাথায়ই আছে। তারপর সে তিনবার জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে চোখের উপর হাত রাখলেন। আমি হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ এ লোকটিকে বিরক্ত করো না। লোকেরা বলে

www.pathagar.com

থাকে দাজ্জালকে উত্যক্ত করলে তার আবির্ভাব ঘটবে।"-(ফতহুল বারী খঃ ১১৩ পৃঃ ২৭৭)

عن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما اشك ان المسيح الدجال ابن صياد -

"নাফে বলেন হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন ঃ ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"
-(আবু দাউদ খঃ ২ পৃঃ ৫৯৫)

উপরোক্ত তিনটি রেওয়ায়েতে একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং জাবের রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে এ তিনজনেরই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হলো এ লোকটিই মসিহুদ দাজ্জাল। তাছাড়া আরো কতিপয় সাহাবারও ইবনে সাইয়াদের দাজ্জালে আকবার হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো। হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ছিলেন তাদের অন্যতম। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে তাঁরা এমত পোষণ করেছেন। পরে এ সম্পর্কে আরো আলোচনা করা হবে।

কিন্তু ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে সম্মানিত সাহাবীগণের এ সিদ্ধান্ত নবী আলাইহিস সালামের কোনো অকাট্য ফায়সালার ওপর ভিত্তি করে ছিলো না। বরং বড় দাজ্জালের যেসব বৈশিষ্ট্য ইবনে সাইয়াদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় অথবা কোনো সময় কেউ ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়া সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয় প্রকাশ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা খণ্ডন করার পরিবর্তে মৌন থাকার ভূমিকা অবলম্বন করেন। এ কারণে ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে কতিপয় সাহাবাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। অন্যথায় ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে কোনো অকাট্য ফায়সালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে মারফু রেওয়ায়েত বর্ণিত নেই। বরং এ সম্পর্কে মারফু রেওয়ায়েত সম্পূর্ণ নিরব। অবশ্য এ ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। একবার হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করলে তিনি বললেন ঃ

ان يكن هوا الدجال فلن تسلط عليه وان لايكن فلا خير فى فتله

"যদি ইবনে সাইয়াদ দাজ্জালই হয়ে থাকে তবে তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। আর সে দাজ্জাল না হলে তাকে হত্যা করায় কোনো কল্যাণ নেই।"-(আবু দাউদ পৃঃ ৫৯৫)

www.pathagar.com

হাদীসের শব্দাবলী প্রমাণ করে যে, ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে নবী আলাইহিস সালামের দৃঢ় ও অকাট্য প্রত্যয় ছিলো না। বরং তিনি ইবনে সাইয়াদের প্রসিদ্ধ ও সবচেয়ে বড় দাজ্জাল হওয়া না হওয়া সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিলেন।

দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তি

উপরোল্লেখিত রেওয়ায়েতে ইবনে সাইয়াদের দাজ্জালে আকবার হওয়ার কথা জানা যায়। নীচে ফাতেমা বিনতে কায়েসের বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে যাতে দ্বীপে অন্তরীণ এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে।

عن فاطمة بنت قيس قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فذكر ان تميما الدارى ركب فى السفينة مع ثلاثين رجلا من قومه فلعب بهم الموج شهرا ثم نزلوا الى جزيرة فلقيتم دابة كثيرة الشعر فقالت لهم انا الجساسة ودلتهم على رجل فى الدين قال فانطلقنا سواعا فدخلنا الدير فاذا فيه اعظم انسان رأيناه قط خلقا واشده وثاقا مجموعة يداه الى عنقه بالحديد فقلنا ويلك ما انت قال انا المسيح الدجال وانه يوشك ان يؤذن لى فى الخروج قال النبى صلى الله عليه وسلم انه فى بحر الشام او بحر اليمن لابل من قبل المشرق راوما بيده الى المشرق - اهـ

"ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবায় বললেন ঃ তামীমেদারী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার স্বগোত্রীয় ত্রিশজন লোকের সমভিব্যাহারে একটি নৌকায় আরোহণ করেন। সাগরে প্রচণ্ড তুফানে তা একমাস পর্যন্ত সাগরেই ঘুরপাক খেতে থাকে। তারপর একটি দ্বীপে তারা অবতরণ করলো। তারা এমন একটি জন্তুর দেখা পেলো যার শরীরে ছিলো খুব বেশী লোম। জন্তুটি তাদেরকে বললো ঃ আমি গুপ্তচর এবং গির্জায় অবস্থানকারী একটি লোকেরও সন্ধান দিবো। তামীম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ আমি যথাশীঘ্র সে গির্জায় পৌঁছলাম। আমরা একজন মোটাসোটা লোককে মযবুত লৌহ শৃংখলে আবদ্ধ দেখলাম। তার উভয় হাত ঘাড়ের সাথে শিকল দ্বারা আবদ্ধ। আমরা বললাম তুমি কে? সে বললো ঃ আমি মুসহুদ দাজ্জাল। খুব শীঘ্রই আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ দাজ্জাল সিরিয়া সাগরে অথবা ইয়ামন সাগরে না বরং প্রাচ্য থেকে আবির্ভূত হবে। এবং হাত দ্বারা তিনি প্রাচ্যের দিকে ইশারা করলেন।"–(মুসলিম, আবু দাউদ)

www.pathagar.com

তামীমে দারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ রেওয়ায়েতের ওপর ভিত্তি করে কতিপয় সাহাবা এমত পোষণ করেছেন যে, ইবনে সাইয়াদ দাজ্জাল নয়। বরং দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তিই দাজ্জাল হবে। যার কথা রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তির দাজ্জাল হওয়ার সম্পর্কে কয়েকজন সাহাবা যে রায় প্রকাশ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে অন্তরীণ ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো অকাট্য কথার ওপর ভিত্তি করে নয়। বরং দাজ্জালে আকবার সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালাম যেসব পরিচয় জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশ সেই অন্তরীণ ব্যক্তির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। সে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্য হেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তিকে দাজ্জালে আকবার এমন কথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করেননি। অন্যথায় সম্মানিত সাহাবীদের মধ্যে এ বিষয়ে মতপার্থক্য হওয়া ছিলো অসম্ভব। পরবর্তী সময়ে ইমাম, মুহাদ্দীস ও চিন্তাবিদদের মধ্যেও মতবিরোধ হতো না। অথচ সাহাবীদের মতো ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকগণও পরবর্তী কালে দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্রের ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অহীর মারফতে দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনো জ্ঞান দান করা হয়নি। দাজ্জাল একজন ব্যক্তি যে কিয়ামতের প্রাক্কালে আবির্ভূত হবে, তার উপরোল্লেখিত দশটি পরিচয় চিহ্ন হবে এবং সে উম্মতের জন্যে খুবই বিপদ ও ফেতনার কারণ হবে। নবী আলাইহিস সালাম দাজ্জাল সম্পর্কে শুধু এতটুকুই অবহিত ছিলেন।

রেওয়ায়েতে মতবিরোধিতার পরিণতি

হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহের বিভিন্নতার কারণে এ সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে, দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্রের ব্যাপারে আগেকার আলেমগণ একটি কেন্দ্র বিন্দুতে এক হতে পারেনি। বরং মতপার্থক্য করেছেন। এ ব্যাপারে সাহাবীগণ দু'টি শিবিরে বিভক্ত। এক দলের মতে ইবনে সাইয়াদই দাজ্জাল, দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তি নয়। এ দলে আছেন, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে উমর ও জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু। অনুরূপভাবে আবু বকর, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুও এমত পোষণ করেন। এমনকি তারা ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে এমন দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন যে, ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে দশ দশ বার কসম করা ও তাদের কাছে অধিক পসন্দনীয়। হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ দু'টি দল সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েত ইমাম আহমদ ও তিবরাণীর উদ্বৃতিসহ উল্লেখ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

وقد اخرج احمد من حديث ابى ذر انه قال لان احلف عشر عرّات ان ابن صياد هو الدجّال احب الى من ان احلف واحدة انه ليس هو وسنده صحيح ومن حديث ابن مسعود نحوه - لكن قال سبعا بدل عشر مرات - اخرجه الطبرانى والله اعلم - (فتح البارى ج ۱۳ ص ۲۸۰)

ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহ আলাই সহীহ সনদসহ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইবনে সাইয়াদ দাজ্জাল নয় বলে একবার হলফ করার চেয়ে দশবার তার দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে কসম করা আমার কাছে অধিকতর পসন্দনীয়।

ইমাম তিবরানী ও ইবনে মাসউদ থেকে অনুরূপ একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ও ইবনে সাইয়াদ দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে কসম করা পসন্দ করতেন। তবে এ রেওয়ায়েতে দশবারের পরিবর্তে সাতবারের কথা উল্লেখ আছে।

সাহাবায়ে কিরামদের অপর দলের মতে তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তিই দাজ্জাল যার সাথে তিনি সাক্ষাত করেছেন। ফাতেমা বিনতে কায়েস এবং অপরাপর কতিপয় সাহাবা এ মতের সমর্থক।

মুহাদ্দিসগণের অভিমত

সম্মানিত সাহাবীগণের পর মুহাদ্দিসগণের অভিমতের প্রতি দৃষ্টি দিলে দাজ্জালের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে আমরা তাদের মধ্যেও মতপার্থক্য দেখতে পাই। কোনো একজন ব্যক্তির দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে তারা একমত নয়। বরং এ ব্যাপারে তারা তিনটি শিবিরে বিভক্ত।

প্রথম শিবিরের মতে ইবনে সাইয়াদই দাজ্জাল। দ্বিতীয় দলের মতে ইবনে সাইয়াদ যদিও বিভিন্ন দাজ্জালের অন্যতম একজন দাজ্জাল ছিলো তথাপি সে কিন্তু কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত হিসেবে যে দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়ার কথা এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের হাতে মারা যাবে সে কখনো ঐ দাজ্জাল ছিলো না। দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তি যার সাথে তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু সাক্ষাত করেছেন সে-ই হবে দাজ্জাল।

মুহাদ্দিসগণের তৃতীয় শিবিরের মতে দাজ্জালে আকবর কোনো ইনসান নয় বরং শয়তান—যাকে ইয়ামনের কোনো দ্বীপে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে। তার আবির্ভাবের সময় আল্লাহ তায়ালা তাকে সেখান থেকে মুক্ত করে দিবেন এবং

www.pathagar.com

গোটা জাতির জন্যে ফেতনা ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ মতবিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতই একথা প্রতিভাত হয় যে, দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব প্রসংগটি অকাট্য ও দৃঢ় নয়। সমগ্র উম্মতও এ ব্যাপারে একমত নয়। কেননা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি দাজ্জালে আকবর হওয়া সম্পর্কে কোনো অকাট্য হাদীসও রেওয়ায়েত নেই। সলফে সালেহীনও কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দাজ্জাল বলে ঐক্যবদ্ধভাবে অভিহিত করেননি। সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দাজ্জাল বলে বিশ্বাস করা ইসলামী আকীদারূপে প্রতীয়মান হয় না। কারণ, ইসলামী আকীদা মতবিরোধ পূর্ণও হতে পারে না আবার ধারণা প্রসূতও না। বরং ইসলামের সমস্ত আকীদা ঐক্যবদ্ধ ও অকাট্য হয়ে থাকে। কিয়ামতের কাছাকাছি সময় দাজ্জালের প্রকাশ ঘটবে এবং এ হলো ইসলামের আকীদা এবং তার মধ্যে হাদীসে বর্ণিত পরিচয় বৈশিষ্ট্যের সমাহার থাকবে, জাতির জন্যে বিপর্যয়ের কারণ হবে এবং পরিশেষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক নিহত হবে। এ আকীদাকে আমরা চতুর্থ অভিমত হিসেবে প্রমাণসহ পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

উপরোক্ত তিনটি অভিমতের সমর্থনে মুহাদ্দিসগণের মতামত পেশ করা হলো ঃ

মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যাসমূহ

قال الخطابى اختلف السلف فى امر ابن صياد بعد كبره فروى انه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة وانهم لما اراد والصلوة عليه شفوا وجهه حتى يراه الناس وقيل لهم اشهدوا ـ

وقال النووى رحـ قال العلماء قصة ابن صياد مشكلة وامره مشتبه لكن لاشك انه دجال من الدجاجلة ـ والظاهر ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يوح اليه فى امره بشيئ وانما اوحى اليه بصفات الدجال وكان فى ابن صياد قوان محتملة فلذلك كان صلى الله عليه وسلم لايقطع فى امره بشيئ بل قال لعمر لاخير فى قتله ـ الحديث ـ(فتح البارى ج ١٣ ص ٢٧٩)

"ইমাম খাত্তাবী বলেন ঃ ইবনে সাইয়াদ বয়স্ক হওয়ার পর তার সম্পর্কে সলফী আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন। কারো মতে সে নিজের কথা প্রত্যাখ্যান করে তাওবা করতঃ মুসলমান হয়ে মদীনায় ইন্তিকাল করে। জনগণ তার নামাযে জানাযা পড়ার ইচ্ছা করলে তার মুখ থেকে কাফন সরিয়ে নেয়া হয় যাতে তাকে দেখা যায় এবং লোকগণ তার ওপর স্বাক্ষ্য থাকে।

www.pathagar.com

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন—আলেমদের মতে ইবনে সাইয়াদের কাহিনীটি জটিল এবং ব্যাপারটি সন্দেহজনক। তবে একথা সন্দেহাতীত যে, সে বিভিন্ন দাজ্জালের অন্যতম একজন দাজ্জাল ছিলো। কিন্তু ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অহীর মারফতে কোনো ইলম দেয়া হয়নি। বরঞ্চ দাজ্জালের পরিচয় আলামতগুলো অহীর মাধ্যমে দেয়া হয়েছিলো মাত্র। ইবনে সাইয়াদের মধ্যে সেসব আলামত ও বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিলো বিধায় (যদিও ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিলো না।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাজ্জাল হওয়ার আশংকা করেছেন, নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তা প্রকাশ করেননি। তবে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একথা বলেছিলেন যে, তাকে হত্যা করায় তোমার কোনো মঙ্গল নেই।"

ইমাম নববী এবং আল্লামা খাত্তাবী যে কথার উল্লেখ করেছেন তাতে ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি কথা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। (১) সলফে সালেহীনগণ ইবনে সাইয়াদের দাজ্জালে আকবর হওয়ার ব্যাপারে একমত নয় বরং এ ব্যাপারে তারা ভিন্নমত পোষণ করেন। (২) কোনো কোনো সলফী আলেমের দাবী হলো—সে তাওবা করে মুসলমান হয়ে মদীনায় মারা যায়। (৩) ইবনে সাইয়াদের প্রসংগটি আগেকার আলেমদের কাছে সন্দেহজনক। নিশ্চিতভাবে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে দাজ্জাল ঘোষণা করা যায় না। (৪) যদিও সে বড় দাজ্জাল নয় তথাপি সে নবীর আগমনের পর প্রকাশিতব্য দাজ্জালদের অন্যতম দাজ্জাল অবশ্যই ছিলো। (৫) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাজ্জালের সম্পর্কে অহীর মারফতে কোনো জ্ঞান দান করা হয়নি। অহীর মাধ্যমে তাঁকে শুধুমাত্র দাজ্জালের পরিচিতি চিহ্নসমূহ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নয়।

উপরোক্ত পাঁচটি কথা ছাড়া اختلف السلف فى امر ابن صياد বাক্য দ্বারা উল্লেখিত তিনটি অভিমতের প্রথম অভিমত জানা যায় যে, ইবনে সাইয়াদ কতিপয় আলেমের মতে দাজ্জালে আকবর।

হাফেজ ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইবনে সাইয়াদের ব্যাপারে ইমাম বায়হাকীর রায় এভাবে পেশ করেন ঃ

واجاب البيهقى رحـ عن قصة ابن صياد فقال ليس فى حديث جابر اكثر من سكوت النبى صلى اللـه عليه وسلم على حلف عمر رضـ فيحتمل ان يكون النبى صلى الله عليه وسلم كان متوقفا فى امره ثم جاءه الثبت من الله

www.pathagar.com

تعالى بانه غيره على مايقضيه قصة تميم الدارى وبه تمسك من جرم بان الدجال غير ابن صياد وطريقه اصح وتكون الصفة التى فى ابن صياد وافقت مافى الدجال ـ(فتح البارى ج ١٣ ص ٢٧٨)

"ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইবনে সাইয়াদের কাহিনীর জবাব এভাবে দিয়েছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কসম শুনে মৌনতা অবলম্বন করেন এবং কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। তারপর আল্লাহর তরফ থেকে তিনি ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হন। হযরত যাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এর চেয়ে বেশী আর কিছু নেই। তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, দাজ্জাল অন্য কোনো ব্যক্তি ইবনে সাইয়াদ নয়। এ কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই কেউ কেউ ইবনে সাইয়াদ ছাড়া অন্য কোনো লোকের দাজ্জাল হওয়ার কথা দৃঢ়তার সাথে বলে থাকেন। তাদের প্রমাণ উপস্থাপনের এ পদ্ধতিটি অধিকতর সঠিক। ইবনে সাইয়াদের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিলো বলে নবী আলাইহিস সালাম তার ব্যাপারে মৌন ছিলেন।"

এরপর হাফেজ ইবনে হাজার আসকালীন তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহ আনহুর রেওয়ায়েত উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

وفى بعض طرقه عند البيهقى انه شيخ وسندها صحيح

"তামীমে দারীর কাহিনী বর্ণিত হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তি ছিলো বৃদ্ধ—এ বর্ণনার সনদটি সহীহ।"

ইমাম বায়হাকী তামীমে দারীর হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এ থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এভাবে উল্লেখ করেন ঃ

قال البيهقى فيه ان الدجال الاكبر الذى يخرج فى اخر الزمان غير ابن صياد ـ وكان ابن صياد احد الدجالين الكذا بين الذين اخير النبى عليه السلام بخروجهم وكان الذين يجزمون بان ابن صياد وهو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم والافا لجمع بينها بعيد ـ

اذ كيف ياتم ان يكون من كان فى اثناء الحيوة النبوتة شبه الحتلم ويجتمع

به النبى صلى الله عليه وسلم ويساله ان يكون شيخا كبيرا مسجونا فى جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم عن خبر النبى صلى الله عليه وسلم هل خرج ام لا - فالاولى ان يحمل على عدم الا طلاع - اهـ

"ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন : আখেরী যামানায় যে দাজ্জালে আকবরের আবির্ভাব হবে, সে ইবনে সাইয়াদ ছাড়া অপর একজন হবে—একথা তামীমে দারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা বলেছেন, ইবনে সাইয়াদ অবশ্যই তাদের একজন। যারা ইবনে সাইয়াদের বড় দাজ্জাল হওয়ার কথা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন তারা সম্ভবত তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাহিনী শ্রবণ করেননি। অন্যথ্যায় উভয়ের একত্রিত হওয়া খুবই অসম্ভব।

পরিশেষে এটা কেমন করে সম্ভব যে, যে ব্যক্তি (ইবনে সাইয়াদ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় যৌবনের দ্বার প্রান্তে মাত্র পৌছেছিলো। [যার সাথে সাক্ষাত করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কিছু কথাবার্তা জিজ্ঞেস করেন] সে ব্যক্তিই নবীর জীবনের শেষ দিকে একেবারে বৃদ্ধ হয়ে একটি দ্বীপে শৃংখলাবদ্ধ হয়ে অন্তরীণ থাকেন ? আবার সে ব্যক্তিই নবীর আবির্ভাব হয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করে ? (সুতরাং এ দু'জন এক ব্যক্তি হতে পারে না। অতএব, ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়ার তামীমে দারীর কাহিনী সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা হিসেবে ধরে নিতে হবে।)

ইমাম বায়হাকীর উপরোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা দাজ্জাল সম্পর্কে সারকথা যা জানা গেলো তা নিম্নরূপ :

(ক) ইবনে সাইয়াদ দাজ্জালে আকবার নয় বরং দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তিই দাজ্জালে আকবার।

(খ) ইবনে সাইয়াদ ও দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তি স্বতন্ত্র দু' ব্যক্তি। এ উভয় ব্যক্তি কোনোক্রমেই এক ব্যক্তি হতে পারে না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাদানী জীবনে তাকে এমন অবস্থায় দেখেন যে, সে তখনো বালেগও হয়নি। আর তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্তরীণ ব্যক্তিকে বৃদ্ধাবস্থায় দেখেন। একজন নাবালেগ ছেলে ১০ বছরের মধ্যে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া কিভাবে সম্ভব ? অধিকন্তু ইবনে সাইয়াদ নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে প্রথম থেকেই জ্ঞাত ছিলো। এমতাবস্থায় অন্তরীণ ব্যক্তি তামীমে দারীকে কেমন করে জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করতে পারে যে ? هل خرج رسول الاميين ام لا "উম্মী রসূলের আবির্ভাব হয়েছে কিনা ?"

(গ) হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে সাইয়াদের দাজ্জালে আকবার হওয়ার ব্যাপারে যে কসম করেছেন এবং এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৌনতা অবলম্বন ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়ার নিশ্চয়তা নয় অহীর মাধ্যমে নবী আলাইহিস সালামকে ইবনে সাইয়াদ বা অন্য কোনো লোকের দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে অবগত হয়নি। অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য ইবনে সাইয়াদের মধ্যেও বর্তমান ছিলো বিধায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে বিরত থাকেন এবং মৌনতা অবলম্বন করেন।

(ঘ) ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়া সম্পর্কে যেসব আলেম দৃঢ় মত পোষণ করেছেন তাঁরা তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাহিনী শ্রবণ করেননি। সম্ভবত শ্রবণ করার পর তারা নিজেদের রায় পরিবর্তন করেন।

দাজ্জালে আকবার মানুষ নয় বরং একটি শয়তান

দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তৃতীয় মত হলো—দাজ্জাল কোনো মানুষ নয় বরং শয়তান—যাকে ইয়ামানের কোনো দ্বীপে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। জাবীর বিন নাফীর, শুরাইহ বিন উবাইদ, আমর বিন আসওয়াদ এবং কাসীর বিন মুররা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ মত পোষণ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উস্তাদ শায়খ নায়ীম বিন হাম্মাদের উদ্বৃতিসহ তাদের অভিমত এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

وذكر نعيم بن حماد شيخ البخارى رحـ فى كتاب الفتن احاديث تتعلق بالدجال وخرجه منها ما اخرجه من طريق جبير بن نفيروا شريح بن عبيد وعمرو بن الاسود وكثير بن مرة - قالو اجميعا الدجال ليس هو بانسان وانما هو شيطان - موثق بسبعين حلقة فى بعض جزائر اليمن لايعلم من اوثقه فاذ ان ظهوره فك اللّه عنه كل عام حلقة -

"ইমাম বুখারীর উস্তাদ শায়খ নায়ীম বিন হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাবুল ফিতানে দাজ্জাল সম্পর্কে কতিপয় হাদীসের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীস জাবীর বিন নাফীর, শুরাইহ বিন উবাইদ, আমর বিন আসওয়াদ এবং কাসীর বিন মুররা রেওয়ায়েত করেছেন। তারা সকলেই বলেছেন ঃ দাজ্জাল কোনো মানুষ নয়, শয়তান। তাকে ইয়ামানের

www.pathagar.com

কোনো দ্বীপে ৭০টি হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তবে কে তাকে অবরোধ করেছেন একথা জানা নেই। তার আবির্ভাবের সময় আসলে আল্লাহ তায়ালা প্রতি বছর একটি করে হাতকড়ি খুলে দিয়ে তাকে মুক্ত করবেন।"

এ বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, কতিপয় আলেমের মতে দাজ্জাল কোনো মানুষ নয় বরং শয়তান। সুতরাং তাদের মতে ইবনে সাইয়াদ কিংবা দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তি দাজ্জাল নয়। কেননা তারা উভয়ই ছিলো মানুষ। আর মানুষ তাঁদের মতে দাজ্জাল হতে পারে না। দাজ্জাল হবে শয়তান।

ইবনে সাইয়াদ যে ইহুদী বংশোদ্ভূদ একজন মানুষ ছিলো তা বলাই বাহুল্য। দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তিও মানুষ ছিলো তা তামামী দারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু فاذا اعظم انسان رأيناه فيه একথা দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যায়। আর উপরোক্ত রেওয়ায়েতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, الدجال ليس هو بانسان দাজ্জাল ইনসান নয়। সুতরাং উলামায়ে সালফদের মতে ইবনে সাইয়াদ কিংবা দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তি দাজ্জালে আকবার নয়। বরং দাজ্জাল তৃতীয় ব্যক্তি যে দু' ব্যক্তি থেকে ভিন্নতর কোনো ব্যক্তি।

আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দৃষ্টিভংগী

উপরোল্লেখিত তিনটি অভিমতের মধ্যে হাফেজ ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দৃষ্টিভংগী হলো দ্বিতীয় মতের অনুরূপ। তাঁর মতে দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তি যার সাথে তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু সাক্ষাত করেছিলেন সে-ই দাজ্জালে আকবার। ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহও এ মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে ইবনে সাইয়াদ ছিলো একটি শয়তান, যে সে সময় দাজ্জালের আকৃতিতে আবির্ভূত হয়েছিলো। ইস্পাহানের দিকে গিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। দাজ্জালে আকবারের আবির্ভাবের সাথে সেও আবির্ভূত হবে। ইবনে সাইয়াদ এবং তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্যে হাফেজ ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন ঃ

واقرب مايجمع به ماتضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال ان الدجال بعينه هو الذى شاهده تميم موثقا وان ابن صياد شيطان تبدى فى صورة الدجال فى تلك المدة الى ان توجه الى اصبهان فاستترمع قرينه الى ان تجئ المدة التى قدر اللّه تعالى خروجه فيها ـ اهـ

www.pathagar.com

"ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়ার হাদীস এবং দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়া সম্পর্কে তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তিকে দাজ্জালে আকবার সাব্যস্ত করা এবং ইবনে সাইয়াদকে শয়তান হিসাবে আখ্যায়িত করা। ঐ সময়ে সেই দাজ্জালের আকৃতিতে আবির্ভূত হয়েছিলো এবং পরে ইস্পাহানে গিয়ে নিজের সাথীর সাথে অদৃশ্য হয়েছিলো এবং দাজ্জালের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত অদৃশ্য থাকবে।"

এ বাক্যাংশ দ্বারা ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে দ্বীপে অবরুদ্ধ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়া যদিও প্রমাণ করা যায় তথাপি দাজ্জালে আকবারের প্রসংগটি যে চরম সংশয়পূর্ণ এ সত্যও তিনি স্বীকার করেছেন। এ কারণেই ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কিত হাদীসগুলোকে তামীমে দারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির হাদীসের মুকাবিলায় অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারীর মতে ইবনে সাইয়াদই দাজ্জালে আকবার, দ্বীপে আবদ্ধ ব্যক্তি নয়। ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথাগুলো এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

ولشدة التباس الامر فی ذالك سلك البخاری مسلك التوجيح فاقتصر على حديث جابر عن عمر فی ابن صياد ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس فی قصة تميم -

"দাজ্জাল প্রসংগটি যেহেতু চরম সংশয়পূর্ণ, সুতরাং ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অগ্রাধিকারের ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। এই ভিত্তিতে ইমাম বুখারী ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কিত জাবেরের হাদীসকে যথেষ্ট মনে করে তামীমে দারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাহিনী সম্বলিত ফাতেমা বিনতে কয়েসের হাদীস বর্ণনা করেননি।"

উপরোল্লেখিত তিনটি মতের ব্যাখ্যা

দাজ্জালের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে উপরোল্লেখিত তিনটি অভিমতকে যদি দ্বীন ও শরীয়াতের মৌলিক ও স্বীকৃত নীতিমালার আলোকে দেখা যায়, তাহলে এসব মতামতের কোনো একটিও এমন মর্যাদার অধিকারী নয়, যার ওপর নির্ভর করে দাজ্জাল সম্পর্কে ইসলামী আকীদার ভিত্তি রাখা সম্ভব। এর কতিপয় কারণ আমরা নিম্নে বর্ণনা করেছি ঃ

প্রথম কারণ ঃ পবিত্র শরীয়াত থেকে ইসলামী আকীদারূপে আমরা যা অবগত হয়েছি তার বৈশিষ্ট্য হলো উম্মতের পূর্বপুরুষগণ এসব আকীদা সম্পর্কে

www.pathagar.com

ভিন্নমত পোষণ করতেন না বরং এ সম্পর্কে তাদের ছিলো অভিন্ন মত। কিন্তু দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীগণ অসংখ্য মতানুসারী। কোনো এক ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়নি। এক দলের মতে ইবনে সাইয়াদ দাজ্জালে আকবার। অপর দলের মতে দ্বীপে অবরুদ্ধ ব্যক্তি যার সাথে তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু সাক্ষাত করেছিলেন—বড় দাজ্জাল। তৃতীয় দলের মতে দাজ্জাল কোনো মানুষে নয় বরং সে একটি শয়তান যে ইয়ামানের কোনো একটি দ্বীপে অন্তরীণ আছে। কিয়ামাত নিকটবর্তী হলে তার প্রকাশ ঘটবে। এ ধরনের মতবিরোধ প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সবসময়ই চলে আসছে। এ মতপার্থক্য স্বতই প্রমাণ করে যে, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিরই বড় দাজ্জাল হওয়ার বিশ্বাস রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে জরুরী নয় এবং ইসলামী আকীদার মধ্যে গণ্যও করা যায় না। কারণ, ইসলামী আকীদাসমূহের মধ্যে উম্মতের পূর্বপুরুষগণ এবং আলেম ফাযেলগণ দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রচণ্ড মতপার্থক্যের মতো কখনো মতবিরোধ করেননি। বরং ইসলামী আকীদারূপে স্বীকৃত ব্যাপারে তারা ছিলেন একমত ও অভিন্ন। আর এখানে আলেমদের একতা ও অভিন্নতা অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় কারণ ঃ মুসলিম উম্মার সমস্ত মানুষ এ ব্যাপারে একমত যে, ইসলামী আকায়েদের বিষয়গুলো অকাট্য ও নিশ্চিত। আর নিশ্চয়তা ও অকাট্যতার বুনিয়াদ হলো কুরআনের স্পষ্ট আয়াতসমূহ যা ইসলামে সন্দেহাতীত আকায়েদের নিশ্চিত দলীল। এসব আয়াতে সংশ্লিষ্ট আকায়েদ ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর সম্ভাবনা আদৌ থাকবে না। অথবা তা হবে এমন হাদীস যা প্রমাণের দিক থেকে মুতাওয়াতের এবং প্রয়োগের দিক থেকে অকাট্য ও নিশ্চিত। এবং সেসব হাদীসে উল্লেখিত আকীদা ব্যতিরেকে অন্য কোনো কিছু হওয়ার কোনোই অবকাশ নেই। অথবা তৃতীয় স্তরে ইসলামী আকায়েদের বুনিয়াদ হতে পারে এমন সব ইজমা যার বিষয়ে সাহাবীদের যুগের সমস্ত সাহাবীদের সম্মতি থাকার কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং ধারাবাহিক পদ্ধতিতে তা আমাদের কাছে বর্ণিত হয়ে আসছে।

ইসলামী আকায়েদের জন্যে এ তিনটি বুনিয়াদ ছাড়া চতুর্থ কোনো বুনিয়াদ হতে পারে না। একথা দিবালোকের মতো সত্য যে, আজ পর্যন্ত এমন কোনো নির্দিষ্ট লোকের সন্ধান পাওয়া যায়নি যাকে কুরআনের অকাট্য আয়াত দ্বারা দাজ্জালে আকবার প্রমাণ করা যায় অথবা কোনো মুতাওয়াতের হাদীস থেকে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে কিংবা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি দাজ্জালে আকবার হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীদের আমলের সমস্ত সাহাবা ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং ধারাবাহিক পদ্ধতিতে আমাদের কাছে তা পৌছেছে। এ তিনটি বুনিয়াদ যখন

www.pathagar.com

এখানে অনুপস্থিত তখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দাজ্জালে আকবার ঘোষণা করাও কোনো ইসলামী আকীদা নয়। যেসব হাদীস ও রেওয়ায়েতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কথা হলো—সেগুলো প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ উভয় থেকেই সন্দেহযুক্ত। এ ধরনের রেওয়ায়েত যদিও আমলের জন্যে বুনিয়াদ হতে পারে কিন্তু একটি শরীয়তী আকীদার জন্য কোনোক্রমেই বুনিয়াদ হতে পারে না। كما هو المصرح فى اسفارهم وزبرهم

তৃতীয় কারণ ঃ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়ার আকীদা পোষণ করা যদি ইসলামী আকীদাসমূহের মধ্যে গণ্য হতো তাহলে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়ার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃঢ়তার সাথে বিস্তারিত ব্যক্ত করতেন। কিন্তু সিহাহ সিত্তার কোনো কিতাবে এমন কোনো সহীহ ও মারফু হাদীসের সন্ধান মিলে না যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বড় দাজ্জাল হওয়া সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির দাজ্জাল হওয়া সম্পর্কে আমাদের পূর্বপুরুষ আলেমগণ যে ধারণা পেশ করেছেন অথবা দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করেছেন তা ছিলো কতিপয় সহীহ রেওয়ায়েত থেকে উদ্ভাবিত তাদের নিজস্ব ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত মাত্র। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কারো দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেননি।

সর্বাধিক সহীহ রেওয়ায়েতসমূহের অবস্থা

সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকতর সহীহ রেওয়ায়েত দু' প্রকার। এর এক প্রকার রেওয়ায়েতে ইবনে সাইয়াদের উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার রেওয়ায়েতে তামীমে দারীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তবে উভয় ধরনের রেওয়ায়েতের অবস্থা হলো—এগুলোর মধ্যে এমন শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না যার দ্বারা ইবনে সাইয়াদ অথবা তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেখা অন্তরীণ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

এসব রেওয়ায়েত দ্বারা বড়জোর এতটুকুই প্রমাণিত হতে পারে যে, নবী আলাইসি সালামকে বড় দাজ্জালের যেসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অহীর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছিলো তার কতিপয় বৈশিষ্ট্য ইবনে সাইয়াদের মধ্যে বর্তমান থাকায় হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তার দাজ্জালে আকবার হওয়ার কসম করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যক্তিরই দাজ্জাল হওয়ার সম্ভাবনার সন্দেহের বশবর্তী

www.pathagar.com

হয়ে মৌন থাকেন। তারপর এমনিভাবে তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন দ্বীপে আবদ্ধ ব্যক্তির অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বর্ণনা করলেন তখন তিনি ইবনে সাইয়াদের তুলনায় অন্তরীণ ব্যক্তি সম্পর্কে বেশী আশংকা প্রকাশ করেন। তিনি এ ব্যক্তি সম্পর্কেও উম্মতদেরকে সতর্ক করলেন। উক্ত ব্যক্তি দাজ্জালে আকবার নয়তো !

এসব রেওয়ায়েত দ্বারা আদৌ একথা প্রমাণিত হয় না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের বাণী দ্বারা এ দু' ব্যক্তির কোনো একজন সম্পর্কে দাজ্জাল হওয়ার দৃঢ় মত ব্যক্ত করে গেছেন। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী আলেমগণ মতপার্থক্য করায় এ বিষয়টি আরো ফুটে উঠেছে।

এমনিভাবে তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েতের মাধ্যমে দ্বীপে অবরুদ্ধ ব্যক্তির দাজ্জাল হওয়া সম্পর্কে যারা দৃঢ় মত পোষণ করেছেন, তাদের দাবীও গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করবো। এখন রয়ে গেলো তৃতীয় মত। এ মতানুযায়ী দাজ্জাল মানুষ নয় বরং শয়তান। এ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহামতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঃ

ولعل هؤلاء مع كونهم ثقات تلقوا ذالك من بعض كتب اهل الكتاب -

"সম্ভবতঃ এসব লোক নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ঘটনাটি আহলে কিতাবদের কোনো কিতাব থেকে গ্রহণ করেছেন।"

সুতরাং দাজ্জাল সম্পর্কে কোনো আকীদার বুনিয়াদ রচনা করার মতো মর্যাদা এ রেওয়ায়েতটিরও নেই।

দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আরো একটি অভিমত

দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে উপরোক্ত তিনটি অভিমত ছাড়াও চতুর্থ অভিমত হলো—দাজ্জাল এমন কোনো জ্ঞাত ব্যক্তি বা বিদ্যমান ব্যক্তি নয় যার সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালাম দৃঢ় মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, এ ব্যক্তিই দাজ্জাল এবং এর আবির্ভাব হবে কিয়ামাতের সময়ে এবং ঈসা ইবনে মরিয়াম আলাইহি সালামের হাতে নিহত হবে। বরং দাজ্জাল একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি যার আবির্ভাব হবে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে। সে হবে উম্মতের জন্য এক বিরাট ফেতনা। সহীহ হাদীসে তার যে বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় বর্ণিত হয়েছে সে হবে তার অনুরূপ। পরিশেষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতরণ করতঃ তাকে হত্যা করবেন।

www.pathagar.com

শরীয়াতের মূলনীতি ও দীনের স্বীকৃত পদ্ধতির দৃষ্টিভংগিতে আমাদের সুচিন্তিত মতে শেষ অভিমতটিই অধিকতর সঠিক। এ কারণে আমাদের মতে দাজ্জাল সম্পর্কে কোনো ইসলামী আকীদা হতে হলে তা হবে এই যে, দাজ্জালে আকবার কে তা এখনো জানা যায়নি। তবে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসহ সে প্রকাশ পাবে। পরিশেষে ঈসা আলাইহিস সালামের হাতে সে মারা যাবে।

এ অভিমতটি যে অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত তা প্রমাণ করার জন্যে আমরা নিম্নে কিছু দলীল এক এক করে পেশ করছি ঃ

এক ঃ সমস্ত আলেমের মতে একথা স্বীকৃত যে, কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কতিপয় আলামতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়াও অন্যতম আলামত। আর এটা একটি অকাট্য এবং স্বীকৃত সত্য যে, কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ শুধু এতটুকুই জানে যে, কিয়ামত হবে এবং এ বিশ্বজাহান ধ্বংস হয়ে যাবে। যাতে সকলেই নিজ নিজ কর্মফল পরিপূর্ণরূপে ভোগ করতে পারে। কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার দিনক্ষণটি আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই জানে না। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিয়ামত কখন হবে এ মর্মে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি বললেন ঃ এ বিষয়ে উত্তরদাতা প্রশ্নকর্তার চেয়ে বেশী অবগত নয়। ما المسئول عنها باعلم من السائل অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই হবে একথা আমার মতো তুমিও জানো। কিন্তু বিশেষ সময়টি সম্পর্কে তুমি যেমন জানো না আমিও তেমনি জানি না।

দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া যেহেতু কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সুতরাং তার বিশেষ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিজগতের কাছে অজানা থাকা দরকার। কেননা ব্যক্তিত্ব নির্দিষ্ট করণের সাথে শরীয়াতের কোনো উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত নয়। আবার ব্যক্তিত্বের অস্পষ্টতা কোনো শরীয়তি নীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

দুই ঃ একমাত্র দাজ্জালের আবির্ভাবই কিয়ামতের আলামত নয়। বরং অন্যান্য অনেক বিষয়কেই কিয়ামতের আলামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন مثلا دابة الارض কিয়ামতের আগে যমীন থেকে একটি জন্তুর আবির্ভাব হওয়া। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ-

www.pathagar.com

"যখন তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা হবে তখন তাদের জন্যে যমীন থেকে একটি জন্তু বের করবো, যে তাদের সাথে কথা বলবে ; যে লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহের ওপর বিশ্বাসস্থাপন করতো না।"

এমনিভাবে ইয়াজুজ-মাজুজ ও পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়াও কিয়ামতের আলামত। এসব জিনিস এমন যার বৈশিষ্ট্য ও বিশদ বিবরণ কারো জানা নেই। জন্তুটি কি ধরনের হবে, কোত্থেকে বের হবে, তার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকবে সে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কেউ কি জানতে পেরেছে ? তেমনি ইয়াজুজ-মাজুজ কে হবে, কখন কোত্থেকে বের হবে অথবা অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে—এ বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা ও কল্পনা ছাড়া দৃঢ় প্রত্যয় ও অভিজ্ঞতার আলোকে অদ্যাবধি কেউ অবহিত হয়নি। যদি এসব আলামত ও বৈশিষ্ট্য এবং বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কেউ অবগত না হওয়া সত্ত্বেও অস্পষ্টতাসহ এগুলোকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে স্বীকার করা হয়ে থাকে, তাহলে একমাত্র দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করতে এবং এটাকে ইসলামী আকীদার মধ্যে শামিল করতে এতো পীড়াপীড়ি কেন ?

দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব অজানা হয়ে থাকা সত্ত্বেও কি সেটা কিয়ামতের আলামত হতে পারে না ? যদি তার ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ না করা হয় এবং কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে ঈমান আনা না হয় বরং কিয়ামতের আগে অমুক অমুক বৈশিষ্ট্যসহ বিরাট ফেতনার কারণ হয়ে সবচেয়ে বড় দাজ্জালের আবির্ভাব হবে—এতটুকু আকীদা রাখে, তাহলে একজন মুসলমানের ঈমান ও ইসলামে কি কোনো ক্ষতির সৃষ্টি হবে ? অথবা তার এ আকীদা পোষণ করার কারণে কোনো স্বীকৃত শরয়ী নীতির খেলাফ কোনো নতুন আকীদা প্রতিষ্ঠা করার দোষে সে কি দোষী হবে ? যার বিরুদ্ধে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ কায়েম করা যায় এবং তাকে গোমরাহ ঘোষণা করার জন্যে বিজ্ঞাপন ও পোষ্টারের সাহায্য নেয়া যায় ? না, তা কখনো নয়।

তিন ঃ এ অভিমতটি তুলনামূলকভাবে সঠিক হওয়ার তৃতীয় দলীল হলো, আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, ইসলামী আকায়েদ অকাট্য ও নিশ্চিত হয়ে থাকে। সুতরাং এর প্রমাণও শরীয়াতের দৃষ্টিতে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে থাকা বাঞ্ছণীয়। আর দাজ্জাল সম্পর্কে ইসলামী শরীয়াতে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে যা প্রমাণিত তাহলো দাজ্জালের অস্তিত্ব, তার আবির্ভাব, বৈশিষ্ট্য ও আলামতসমূহ। এ বিষয়ে গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত একমত। আলোচনার সূচনায় এ বিষয়ে কাযী আয়াজের ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এ তিনটি ব্যাপারে সমস্ত উম্মত একমত এবং অর্থগতভাবে মুতাওয়াতের হাদীস দ্বারাও এগুলো দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত। কেননা, সমস্ত রেওয়ায়েতে সাধারণ-ভাবে দাজ্জাল সম্পর্কে এ তিনটি জিনিসের উল্লেখ আছে। এক— দাজ্জালের নির্দিষ্ট ব্যক্তি হওয়া, দুই—কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জালের প্রকাশ ঘটা এবং তিন—দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় চিহ্নসমূহ। এ পরিপ্রেক্ষিতে দাজ্জাল সম্পর্কে যদি কোনো ইসলামী আকীদা পোষণ করতে হয় তাহলে তা শুধু এই যে, দাজ্জাল আসবে, কিয়ামতের আগে। উম্মতের জন্যে বড় ফেতনারূপে তার প্রকাশ ঘটবে এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য ও আলামতের অধিকারী হবে। দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব নির্দিষ্টকরণ ইসলামী আকীদার পর্যায়ভুক্ত বলে গ্রহণ করা যায় না। কেননা, ইসলামী শরীয়তে এর প্রমাণ নিশ্চিত নয়। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির দাজ্জাল হওয়া সম্পর্কে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত কোনো ঐকমত্যের প্রতিষ্ঠা হয়নি বরং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলেমগণ সবসময় ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। পূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনে সাইয়াদ ও দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তি সম্পর্কে যেসব হাদীসের বর্ণনা এসেছে সেগুলো অকাট্যভাবে নিশ্চতরূপে প্রমাণিত নয়। অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত বস্তুই ইসলামী আকীদার উৎস হতে পারে। ধারণা ও কল্পনা প্রসূত রেওয়ায়েত দ্বারা ইসলামী আকীদা প্রমাণিত হতে পারে না। এ কারণেই ইবনে সাইয়াদ এবং অন্তরীণ ব্যক্তি দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে কোনোকালেই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

একটি জটিলতা ও তার সমাধান

উপরে আমাদের পেশকৃত আলোচনা সম্পর্কে কেউ সম্ভবত এ অভিযোগ উত্থাপন করবেন যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়ার ব্যাপারে এমন কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না যা একদিকে দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত এবং অপরদিকে অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। উল্লেখিত হাদীসগুলো সম্পর্কে এরূপ দাবী করা ভুল। কেননা, ফাতেমা বিনতে কয়েস রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসটি দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তিব দাজ্জালে আকবার হওয়া দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে। তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে অন্তরীণ ব্যক্তির সাক্ষাত হয়েছিলো। এ কারণেই মুহাদ্দিসগণের অধিকাংশই এ বর্ণনার ভিত্তিতে দ্বীপে অবরুদ্ধ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়ার সমর্থক। সুতরাং হাদীসে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দাজ্জালে আকবার হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা দেয়া হয়নি একথা সঠিক বলে কিভাবে স্বীকার করা যায়?

এ অভিযোগের প্রথম জবাব হলো, তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় যে অন্তরীণ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাকে ইসলামী আকীদা

www.pathagar.com

হিসেবে দাজ্জালে আকবার রূপে স্বীকার করা যায় না। কেননা এ বর্ণনায় যে লোকটির দাজ্জালে আকবার হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ অনুপস্থিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ লোকটিরই দাজ্জালে আকবার হওয়া সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা করেছেন—এমন কথাও উক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় না। হাদীসের শব্দাবলী ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনাভংগি থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, অহীর মারফতে দাজ্জালের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা জ্ঞাত হয়েছে তার অধিকাংশ উক্তি অন্তরীণ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিলো বিধায় ঐ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়ার ব্যাপারে নবী আলাইহিস সালাম যথেষ্ট আশংকা প্রকাশ করেননি। এ কারণে তিনি উক্ত লোকটি সম্পর্কে উম্মতদের এভাবে সতর্ক করেন যে, তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে লোকটির বর্ণনা দিয়েছেন দাজ্জালে আকবার সম্পর্কে আমার দেয়া বিবরণে তার সাদৃশ্য রয়েছে। হাদীসের শব্দগুলো এরূপ ঃ

حدثنى حديثا وافق الذى كنت حدثتكم عنه ـ

সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে, ঐ লোকটি ও দাজ্জালে আকবারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর দিক থেকে খুব ঘনিষ্টতা পরিদৃশ্য হয়—কেবল একথায় উম্মতদের সতর্ক করাই নবীর উদ্দেশ্য, নিশ্চিতভাবে লোকটির দাজ্জালে আকবার হওয়ার নির্দেশ দেয়া নবীর উদ্দেশ্য ছিলো না। অন্যথায় এ উদ্দেশ্য প্রকাশ করার জন্যে অধিক সংগত হতো এভাবে বলায় ঃ

هذا هو الذى كنت حدثتكم عنه انه الدجال ـ

"এ নির্দিষ্ট লোকটিই সেই ব্যক্তিত্ব যার দাজ্জালে আকবার হওয়া সম্পর্কে আমি তোমাদের বলেছি।"

এ কারণেই কতিপয় সম্মানিত সাহাবা এ হাদীসের রাবী হওয়া সত্ত্বেও দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন না। বরঞ্চ ইবনে সাইয়াদকেই দাজ্জালে আকবর মনে করতে পীড়াপীড়ি করেন। সুতরাং আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, তিনিও তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের রাবী হওয়া সত্ত্বেও তাদের ছাত্র ইবনে আবু সালামাহ নিজের উস্তাদ সম্পর্কে বলেন ঃ

شهد جابر ان الدجال هو ابن صياد قلت فانه قد مات قال وان مات قلت فانه قد اسلم قال وان اسلم قلت فانه قد دخل المدينة ـ قال وان دخل المدينة ـ

www.pathagar.com

"হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে সাইয়াদ দাজ্জাল হওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। আমি বললাম, সে মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ যদি মরে গিয়েও থাকে তবুও। আমি বললাম ঃ সেতো মুসলমান হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ যদি মুসলমান হয়ে থাকে তবুও। আমি পুনরায় আরয করলামঃ সে তো মদীনায় প্রবেশ করেছে। তিনি বললেন ঃ মদীনায় প্রবেশ করে থাকলেও।"

এবার বলুন যে, যদি তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তরীণ ব্যক্তিকে নিশ্চিতভাবে দাজ্জালে আকবার ঘোষণা করতেন তাহলে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু সে হাদীসের একজন রাবী হয়েও হাদীসের নিশ্চিত ও অকাট্য অর্থ ও তাৎপর্যকে অস্বীকার করে ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জালে আকবার হিসেবে স্বীকার করে নেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করা কোন্ যুক্তিতে জায়েয হতে পারে ? নবী আলাইহিস সালামের একটি নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত বাণী উপেক্ষা করার মতো কাজ কোনো সাহাবা করতে পারেন কি ? অতএব, জানা গেলো যে, তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েতে দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তির দাজ্জাল হওয়া সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো নিশ্চিত বাণী নেই এবং হাদীসেও এর কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই।

উল্লেখিত অভিযোগের দ্বিতীয় জবাব এই যে, বিগত আলোচনায় সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নবীর ইন্তিকালের পর সাহাবীদের যুগ থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত প্রতি যুগের আলেমগণ বিরাট মতপার্থক্য করেছেন। কারো মতে ইবনে সাইয়াদ দাজ্জালে আকবার। কারো মতে দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তি যার সাথে তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাত হয়েছিলো সেই দাজ্জাল। আবার কতিপয় নির্ভরযোগ্য স্বনামধন্য আলেম ও মুহাদ্দিসের দাবী হলো দাজ্জাল আদৌ মানুষ নয় বরং এক শয়তান যাকে ইয়ামানের কোনো একটি দ্বীপে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। একথা দুর্বোধ্য ও অযৌক্তিক যে, তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিশ্চিতরূপে দাজ্জালে আকবার বলে ঘোষণা দেয়ার পরও তার মৃত্যুর পর উম্মতের গোটা আলেম সমাজ এ ব্যাপারে এতবেশী মতপার্থক্য করেন। এ মতভেদের মধ্যে অনেক আলেম এবং উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবা পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েন এবং দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়ার কথা স্পষ্টত অস্বীকার করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দাজ্জালে আকবার বলে ঘোষণা করেননি।

অন্যথায় উলামায়ে সালফ এ ব্যাপারে এতোবেশী মতভেদ করতেন না এবং তার দাজ্জালে আকবার হওয়াকে কেউ অস্বীকারও করতে পারতো না।

উল্লেখিত অভিযোগের তৃতীয় জবাব হলো, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দ্বীপে আবদ্ধ লোকটির কাহিনী বর্ণনা করলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সামনে তার পরপরই বললেন ঃ

الا انه فی بحر الشام او بحر اليمن لابل من قبل المشرق واوما بيده الى المشرق - رواه مسلم

"স্মরণ রেখো দাজ্জাল শাম কিংবা ইয়ামান সাগরে নেই, বরং সে পূর্বদিক থেকে বের হবে এবং তিনি হাত দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করে দেখালেন।
-(মুসলিম)

হাদীসের এ অংশ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নবী আলাইহিস সালাম অন্তরীণ ব্যক্তিকে দাজ্জালে আকবার ঘোষণা করেননি। তিনি তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বর্ণনাকেও সত্যায়ন করেননি। কেননা অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে দাজ্জালে আকবার ঘোষণা করলে বা তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা সত্যায়ন করলে তিনি এভাবে বলতেন ঃ

الا انه هو الدجال الاكبر وسيخرج من تلك الجزيرة -

"সাবধান, ঐ ব্যক্তিই দাজ্জালে আকবার। শীঘ্রই সে দ্বীপ থেকে বের হবে।"

কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি বললেন ঃ

الا انه فی بحر الشام او بحر اليمن - لابل من قبل المشرق -

হাদীসের এ বাক্যাংশ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব ও আবির্ভাবস্থান উভয়টিই অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত ঘোষণা করেছেন এবং তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনার সাথে মতভেদ প্রকাশ করেছেন, তা সত্যায়ন করেননি। এমনিভাবে হাদীসটি চতুর্থ অভিমত পোষণকারীদের অভিমতের স্বপক্ষে দলীল হয়ে যাবে এবং অবরুদ্ধ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়ার ব্যাপারে হাদীসটি আদৌ কোনো দলীল হবে না।

উল্লেখিত হাদীসের এ অর্থ আমাদের নিজেদের বানানো নয়। বরং হাদীস বিশারদগণ এ অর্থই করেছেন। তারা স্পষ্টত বলেছেন যে, এ বাক্য দ্বারা দাজ্জালের স্থান অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত একথা বলাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়া সাল্লামের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো। যখন দাজ্জালের আবির্ভাবস্থান অজানা ও অজ্ঞাত বলে নবী কর্তৃক ঘোষিত হলো তখন দ্বীপে অন্তরীন ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়ার নিশ্চিত ও অকাট্য সিদ্ধান্ত যে হয়নি তা বলাই বাহুল্য।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ বাক্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

لما ابهم الله تعالى امر الساعة واوقات ظهور اماراتها بالتعين ولهذا وقع اختلاف فى الاحاديث فى ترتيبها ابهم مكان الدجال موثقا مردوابين هو لاء الاماكن الثلثة مع غلبة الظن فى اخرها وهو ايضا غير متعين بل الذى علم كونه من قبل المشرق وهذا معنى نفى الاولين واثبات الثالث -

"আল্লাহ্ তায়ালা যখন কিয়ামতের ব্যাপারটি অস্পষ্ট করে রেখেছেন এবং কিয়ামতের আলামতসমূহের প্রকাশ কালও নির্দিষ্ট করে দেননি যার কারণে হাদীসে আলামতসমূহের বিন্যাসেও মতভেদ সৃষ্টি হয়—তখন দাজ্জালের অন্তরীণ স্থলও তিনটি স্থানের মাঝখানে অস্পষ্ট করে রেখেছেন। তিনটি জায়গার মধ্যে সর্বশেষ স্থানটি দাজ্জালের আবির্ভাবস্থল বলে অধিক ধারণা হতে পারে যদিও তা নিশ্চিত নয়। পূর্বদিক থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে শুধু একথাটুকুই নিশ্চিত। প্রথম দু'টির অস্বীকৃতি এবং তৃতীয়টির স্বীকৃতির এটাই তাৎপর্য।

الا انه فى بحر الشام اوبحر اليمن لابل من قبل المشرق -

শায়খ আবদুল হক রাহমাতুল্লাহ সাহেব এ বাক্যাংশের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে দাজ্জালের আবির্ভাব কিয়ামতের আলামত সে দাজ্জালের আবির্ভাবস্থল অজানা ও অজ্ঞাত। দাজ্জাল প্রাচ্য থেকে প্রকাশ পাবে শুধু একথাটুকুই নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত।

এতে একথাও স্বতই প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্বীপে অবরুদ্ধ ব্যক্তি যার কাহিনী তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন সে দাজ্জালে আকবার নয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার দাজ্জালে আকবার হওয়ার সিদ্ধান্ত দেননি। কেননা, الا انه এখানে انه -এর সর্বনাম দ্বারা দাজ্জালই উদ্দেশ্য। দাজ্জাল সিরিয়া অথবা ইয়ামান সাগরে আছে। না, বরং প্রাচ্যদিকে এমন সিদ্ধান্ত প্রদান করা সহীহ হতে পারে না। কেননা সে ছিলো একজন জ্ঞাত ব্যক্তি যে নির্দিষ্ট স্থানে অবরুদ্ধ ছিলো। সুতরাং সে যদি সিরিয়ার সাগরে থাকে তাহলে ইয়ামান সাগরে হওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক হতে পারে না। আবার যদি সিরিয়া এবং ইয়ামান সাগরের দ্বীপ ছাড়া অন্য কোনো দ্বীপে থেকে থাকে

www.pathagar.com

তাহলে এ দু' সাগরের দ্বীপে দাজ্জাল অবস্থান করার সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না। তাছাড়া ঐ অন্তরীণ ব্যক্তি পূর্বদিকে কথাটি নিতান্তই দুর্বোধ্য হবে। কারণ, সে যে দ্বীপে অবরুদ্ধ ছিলো তা কখনো প্রাচ্য দেশের নয়।

এভাবে একথাটি নবীর বাণীর মতো বাণী থাকবে না। বরঞ্চ এর উদাহরণ হবে এমন যেমন ঢাকার কারাগারে অবরুদ্ধ কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বলা যায় যে, সে ঢাকা অথবা রাজশাহীতে আছে। তারপর বলা হবে না, সে তো অবশ্যই চট্টগ্রামে আছে। এবার বলুন, এ ধরনের কথা কি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির হতে পারে ? অতএব, الا انه -এর সর্বনাম দ্বারা দাজ্জাল হওয়ার কথা স্বীকার করতেই হবে এবং তার সিরিয়া কিংবা ইয়ামান সাগরে অবস্থান করার কথা বলা ছিলো ধারণা ভিত্তিক। কিন্তু তার পর পরই আগত অহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংকেত প্রাপ্ত হন যে, দাজ্জালে আকবারের জায়গা সিরিয়া কিংবা ইয়ামন সাগর নয় এবং তার জায়গা অজ্ঞাত ও অজানা। তবে তোমাদের এতোটুকু জানা উচিত যে, সে পূর্ব দিক থেকে প্রকাশ পাবে। এ কারণে নবী আইহিস সালাম প্রথম দু'টি স্থানের কথা থেকে বিরত থেকে বললেন ঃ لابل من قبل المشرق তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে অন্তরীণ ব্যক্তির খবর দিয়েছিলেন যদি সে-ই দাজ্জালে আকবার হতো এবং তার দাজ্জালে আকবার হওয়ার সিদ্ধান্ত দেয়া উদ্দেশ্যও হতো এবং তামীমে দারীর রাদিয়াল্লাহ আনহুর রেওয়ায়েতকে সত্যায়ন করা মকসুদ হতো তাহলে সে জন্য বাক্যটির এরূপ হওয়া যথার্থ হতো এবং তা সহজ-সরল হতো।

الا ان الذى قد حدث عنه تميم هو الدجال الاكبر وهو يخرج من تلك الجزيرة-

হাদীসে বর্ণিত বাক্যটি এ উদ্দেশ্য পূরণে যথেষ্ট নয়। আমাদের আশ্চর্য লাগে যে, যারা তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারা দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়ার দলীল পেশ করেন তারা হাদীসে এমন কি বাক্য পেলেন যা দ্বারা ঐ ব্যক্তিরই দাজ্জালে আকবার হওয়ার কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বলে ধরে নিলেন।

الا انه فى بحر الشام اوفى بحر اليمن لابل من قبل المشرق-

উপরে এ বাক্যাংশের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আল্লামা আশরাফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে হুবহু সে ব্যাখ্যাই উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

قال الا شرف يمكن انه صلى الله عليه وسلم كان شاكا فى موضعه وكان

فی ظنه انه لايخلوا عن هذه المواضع الثلثة فلما ذكر بحر الشام وبحر اليمن تيقن له من جهة الوحی او غلب علی ظنه انه من قبل المشرق فنفی الاولين واضرب عنهما وحقق الثالث۔

"আশরাফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঃ সম্ভবত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের স্থান সম্পর্কে সন্দিহান ও অনিশ্চিত ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিলো দাজ্জাল এ তিনটি জায়গার কোনো একটি জায়গায় অবশ্যই থাকবে। সিরিয়া এবং ইয়ামান সাগরে হওয়ার কথা যখন তিনি উল্লেখ করলেন তখন অহীর মাধ্যমে নিশ্চিত হলেন অথবা নিশ্চিত ধারণা হলো যে, দাজ্জাল পূর্বদিক থেকে আবির্ভাব হবে। এ জন্যে তিনি প্রথম দু'টি জায়গা থেকে বিরত থেকে তৃতীয় জায়গাটি নির্দিষ্ট করে দিলেন।"

হাদীস শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারীগণের এসব উক্তি ও মতামত স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, ফাতেমা বিনতে কায়েস বর্ণিত হাদীসে তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে অন্তরীণ ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাজ্জালে আকবার হওয়ার কথা ঘোষণা করেননি। তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত কাহিনীটি তিনি নিশ্চিতরূপে সমর্থনও করেননি। বরং অন্তরীণ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ দাজ্জালের বৈশিষ্ট্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় তিনি আশংকা করলেন যে, এ লোকটিই দাজ্জালে আকবার নয় তো ? তাই তিনি লোকদেরকে এ বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করলেন। অতপর তিনি প্রকৃত দাজ্জাল সম্পর্কে বললেন যে, সে পূর্বদিক থেকে আবির্ভূত হবে।

কিছুক্ষণের জন্যে যদি স্বীকার করেও নেয়া হয় যে, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা অনুসারে দ্বীপে অবরুদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালে আকবার হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তবুও হাদীসটি উসূলে হাদীসের নিরিখে এমন পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারবে না যার ওপর ভিত্তি করে কোনো ইসলামী আকীদার বুনিয়াদ রাখা সম্ভব। হাদীসটি সনদের দিক থেকে মুতাওয়াতের পর্যায়ের নয়। বরং সাহাবায়ে কিরামের স্তরে হাদীসটির মর্যাদা খবরে ওয়াহেদের বেশী নয়। এমনকি কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে গরীব ফরদ বলেও দাবী করেছেন। ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া অপর কোনো সাহাবা হাদীসটি বর্ণনা করেননি। হাফেজ ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঃ وقد توهم بعضهم انه غريب فرد অর্থাৎ কতিপয় মুহাদ্দিস হাদীসটিকে 'গরীব ফরদ' বলে ধারণা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যদিও মুহাদ্দিসগণের এ দাবী এভাবে খণ্ডন করেছেন ঃ

www.pathagar.com

وليس كذالك فقدرواه مع فاطمة بنت قيس ابو هريرة وعائشة وجابر -

অর্থাৎ হাদীসটি গরীব ফরদ নয়। কেননা, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।" -(ফতহুল বারী খ ঃ ১৩ পৃঃ ২৮০) কিন্তু তবুও হাদীসটি ২/৪জন সাহাবীর রেওয়ায়েত দ্বারা মুতাওয়াতের হতে পারে না। বরং খবরে ওয়াহেদই থেকে যায়। আর খবরে ওয়াহেদ দ্বারা ইসলামী আকীদার বুনিয়াদ রচিত হয় না। দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়ার ব্যাপারে ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসটিকে অকাট্য প্রমাণ বলে স্বীকার করলেও এবং "অন্তরীণ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়া" নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হলেও এটি কোনোক্রমেই আকীদার মাসয়ালা হতে পারে না। কারণ, আকীদাগত বিষয় প্রতিষ্ঠার জন্যে কুরআনের নিশ্চিত প্রমাণ ভিত্তিক আয়াতের প্রয়োজন অথবা মুতওয়াতের হাদীস। অথচ এখানে এমন কোনো দলীল নেই।

দাজ্জালের আবির্ভাবের স্থান ও কাল

দাজ্জালের আবির্ভাবস্থল সম্পর্কে যেসব হাদীস আছে তার প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টি ফিরালে মানুষ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, দাজ্জালের প্রকাশ পূর্বদিক থেকে ঘটবে—প্রকাশস্থান সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধু এতোটুকুই জ্ঞাত করা হয়েছিলো। অন্য কোনো নির্দিষ্ট জায়গা সম্পর্কে নবীকে অহীর মাধ্যমে আর কিছু জানানো হয়নি। এ কারণেই পূর্বদিক থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়ার কথা নবী আলাইহিস্ সালাম দৃঢ়তার সাথে বলতেন। তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃঢ়তার সাথে বলেছেন ঃ لابل من قبل المشرق মুহাদ্দিসগণও সাধারণভাবে স্বীকার করেছেন যে, দাজ্জালের আবির্ভাব স্থান সম্পর্কে দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা সহকারে যে কথা বলা সম্ভব তাহলো 'দাজ্জাল' পূর্বদিক থেকে বের হবে। যদিও কারো কারো মতে দিক নির্দিষ্ট করা নিশ্চিত ধারণার ভিত্তিতে হয়েছে, অহীর ভিত্তিতে নয়। বিষয়টি মিরকাত গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহে যেসব জায়গার কথা বলা হয়েছে—যেমন মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে দাজ্জাল ইস্পাহান থেকে ৭০ হাজার ইহুদীর সমভিব্যাহারে আত্মপ্রকাশ করবে বলে বলা হয়েছে অথবা ইমাম আহমদ এবং হাকেমের বর্ণনা মতে, (আবু বকরের মাধ্যমে) দাজ্জাল খোরাসান থেকে বের হবে—সেগুলোর নির্দিষ্টকরণ অহী ভিত্তিক নয় বরং নবীর ধারণা

www.pathagar.com

এবং আশংকা ভিত্তিক। তিনি ধারণা করেছেন সম্ভবত এসব রেওয়ায়েতের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো একটিকে নিশ্চিয়তা ও দৃঢ়তা সহকারে নির্ধারণ করেননি। কেবল পূর্বদিক সম্পর্কেই তারা দৃঢ় ও নিশ্চিত মত প্রকাশ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দাজ্জাল সম্পর্কিত অনুসন্ধান যোগ্য বিষয়াবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

واما من اين يخرج ؟ فمن قبل المشرق جزما - ثم جاء فى رواية انه يخرج من خراسان - اخرج ذالك احمد رحـ والحاكم من حديث ابى بكر رضـ وفى اخرى انه يخرج من اصبهان -

"দাজ্জাল কোথায় আত্মপ্রকাশ করবে? দাজ্জাল সম্পর্কে এ বিষয়ে দৃঢ়তা ও নিশ্চিয়তা সহ শুধু এতটুকুই বলা যেতে পার যে, প্রাচ্যদিক থেকে তার প্রকাশ ঘটবে। আহমদ ও হাকেম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের সূত্র ধরে বলেন, দাজ্জাল খোরাসান থেকে বের হবে। মুসলিমের একটি রেওয়াতে আছে দাজ্জালের আবির্ভাব ইস্পাহান থেকে ঘটবে।"

যাহোক, হাদীসে যেসব নির্দিষ্ট জায়গার কথা উল্লেখ আছে সেগুলো অহীর ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট করা হয়নি। এসব জায়গা সম্পর্কে নবীকে অহীর মাধ্যমে কোনো নিশ্চিত ইলম দেয়া হয়নি। বরং নিশ্চিত ধারণা ও আশংকার উপর ভিত্তি করেই এসব স্থানের কথা উল্লেখিত হয়েছে। অতএব, কোনো নির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কে এ আকীদা রাখা যে, "দাজ্জাল এ স্থান থেকে অবশ্যই আত্মপ্রকাশ করবে"—কখনো ইসলামী আকীদা হতে পারে না।

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ কাল সম্পর্কেও ঠিক একই অবস্থা। এ সম্পর্কেও যে কথা দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা সহ বলা যায় তা শুধু এই যে, "কিয়ামতের আগে কোনো নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে।" এছাড়া কোনো নির্দিষ্ট সময় বা দিনক্ষণ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করা হয়নি এবং নবী আলাইহিস সালাম নিশ্চিয়তা ও দৃঢ়তাসহ কখনো এমন কথা বলেননি যে, দাজ্জাল অমুক নির্ধারিত সময়ে আত্মপ্রকাশ করবে।" কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে কেবল একথাটুকু তিনি অহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছেন। এ অবগতিও তার প্রথমে হয়নি বরং শেষে হয়েছে। এ কারণেই তিনি প্রথমত নিজের যামানায়ই দাজ্জালের আবির্ভাবের আশংকা প্রকাশ করলেন। আবু দাউদের নিম্ন বর্ণিত রেওয়ায়েতে এর উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ

عن النواس رضـ بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

الدجال فقال ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرأ حجيج نفسه والله خليفتى على كل مسلم۔

"নাওয়াস বিন সাময়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার দাজ্জালের আলোচনা প্রসংগে বললেন যদি সে আমার আমলে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে আমি নিজেই তোমাদের পক্ষ থেকে মুকাবিলা করবো। কিন্তু যদি তার আবির্ভাব আমার পরে ঘটে তাহলে প্রত্যেককে নিজের পক্ষ থেকে তার মুকাবিলা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালাই আমার পক্ষ থেকে প্রতিটি মুসলমানের রক্ষক ও আশ্রয়দানকারী।"

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ان يخرج وانا فيكم ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

انه محمول على ان ذالك كان قبل ان يتبين له وقت خروجه وعلاماته فكان يجوز ان يخرج فى حياته صلى الله عليه وسلم ثم بين له وقت خروجه فاخبربه فذالك تجتمع الاخبار۔

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় দাজ্জালের আবির্ভাব কাল এবং তার আলামতসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন তখন বলেছিলেন ان يخرج وانا فيكم 'আমার আমলে যদি তার আত্মপ্রকাশ ঘটে।' তার আমলে দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া তিনি তখন সম্ভবপর মনে করেছিলেন। পরে অহীর মাধ্যমে যখন তিনি আবির্ভাব কাল সম্পর্কে অবহিত হলেন তখন সে সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। এ ব্যাখ্যা দ্বারা সমস্ত হাদীস পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।"

ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেলো যে, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশকাল সম্পর্কে প্রথম যামানায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অহীর মাধ্যমে কোনো কিছু জানানো হয়নি। এ সময়ে আত্মপ্রকাশকাল সম্পর্কে যা কিছু বলেছিলেন তা অহীর ওপর ভিত্তি করে বলেননি। বরং ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা করে বলেছিলেন। ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم একথাটিও ধারণা ও কল্পনা প্রসূত। তারপর অহীর মাধ্যমে দাজ্জালের আবির্ভাব সময় সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালাম অবগত হয়ে উম্মতকে তা জানিয়ে দেন।

তবে মনে রাখতে হবে যে, অহীর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়নি। রেওয়াতে এবং হাদীস দ্বারা এর কোনো হদীস

www.pathagar.com

পাওয়া যায় না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ বিষয় কোনো খবর দেননি। তাঁকে শুধু এতোটুকুই জানানো হয়েছিলো যে, "দাজ্জাল তাঁর যামানায় বের হবে না। বরং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তার প্রকাশ ঘটবে।" সুতরাং তাঁর আমলেই দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়ার আশংকা করেছিলেন, তিনি দাজ্জালের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে অবগত হওয়ার আগে।

দাজ্জাল সম্পর্কে উপরে যে আলোচনা করা হয়েছে নীচে তার সারমর্ম পেশ করা হচ্ছে যাতে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দাজ্জাল সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ পেশ করেছেন সেগুলো ঐ নিরিখে পূর্ববর্তী আলেমদের অভিমত-সমূহের কোনো অভিমত অনুকূলে কিংবা প্রতিকূলে তা আমরা অগ্রসর হয়ে দেখতে পারবো। এবং বর্তমান যুগের কতিপয় আলেম মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সেগুলো কতটুকু সঠিক ও যথাযথ তা দেখতে পারবো।

বিগত আলোচনার সারমর্ম

এ বিষয় সম্পর্কে আগে যে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে যেসব বিষয় সুস্পষ্টভাবে জানা যায় সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(ক) রেওয়ায়েত এবং সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা দাজ্জাল সম্পর্কে যা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত এবং যে বিষয়ে গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত একমত, ইসলামী আকীদার মর্যাদা রয়েছে এবং ইলমে অহীর উপর প্রতিষ্ঠিত বলেও মনে হয় এমন বস্তু চারটি। এক—দাজ্জালের অস্তিত্ব, দুই—কিয়ামতের কাছাকাছি কোনো সময়ে তার আত্মপ্রকাশ হওয়া, তিন—সহীহ হাদীসে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া, চার—ঈসা আলাইহিস সালামের হাতে তার নিহত হওয়া।

(খ) উপরে বর্ণিত চারটি বস্তু সম্পর্কে যে সহীহ হাদীস রয়েছে তার মধ্যে এমন কোনো মৌলিক মতবিরোধ বা বৈপরীত্য নেই যার অপনোদন অতি সহজ নয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চারটি বিষয়ে অহীর মাধ্যমেই জ্ঞাত হয়েছিলেন। ধারণা বা কল্পনার ওপর ভিত্তি করে তিনি এ চারটি বস্তুর খবর দেননি।

(গ) রেওয়ায়েত ও সহীহ হাদীস দ্বারা উল্লেখিত চারটি বিষয় ছাড়া দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব, তার আবির্ভাবস্থান ও কাল সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত ও অকাট্য সিদ্ধান্ত জানা যায় না। দাজ্জালে আকবার বিশেষভাবে ইবনে সাইয়াদ হবে, না দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তি হবে এবং সে কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে আবির্ভূত

www.pathagar.com

হবে এসব কথাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। দাজ্জাল পূর্বদিক থেকে বের হবে, শুধু এতটুকু কথাই নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে। পরন্তু তার আত্মপ্রকাশ কাল সম্পর্কেও কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত করা হয়নি। এ কারণেই বিষয়গুলোর কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে কোনো যুগের আলেমগণ ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। বরং প্রত্যেক যুগেই তাদের মধ্যে এ বিষয়ে অনৈক্য ছিলো। সুতরাং দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব, তার আবির্ভাব স্থান ও কাল নির্দিষ্টকরণ ইসলামী আকায়েদের মধ্যে পরিগণিত নয়।

(ঘ) এ বিষয়গুলো সম্পর্কে যতগুলো হাদীস ও রেওয়ায়েত আছে সেগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয় এবং নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। এসব বিষয়াবলীর কোনো একটির ওপর সাহাবায়ে কিরামগণের যামানায় ইজমা প্রতিষ্ঠা হয়নি যা আমাদের কাছ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পৌছতে পারে। ইসলামী আকায়েদের বুনিয়াদ অকাট্য ও নিশ্চিত হয়ে থাকে, ধারণা ও কল্পনা প্রসূত নয়। সুতরাং এ সিদ্ধান্তে স্বতই উপনীত হওয়া যায় যে, এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীগুলো ইলমে অহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না বরং ছিলো ধারণা ও সন্দেহের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তারপর উপরোল্লেখিত সারকথার চারটি বিষয়ের আলোকের দাজ্জাল সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর পেশকৃত চিন্তাধারা ভুল কি নির্ভুল তা আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং আলেমদের আরোপিত অভিযোগগুলোর কোনো যথার্থ মূল্য আছে কিনা তাও নিরিক্ষা করতে হবে। নিম্নে এ দু'টি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ করছি।

মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতবাদ

জনৈক ব্যক্তি দাজ্জাল সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীকে এ প্রশ্ন করেন ঃ

"তরজুমানুল কুরআনে কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলো যে, এক চোখ বিশিষ্ট দাজ্জাল কোথায় অবরুদ্ধ আছে সবার জানা আছে। তাহলে সে জায়গাটি কোথায় ? আজকের বিশ্বের প্রতি জায়গায় মানুষ অনুসন্ধান চালিয়েছে। তারপরও কানা দাজ্জালের সন্ধান মিলছে না কেন ?

মাওলানা এ প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ

'এক চোখ বিশিষ্ট দাজ্জাল ইত্যাদি তো গল্প বিশেষ যার কোনো শরীয়তী মর্যদা নেই।'

কিন্তু আমার জানামতে কমপক্ষে ত্রিশটি রেওয়ায়েতে দাজ্জালের কথা উল্লেখ আছে। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, শারহে সুন্নাহ এবং

বায়হাকীর নিরীক্ষায় দাজ্জাল প্রসংগটিকে সত্যায়ন করা সম্ভব। তাহলে আপনার উপরোক্ত জবাবটি কিসের ওপর ভিত্তি করে প্রদান করেছেন?

মাওলানা এ প্রশ্নের নিম্নলিখিত জবাব দেন ঃ

জবাব ঃ আমি যে জিনিসটিকে গল্প বলেছি সেটা হলো দাজ্জালের কোথাও অবরুদ্ধ হয়ে থাকার ধারণা। যে বিরাট বিপর্যয় ও ফেতনা সৃষ্টিকারী দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা হাদীসসমূহে উল্লেখ আছে আমি তার অস্তিত্ব স্বীকার করি। আমি সবসময় নামাযে সেই দোয়া মাসূরা পড়ি যাতে অন্যান্য বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করার সাথে সাথে মসিহে দাজ্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়টিও আছে। দোয়ার সেই অংশটি হলো ঃ اعوذبك من فتنة المسيح الدجال।-(রাসায়েল ও মাসায়েল, প্রথম খণ্ড)

যে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটা কিয়ামতের একটি আলামত এবং হাদীসসমূহে যার আগমনের কথা বলা হয়েছে মাওলানা তার এ বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি একথা শুধু স্বীকার করি তা নয় বরং কার্যত এ বিষয়ে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসারীও বটে। নবী আইহিস সালামও আশ্রয় প্রার্থনামূলক অন্যান্য দোয়ায়ে মাসূরার মতো এ দোয়াটি নামাযে পড়তেন। আমিও এ দোয়াটি পড়ে থাকি। اعوذبك من فتنة المسيح الدجال শরীয়াতের দৃষ্টিতে দাজ্জালের অবস্থা, এ সম্পর্কে ইসলামী আকায়েদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে গিয়ে তিনি আরো লিখেছেন ঃ

দাজ্জাল সম্পর্কে যতগুলো হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে সেগুলোর প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টি দিলে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয় তাহলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী আলাইহিস সালামকে এ ব্যাপারে যে ইলম দেয়া হয়েছে তার পরিধি শুধু এতটুকু যে, একটি বিরাট দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তার অমুক অমুক বৈশিষ্ট্য থাকবে এবং সে অমুক বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়সমূহের ধারক হবে।

এ বাক্যে মাওলানা দাজ্জাল সম্পর্কে যেসব বিষয়ের অবতারণা করেছেন তা হুবহু তাই, যে বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ঐকমত্য পোষণ করেছেন। দাজ্জাল প্রসংগে আলোচনায় প্রথমদিকে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাই কাজী আয়াজের উক্তি উদ্ধৃতি করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমতের যে প্রতিধ্বনি করেছেন তাতে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা হুবহু এ বিষয়গুলোই যা মাওলানা মওদূদী

www.pathagar.com

রাহমাতুল্লাহ আলাইহির এখানে দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। আলোচনার শুরুতেই একবার যে কথা উদ্বৃত করা হয়েছে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে এখানে সে কথার পুনরুল্লেখ করা হলো ঃ

قال القاضى عياض فى هذه الاحاديث حجة لاهل السنة فى صحة وجود الدجال وانه شخص معين يبتلى اللّٰه به العباد ويقدره على اشياء كاحياء الميت الذى يقتله وظهور الخصب والانهار والجنة والنار وغيرها ... وقد خالف فى ذالك بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية فانكروا وجود الدجال وردوا الاحاديث الصحاح وذهب طوائف منهم كالجبائى الى انه صحيح الوجود لكن كل الذى معه فخاريق وخيالات لاحقيقة لها ـ

"কাজী আয়াজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঃ এসব হাদীস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দৃষ্টিতে দাজ্জালের অস্তিত্ব সঠিক হওয়ার জন্যে দলীল এবং দাজ্জাল একজন নির্দিষ্ট লোক হবে যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন। হত্যা করে পুনর্জীবিত করা, রিযিকের প্রাচুর্য, বেহেশত, দোযখ, নহর এবং অন্যান্য কতিপয় জিনিসের ওপর তাকে ক্ষমতাও দেয়া হবে। কোনো কোনো খারেজী, মুতাযেলী এবং জাহমীয়া দাজ্জালের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে থাকে। আর সহীহ হাদীসগুলোও তারা রদ করে দেয়। জুবায়ী ও অপরাপর বাতিল সম্প্রদায় দাজ্জালের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তার সাথে যে বস্তুগুলো থাকবে তা অস্বীকার করে। এসব জিনিস তারা অস্বাভাবিক ও স্বকপোল কল্পিত বলে মনে করে এবং তাদের কাছে এগুলোর কোনো গুরুত্বই নেই।"

এ বাক্যে দাজ্জাল সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং বাতিল ফিরকাগুলোর মধ্যে বিতর্কিত যেসব বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে তাতে দাজ্জালের অস্তিত্ব, তার আত্মপ্রকাশ এবং এমন সব বৈশিষ্ট্য ও আলামত প্রসংগে যা দাজ্জালের জন্যে সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত। আহলে সুন্নাতের মতে এসব জিনিস দাজ্জালের জন্যে স্বীকৃত ও সঠিক। বাতিল ফিরকাগুলোর মতে এসব দাজ্জালের জন্যে নির্ধারিত নয়। এ সমস্ত বিষয় মাওলানার উল্লেখিত বাক্যের মধ্যে দাজ্জালের স্বীকৃতি রয়েছে।

তারপর অধিক ব্যাখ্যার জন্য দাজ্জালের আবির্ভাবস্থল ও কাল এবং তার ব্যক্তিত্বের বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে মাওলানা যা লিখেছেন তাতে তার ব্যবহৃত কোনো কোনো শব্দ ও বাক্যাংশ দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

www.pathagar.com

শানে বে-আদবী ও অসৌজন্য প্রকাশ পেয়েছে বলে জনৈক ব্যক্তি অভিযোগ করলে মাওলানা তার জবাবে লিখেছেন ঃ "আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কোনো মুসলমান কখনো কি তাঁর দরবারে বে-আদবী করার ধারণা পর্যন্ত করতে পারে ? আর যদি করেই বসে তাহলে মুহূর্তের জন্যেও সে-কি ঈমানের গণ্ডির মধ্যে থাকতে পারে ? আমার সম্পর্কে আমার কোনো দ্বীনি ভাইয়ের এ কু-ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, আমি কখনো এ ধরনের কুফরীতে লিপ্ত হতে পারি। তবে এটা সম্ভব যে, কোনো মাসয়ালার বিবরণের মধ্যে একটি ব্যাখ্যা পদ্ধতি আমার মতে শরীয়াত ও আদবের সীমার মধ্যেই অবস্থিত কিন্তু অপর কেউ সেটাকে সীমাতিক্রম বলে মনে করে। আমি উক্ত প্রবন্ধে যাকিছু লিখেছি তা শরীয়াত ও আদবের গণ্ডি বহির্ভূত নয়—একথা জেনেশুনে পূর্ণ দায়িত্ব বোধসহ লিখেছি। আমার বন্ধুর সতর্ক করে দেয়ার পরেও চিন্তা করে আজ পর্যন্ত সে লেখার মাধ্যমে সীমাতিক্রম আমি অনুধাবন করতে পারিনি। এতদসত্ত্বেও কোনো লোক এখানে সীমা লংঘিত হয়েছে বলে ধারণা করতে পারে একথা জেনে আমি আমার লিখিত বাক্যগুলো পরিবর্তন করে দেয়া যথার্থ মনে করি যাতে ভুল বুঝার অবকাশই আর না থাকে।"–(তরজুমানুল কুরআন, জমাদিউল উলা ১৩৭৪)

তারপর মাওলানা রাসায়েল ও মাসায়েলের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের অধিকাংশ অংশ বদলিয়ে দেন। দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন বাক্য নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশিত হয় ঃ

"দাজ্জাল সম্পর্কে যতগুলো হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তার বিষয়বস্তুর প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টি দিলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা শুধু এতটুকু যে, এক বড় দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, তার এসব বৈশিষ্ট্য থাকবে, সে কবে কোথায় প্রকাশ পাবে অথবা তার জীবদ্দশায় জন্ম হয়েছে নাকি তাঁর ইনতিকালের পর জন্ম গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এসব বিষয়ে নবী আলাইহিস সালামের হাদীসে যেসব নানা রকম কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা স্বতঃই প্রকাশ করে এবং নবী আলাইহিস সালামের বর্ণনা রীতি থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর এসব বাণী অহী ভিত্তিক নয় বরং ধারণা ও অনুমান ভিত্তিক। তিনি কখনো এরূপ ধারণা পোষণ করেছেন যে, খোরাসান থেকে বের হবে। কখনো বলেছেন ইস্পাহান থেকে, আবার কখনো বলেছেন সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী এলাকা থেকে। ইবনে সাইয়াদ নামে যে ইহুদী শিশু মদীনায় (সম্ভবত ২য় কিংবা ৩য় হিঃ) জন্মগ্রহণ করে তিনি এক সময় সে শিশুর দাজ্জাল হওয়ার

www.pathagar.com

আশংকা করতেন। এ বিষয়ে নবীর সর্বশেষ বর্ণনা হলো ৯ম হিজরী সনে ফিলিস্তিনের খৃষ্টান পাদ্রী (তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহ আনহু) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে এ কাহিনী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনালেন যে, একবার তিনি সমুদ্র ভ্রমণে (সম্ভবত রোম বা আরব সাগর) বের হয়ে একটি অচেনা দ্বীপে উপনীত হন। সেখানে তিনি একজন আজব লোকের সাক্ষাত পান। লোকটি তাঁকে বললো যে, সে দাজ্জাল। কাহিনী শুনে নবী আলাইহিস সালাম তার কথা ভ্রান্ত বলার কোনো কারণ দেখতে পেলেন না। তবে তিনি এ বর্ণনার প্রেক্ষাপটে রোম অথবা আরব সাগর থেকে দাজ্জালের আবির্ভাবের সন্দেহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু পূর্বদিক থেকে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে বলে ধারণা প্রকাশ করলেন।

এসব ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েতের ওপর যে কেউ সামগ্রিক দৃষ্টি ফিরালে সে যদি ইলমে হাদীস ও দীনের মৌলিক বিষয়ে সামান্যতম ওয়াকিফহাল হয় তাহলে একথা বুঝতে তার কোনো অসুবিধাই হবে না যে, এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীগুলো দু'টি অংশে বিভক্ত ঃ

প্রথম অংশ হলো, দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, সে এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে, এবং এসব ফেতনা সৃষ্টি করবে। এগুলো নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত খবর যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবগত করেছেন। এসব রেওয়ায়েতের কোনোটিই অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে ভিন্নতর নয়।

দ্বিতীয় অংশ হলো, দাজ্জাল কোথায় কখন আত্মপ্রকাশ করবে এবং সে কে ? এ বিষয় সম্বলিত রেওয়ায়েতগুলো যা শুধু পরস্পর বিরোধী তাই নয় বরং অধিকাংশ রেওয়ায়েতে সংশয়, সন্দেহ ও ধারণা প্রসূত হওয়ার প্রমাণ দেয়ার মতো শব্দাবলীরও সমাহার ঘটেছে। যেমন—ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে রসূলের একথা বলা যে, যদি এ ব্যক্তিই দাজ্জাল হয় তাহলে তার হত্যাকারী তুমি নও। আর যদি সে দাজ্জাল না হয় তাহলে একজন চুক্তিবদ্ধ লোককে হত্যা করার কোনো অধিকার তোমার নেই।" অথবা যেমন অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে। যদি সে আমার জীবদ্দশায় আবির্ভূত হয় তাহলে আমি নিজেই প্রমাণসহ তার মুকাবিলা করবো। অন্যথায় আমার ইনতিকালের পরে আমার রবই সকল মু'মিনের রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী।

দ্বিতীয় অংশের বিষয়গুলোর মৌলিক ও দীনি মর্যাদা প্রথম অংশে উল্লেখিত বিষয়গুলোর মতো হতে পারে না। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় অংশের সমস্ত বিবরণগুলো

www.pathagar.com

ইসলামী আকায়েদের মধ্যে গণ্য করবে সে ভুল করবে। বরং এগুলো প্রতিটি শাখা-প্রশাখা সঠিক ও সত্য হওয়ার দাবী করাও ঠিক নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়ার আশংকা করেছিলেন এবং হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দাজ্জাল হওয়ার শপথ পর্যন্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে মুসলমান হয়ে যায় এবং মক্কা ও মদীনায় অবস্থানও করে। সে ইসলাম গ্রহণ করার পর মারা যায় এবং মুসলমানগণ তার জানাযা পড়েন। তারপরও আজ পর্যন্ত তার দাজ্জাল হওয়ার সন্দেহ কিভাবে অবশিষ্ট থাকতে পারে ? তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় প্রায় সঠিক মনে করেছিলেন। কিন্তু যে লোকটিকে তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বীপে অন্তরীণ অবস্থায় দেখলেন সে লোকটি দীর্ঘ সাড়ে তেরশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আত্মপ্রকাশ না করা কি একথা প্রমাণিত করার জন্যে যথেষ্ট নয় যে, সে নিজের দাজ্জাল হওয়ার যে কথা তামীমে দারীকে বলেছিলো তা সত্য ও সঠিক ছিলো না ? দাজ্জালের আবির্ভাব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় হবে কি তাঁর ইনতিকালের পর কোনো নিকটবর্তী সময়ে হবে এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সন্দিহান। কিন্তু এটা কি সত্য নয় যে, সাড়ে তেরশ বছরের দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দাজ্জালের আবির্ভাব হয়নি। এখন এসব বিষয়কে এমনভাবে উদ্বৃত ও বর্ণনা করা যেন তা ইসলামী আকায়েদের অন্তর্ভুক্ত—. ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব নয় এবং এটাকে হাদীসেরও সঠিক অর্থ বলা যায় না। আমি আগেই বলেছি, এ ধরনের ব্যাপারসমূহে কোনো বিষয় যদি নবীর অনুমান, ধারণা অথবা সন্দেহ অনুযায়ী প্রকাশ না পায় তাহলে তাতে নবুয়াতের মর্যাদা আদৌ ক্ষুণ্ন হয় না। তাতে ইসমতে আম্বিয়ার আকায়েদের ওপরও কোনো বিতর্কের সৃষ্টি হয় না। এ প্রকৃতির জিনিসের ওপর ঈমান আনা শরীয়াত আমদের ওপর অপরিহার্য করেনি। এ মৌলিক সত্যকে খেজুর ফুলের পরাগায়ন সম্বলিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন।”-(রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ পৃঃ ৪৭-৫০)

মাওলানা তাঁর এ বিস্তারিত জবাবে দাজ্জাল সম্পর্কে তার নিজের যে মত পেশ করেছেন অথবা বিষয়টির যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পেশ করেছেন তাতে গোটা বিষয়টির সমস্ত দিক ও বিভাগের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে যদি বলা হয় যে, মাওলানা সাগরকে পেয়ালায় আবদ্ধ করে দিয়েছেন তাহলেও তা অত্যুক্তি হবে না। এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে কেউ একমত হোক বা না হোক একথা সত্য যে, আগের আলোচনায় দাজ্জাল সম্পর্কে প্রাচীনকালের আলেমদের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে তার আলোকে মাওলানা মওদূদীর দাজ্জাল সম্পর্কিত এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিচার করলে তা শরীয়াতের

www.pathagar.com

মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক অথবা দীনের স্বীকৃত নীতিমালার পরিপন্থী অথবা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এবং উলামায়ে সালফ এবং হাদীসের ইমামও দাজ্জাল সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগীর থেকে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দৃষ্টিভংগী ভিন্নতর এমন কথা একজন আল্লাহভীরু ও বাস্তববাদী লোক কখনো বলতে সাহস করবেন না। বিগত আলোচনায় দাজ্জাল সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলেম ও হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণের যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে তন্মধ্যে চতুর্থ অভিমতটি দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অধিকতর সহীহ। দাজ্জাল সম্পর্কে এ মযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো—দাজ্জাল সম্পর্কিত যতো হাদীস হাদীসগ্রন্থসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে নিশ্চিতভাবে যে কথাটি জানা যায়, তা শুধু এতটুকু যে, দাজ্জাল কিয়ামতের সময়ে প্রকাশ পাবে এবং তার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য থাকবে এবং সে এসব অভ্যাসের অধিকারী হবে। লোকটি কে হবে, কোথায় কখন আত্মপ্রকাশ করবে এসব কথা হাদীসের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং তা ইসলামী আকায়েদের মধ্যেও গণ্য হতে পারবে না। কারণ, ইসলামী আকায়েদের বুনিয়াদ হলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত অহী। আর উল্লেখিত তিনটি বিষয় অহীর মাধ্যমে প্রমাণিত নয়।

তাছাড়া এসব আলোচনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়েছিলো যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে যেসব ব্যক্তি ও স্থানের কথার উল্লেখ আছে তা অহীর ওপর ভিত্তি করে নয়, বরঞ্চ নবী আলাইহিস সালামের ব্যক্তিগত ধারণা ও সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে ছিলো। অন্যথায় এসব রেওয়ায়েতে অসামঞ্জস্যশীল বৈপরীত্য মতবিরোধের সৃষ্টি হতো না। আর তাতে বর্ণিত আকীদাগত বিষয়ে আলেমগণ ও হাদীসের ইমামগণ এতোবেশী মতপার্থক্য করতেন না। কেননা অহীর জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত বাণীসমূহের অসামঞ্জস্যপূর্ণ বৈপরীত্য সৃষ্টি হতে পারে না। এ ধরনের আকীদাগত বিষয়ের বর্ণনায় আলেমদের মধ্যে এতো বেশী মতপার্থক্যও হতে পারে না। যেমনটি হয়েছে দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব, তার আবির্ভাবস্থান ও কাল সম্পর্কে।

এ সবগুলো বিষয়ই মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির এ বিস্তারিত জবাবের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও ন্যায়ের পতাকাবাহী ধর্মের ঠিকাদার এবং তাকওয়া ও পরহেজগারীর ধ্বজাধারীরা মাওলানা মওদূদীকে ছাড়তে প্রস্তুত নয়। তারা বলে বেড়ায় যে, দাজ্জাল সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর দৃষ্টিভংগী ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় বরং সাংঘর্ষিক।

www.pathagar.com

কাজী মাজহার হুসাইন সাহেবের প্রথম আপত্তি

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেবের একজন এজাজত প্রাপ্ত খলীফা দাজ্জাল সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দৃষ্টিভংগীর ওপর যেসব আপত্তি উথাপন করেছেন সেগুলো নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

মুহতারাম মাওলানা কাজী মাযহার হুসাইন সাহেবের লিখিত বই (মওদূদী জামায়াত কে আকায়েদ ওয়া নাযরিয়াত পর এক তানকীদী নযর) এর মধ্যে মাওলানার উপরোল্লেখিত বাক্যের কিছু অংশ পেশ করার পর তার সারমর্ম নিম্নলিখিত চারটি বিষয় আকারে সাজিয়ে এভাবে উপস্থাপন করেছেন ঃ

যাহোক উল্লেখিত উদ্বৃতিসমূহে মওদূদী সাহেব নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো স্পষ্ট করে দিয়েছেন ঃ

এক ঃ দাজ্জাল সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিস্তারিত ইলম ছিলো না যে, সে কোথায় এবং কখন আত্মপ্রকাশ করবে।

দুই ঃ এ আশংকাও ছিলো যে, সে হয়তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই আত্মপ্রকাশ করবে।

তিন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব কথা কেবল অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলেছিলেন, অহীর ওপর ভিত্তি করে নয়।

চার ঃ সাড়ে তেরশ বছরের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, দাজ্জাল কোথায় অবরুদ্ধ আছে অথবা নবীর জীবদ্দশায় আত্মপ্রকাশ করবে কিংবা তাঁর পরবর্তী কোনো নিকট ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবে। দাজ্জাল সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব সংশয়পূর্ণ বাণী সঠিক ছিলো না।

তারপর মুহতারাম মাওলানা কাজী সাহেব এ চারটি বিষয় এভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন ঃ

"দাজ্জাল সম্পর্কে নবীর বাণীসমূহ ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পৃক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনি ব্যাপারসমূহে শুধুমাত্র অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন এমন কথা রিসালাতের মর্যাদার সাথে মানানসই নয়। নবীগণ ভবিষ্যত সম্পর্কে দায়িত্বহীন কোনো কথাবার্তা বলেন না। নবীগণ দীনের ব্যাপারে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অনুমানের ওপর চলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্দেহপূর্ণ কোনো ভবিষ্যদ্বাণী

www.pathagar.com

করেননি। বরং ভবিষ্যত সম্পর্কে যাকিছু বলেছেন তা অহীর ওপর ভিত্তি করেই বলেছেন।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوحٰى

অতএব, দাজ্জালের আবির্ভাবের ব্যাপারে খোদ নবী আলাইহিস সালামের সন্দেহ ছিলো মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একথা রিসালাতের পদমর্যাদার ওপর এক নগ্ন হামলা বৈকি !–(তানকিদী নযর পৃঃ ৮৮)

ব্যাখ্যা

দাজ্জাল সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালামের সমস্ত বাণী ভবিষ্যদ্বাণী বলে দাবী করা একেবারেই ভুল। কেবল মাত্র দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া এবং তার বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কিত বাণীগুলোই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পৃক্ত। আর এসব বাণী মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতেও অহীর ওপর ভিত্তি করে বর্ণিত হয়েছে। একথা তিনি পূর্ববর্তী বাক্যে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেসব বাণীকে মাওলানা মওদূদী সাহেব ধারণামূলক বলে আখ্যায়িত করেছেন সেগুলো দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব তার আবির্ভাব স্থান ও কাল সম্পর্কিত। এগুলোও অহীর ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে বলে দাবী করা শুধু ভুলই নয় বরং হাস্যস্পদও বটে। পরিশেষে চিন্তার বিষয় হলো আপনাদের মতে এসব বাণী যখন অহী ভিত্তিক হয় তখন দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব এবং তার আবির্ভাব স্থান ও কাল সম্পর্কে এমন অসংগতিপূর্ণ মতানৈক্য ও বৈপরীত্য সৃষ্টি হলো কেমন করে ? কেননা, এর কোনোটাতে দাজ্জলের আবির্ভাবস্থল খোরাসান, কোনোটাতে ইস্পাহান আবার কোনোটাতে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যস্থল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে নির্দিষ্ট জায়গার পরিবর্তে শুধু পূর্বদিকের কথা বলা হয়েছে।

যেমন তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে স্পষ্টত বলা হয়েছে ঃ لابل من قبل المشرق অহীয়ে ইলাহীতে সংগতি রক্ষার অনুপযোগী বৈপরীত্য বিদ্যমান থাকতে পারে কি ? অহীয়ে ইলাহীতে মতপার্থক্য থাকতে পারে না। বরঞ্চ অন্যান্য কালাম বা বাণীতে বৈপরীত্য ও অসংগতি থাকতে পারে। এটাই কুরআনের ফায়সালা। কুরআনের ঘোষণা হলো ঃ

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا ـ

"আর যদি এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে হতো তাহলে তোমরা এর মধ্যে অবশ্যই অনেক মতভেদ ও মতপার্থক্য দেখতে পেতে।"

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিগত সমস্ত নবী দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে নিজ নিজ কাওমকে ভয় প্রদর্শন করেছেন। مامن نبى الا وقد انذر قومه الدجال। দাজ্জাল সম্পর্কে নবীদের ভীতিপ্রদ বাণীগুলো অহীর ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিলো বলে আপনি বলতে পারেন কি ? দাজ্জাল আমাদের নবীর উম্মতদের মধ্যেই আবির্ভাব হবে এমন ধরনের কোনো অহী আল্লাহর কাছ থেকে নবীগণ পেয়েছিলেন কি ? দাজ্জাল বিশেষ করে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যেই প্রকাশ পাবে এবং বিগত নবীদের যুগ দাজ্জাল প্রকাশ পাবার যুগ ছিলো না—এটা যখন প্রকৃত ঘটনা তখন কিসের ওপর ভিত্তি করে আপনি সমগ্র নবী আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এ দাবী করেন যে, নবীদের সমস্ত বাণী অহীর ওপর ভিত্তি করে ?

তৃতীয়, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ কাল সম্পর্কিত নবীর বাণীগুলোর বর্ণনাভংগী স্বতঃই বলছে যে, বাণীগুলো অহী ভিত্তিক নয় বরং সংশয়পূর্ণ ও ধারণামূলক। আমাদের এ দাবীর সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য দলীল হলো রসূলের এ বাণী ঃ

ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجة وان يخرج ولست فيكم فامر حجيج نفسه

আরবী পরিভাষার সাথে সামান্য পরিচয় আছে এমন লোকটিও সহজেই বুঝতে পারবে যে, বাণীটি সংশয় ও সন্দেহের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা, আরবী পরিভাষায় ان শব্দটি সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করার জন্য এবং দ্বিধা-সন্দেহের ক্ষেত্রেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তারপরও সুস্থ মস্তিষ্ক একে কিভাবে বরদাশত করবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব কাল সম্পর্কিত নবীর বাণীগুলো ভবিষ্যদ্বাণী ধরনের। আর এগুলোর ভিত্তি হলো ইলমে অহী ? নবীগণেরও কি নিজেদের অহী সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় থাকতে পারে ? আপনি স্বীকার করুন কিংবা না করুন, এটা বাস্তব সত্য যে, ان يخرج وانا فيكم এ ব্যাখ্যাংশকে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতো হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীও সংশয় ও সন্দেহ প্রকাশক বলে উল্লেখ করেছেন। তাই এ বাক্যটির ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি লিখেছেন ঃ

انه محمول على ان ذالك كان قبل ان يتبيس له وقت خروجه وعلاماته فكان يجوزان يخرج فى حياته ثم بين له وقت خروجه فاخبربه ١هـ (فتح ج ١٣ ص ٨١)

"নবী আলাইহিস সালামকে দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় ও পরিচয় সম্পর্কে অবহিত করার আগে তিনি একথা বলেছিলেন। তখন তিনি ঠিক মনে করেছিলেন যে, সম্ভবত দাজ্জাল তাঁর জীবদ্দশায়ই আত্মপ্রকাশ করবে। অতএব, যখন তাঁকে আবির্ভাবের সময় সম্পর্কে অবগত করা হলো তখন তিনি তার সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন।"

www.pathagar.com

তবে কি আপনার মতে হাফেজ ইবনে হাজারও রিসালাতের পদমর্যাদার ওপর আঘাত হেনেছেন ? তারপর ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে আপনি কি ফতওয়া জারী করবেন। কেননা তিনিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরোক্ত বাণীর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন ঃ

والظاهر ان النبی صلی اللّه علیه وسلم لم یوح الیه فی امره بشیئ وانما اوحی الیه بصفات الدجال وکان فی ابن صیاد قرائن محتملة فلذالك کان صلی اللّه علیه وسلم لایقطع فی امره بشیئ بل قال لعمر رضـ لاخیرلك فی قتله۔

"প্রকাশ থাকে যে, ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অহীর মাধ্যমে কোনো ইলম দেয়া হয়নি। অহীর মারফতে তাঁকে শুধুমাত্র দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিলো। ইবনে সাইয়াদের মধ্যেও দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো। নবী আলাইহিস সালাম তার দাজ্জাল হওয়া সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত বা নিশ্চিত কথা বলেননি। কেবলমাত্র উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এতটুকু বলেছেন যে, তাঁকে হত্যা করায় তোমার কোনো কল্যাণ নেই।"

এসব বাক্যে কি দাজ্জালের ব্যাপারে নবীর সাথে সংশয় ও সন্দেহ সম্পর্কিত করা হয়নি ? তারপর আপনি ইচ্ছা করলে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতো ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ ও ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে এ ফতওয়া জারী করার ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করতে পারেন যে, তারা উভয়ই রিসালাতের পদমর্যাদার ওপর অবৈধভাবে হামলা করেছেন। সুতরাং মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ ধরনের দাবী উত্থাপন করে রিসালাতের পদমর্যাদার ওপর নগ্ন হামলা করেছে আপনার আরোপিত এ অভিযোগটি মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ওপর একটি অবৈধ ও নগ্ন হামলা।

চতুর্থ, "দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই সন্দিহান ছিলেন"–মাওলানা মওদূদী নবী আলাইহিস সালাম সম্পর্কে উপরোক্ত উক্তি করেছেন বলে মুহতারাম কাজী সাহেব যে দাবী করেছেন তা নিছক মিথ্যা দোষারোপ ও প্রকাশ্য অপবাদ বৈ আর কিছু নয়। যা অন্তত এমন একজন আলেমের কাছ থেকে কস্মিনকালেও আশা করা যায় না। যিনি নিজেকে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একজন অনুমতিপ্রাপ্ত খলীফারূপে প্রকাশ করছেন।

www.pathagar.com

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে তো মাওলানা মওদূদী বলেছেন ঃ নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে অহীর মারফতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন ঃ দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে নবীর সমস্ত বাণী অহীর ওপর ভিত্তিশীল। আর এ কারণেই এগুলো নিয়ে কোনো ঝগড়া বা মতানৈক্যও নেই।

দ্বিতীয় আপত্তি

এরপর মুহতারাম কাজী মাজহার হুসাইন সাহেব তৃতীয় দফায় এভাবে অভিযোগ উত্থাপন করেন ঃ

"দাজ্জালে আকবার সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালাম স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, তাকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতরণ করে লুদ নামক স্থানের প্রবেশ-দ্বারে হত্যা করবেন। আর যেহেতু ঈসা আলাইহিস সালাম কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে অবতরণ করবেন। সুতরাং দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ করার সময়ও সেটাই নির্ধারিত হবে। অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়ার যে সন্দেহ ছিলো তা দূর হয়ে যায়। এমনিভাবে যেসব হাদীসে দাজ্জালের আলামতসমূহের উল্লেখ আছে তা কেবল কিয়ামতের কাছাকাছি সময় সম্পর্কে।"-(তানকীদী নযর পৃঃ ৮৮)

পর্যালোচনা

জনাব, একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে হত্যা করবেন।

কিন্তু নবী আলাইহিস সালামের ان يخرج وانافيكم এ বাণীর মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব তাঁর যামানায় হওয়ার যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা এ দ্বারা কিভাবে দূর হয়? কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটা সম্পর্কিত ইলম তো অধিকাংশের মতে পরে দেয়া হয়েছে, প্রথমে নয়। অন্যথায় ইবনে সাইয়াদের দাজ্জালে আকবার হওয়ার সন্দেহ কিভাবে তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হলো? তাহলে প্রথমাবস্থায় নবীর যামানায় দাজ্জালের আবির্ভাবের সন্দেহ করা নবীর জন্যে কেন নাজায়েয? আর এরই ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجة ؟ মাওলানা মওদূদীর মতো হাফেজ ইবনে হাজারও বলেছেন যে, উপরোক্ত কথা বলার সময় নবী আলাইহিস সালাম তাঁর যামানায় দাজ্জাল প্রকাশ পাওয়ার আশংকা করেছিলেন। তাহলে এ সম্পর্কে জনাব কি মন্তব্য করবেন?

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, "হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে লুদের ফটকে হত্যা করবেন" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম শুধুমাত্র এ ব্যাখ্যা দ্বারা দাজ্জাল তাঁর যামানায় প্রকাশ পাওয়ার সন্দেহ কিভাবে দূর হতে পারে ? কেননা, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ যদিও কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে কিন্তু নবীর আগমনের সময়ও তো কিয়ামত নিকটবর্তী সময়ে। তিনি বলেছেনঃ بعثت انا والساعة كهاتين "আমাকে ও কিয়ামতকে দু'টি অংগুলির মতো একটির সাথে অপরটির সংলগ্ন থাকা অবস্থায় পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাও বলেছেন ঃ اقتربت الساعة وانشق القمر "কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে গেছে।" আরো ঘোষণা আছে ঃ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ "মানুষের হিসাবের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে।"

তাছাড়া এটাও হতে পারে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করেছিলেন যে, সম্ভবত তার আমলেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, তবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ এবং দাজ্জালের হত্যা পরে সংঘটিত হবে।

আসলে আপনাদের মতো লোকদের মন-মগজে গোঁড়ামীর আবেগ জেঁকে বসেছে। এ জন্যে মাওলানা মওদূদীর প্রতিটি কথা খণ্ডন করা আপনারা নিজেদের জন্য ফরয কাজ মনে করেন। অথচ সব কথাই রদ করার মতো হয় না। আমার দাবী হলো—দীনের মূলনীতি ও শরীয়াতের স্বীকৃত নীতির আলোকে দাজ্জাল সম্পর্কে যদি কোনো সঠিক ইসলামী আকীদা হওয়া সম্ভব তাহলে সেটা কেবল তাই যা মাওলানা মওদূদী তার লেখায় তুলে ধরেছেন। যারা এর বিরুদ্ধে আপত্তি বা প্রতিবাদ জানায় তারা একটি সহজ-সরল কথাকে অযথা জটিল ও বক্র করার ব্যর্থ প্রয়াসে লিপ্ত।

তৃতীয় অভিযোগ

তারপর মুহতারাম জনাব কাজী মাজহার সাহেব চতুর্থ দফায় আপত্তি করেছেন এভাবে ঃ

"ইবনে সাইয়াদও কতিপয় দাজ্জালদের মধ্যে একজন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দাজ্জালে আকবার মনে করেননি।"

চতুর্থ অভিযোগ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু কথা নিজস্ব অনুমানের ভিত্তিতে বলেছিলেন, একথা স্বীকার করে নেয়া হলেও এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে তাঁর সন্দেহ দূর করে দেয়া হয়নি। কেননা নবীদের ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব।–(তানকীদি নযর পৃ ঃ ৮৮)

www.pathagar.com

পর্যালোচনা

"ইবনে সাইয়াদ কতিপয় দাজ্জালের মধ্যে একজন ছিলো। নবী আলাইহিস সালাম তাকে দাজ্জালে আকবার মনে করেননি। মুহ্‌তারাম কাজী সাহেবের উক্ত তৃতীয় আপত্তি সম্ভবত মাওলানা মওদূদী রাহ্‌মাতুল্লাহ্ আলাইহির নিম্ন বর্ণিত বাক্যাংশের জবাব দিতে চাচ্ছিলেন। মাওলানা মওদূদী রাহ্‌মাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সন্দেহ হয়েছিলো যে, সম্ভবত ইবনে সাইয়াদই দাজ্জাল। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তো তার দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে কসম করে বসলেন। কিন্তু ইবনে সাইয়াদ মুসলমান হয়েছিলো। মক্কা-মদীনায় অবস্থান করেছিলো। মুসলমান হিসেবেই মারা গিয়েছিলো। মুসলমানগণ তার নামাযে জানাযা পড়েছিলেন। তারপরও আজ পর্যন্ত ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জাল হওয়ার সন্দেহ করার অবকাশ কিভাবে অবশিষ্ট থাকতে পারে ?" যদি কাজী সাহেবের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে এটাই হয়, তাহলে আমরা আরয করবো যে, আপনারা সম্মানিত সাহাবীগণ সম্পর্কে যে মতবাদ পোষণ করেন এ জবাব সে মতবাদের পরিপন্থী। কেননা সাহাবীগণ সম্পর্কে আপনাদের মতবাদ হলো তাঁরা এ অর্থে সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড যে, দীনের ব্যাপারে তাদের সমস্ত কথা ও সিদ্ধান্ত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে কথা ও সিদ্ধান্তই তাঁদের কথা ও সিদ্ধান্তের খেলাফ হবে সেটা হবে বাতিল ও বিভ্রান্তিকর।

জবাবটি ঐ মতবাদের খেলাফ এ কারণে যে, ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবীদের চূড়ান্ত ও অকাট্য ফায়সালা হলো এ লোকটিই দাজ্জালে আকবার। এমনকি লোকটির মৃত্যু মক্কা মদীনায় হলেও, সেখানে অবস্থান করলেও এবং মৃত্যুর পর তার নামাযে জানাযা পড়া ইত্যাদি কাজগুলো মুসলমানরা করলেও। ইবনে সাইয়াদের দাজ্জালে আকবার হওয়া সম্পর্কে তাদের দৃঢ় সংকল্পে কোনো ফাটল ধরাতে পারেনি। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর ছাত্র ইবনে আবু সালামা জিজ্ঞেস করলে ঃ আপনি ইবনে সাইয়াদকে বড় দাজ্জাল বলেন কিভাবে ? انه قد مات "সেতো মৃত্যুবরণ করেছে।" জবাবে হযরত জাবের বললেন ঃ وان مات "সে মারা গিয়ে থাকলেও।" ইবনে আবু সালামা বললেন ঃ فانه قد اسلم "সে তো মুসলমান হয়েছে।" তিনি বললেন ঃ وان اسلم সে মুসলমান হয়ে থাকলেও। আবু সালামা বললেন ঃ فانه دخل المدينة "সে তো মদীনায় প্রবেশ করেছে।" তিনি

বললেন : وان دخل المدينة "সে মদীনায় প্রবেশ করে থাকলেও।"-(আবু দাউদ খঃ ২ পৃঃ ৫৯৫০) ফতহুল বারী খঃ ১৩ পৃঃ ২৭৮)

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে সাইয়াদ দাজ্জালে আকবার হওয়ার ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় মত এভাবে ব্যক্ত করেন : والله ما اشك ان المسيح الدجال هو ابن صياد "আল্লাহর কসম ! ইবনে সাইয়াদ দাজ্জালে আকবার হওয়ার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"-(ফতহুল বারী খঃ ১৩ পৃঃ ২৭৭) ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু তো একথাও বলেছেন যে, ইবনে সাইয়াদ দাজ্জালে আকবার একথা যদি আমি দশবার হলফ করে বলি তাহলে ইবনে সাইয়াদ দাজ্জালে আকবার নয় একথা একবার হলফ করে বলার তুলনায় বেশী পসন্দনীয়।"-(ফতহুল বারী খঃ ১৩ পৃঃ ২৮০) এখন মুহতারাম কাজী হুসাইন সাহেব এবং তাদের সংগী-সহযোগীদের কাছে জিজ্ঞাস্য—এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে এবং আপনার অনুরূপ মত পোষণকারী মুহাদ্দিসগণকে সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ডে মানবো, নাকি আপনাদের মুকাবিলায় হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সম্মানিত সাহাবীদেরকে যাঁরা ইবনে সাইয়াদের দাজ্জালে আকবার হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন, তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড হিসেবে মানবো ? যদি আমরা আপনাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড মেনে নিয়ে ইবনে সাইয়াদ দাজ্জালে আকবার না হওয়ার কথা বলে দেই তাহলে সে অবস্থায় হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবীগণ সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড রূপে টিকে থাকে না। কারণ,"তাঁরা ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জালে আকবার রূপে স্বীকার করে নিয়েছে আর এটা আপনাদের 'মিয়ারে হক' এর আকীদার সুস্পষ্ট খেলাফ। আর যদি আমরা সাহাবায়ে কিরামদের সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে ইবনে সাইয়াদ দাজ্জালে আকবার নয়। আপনাদের একথা ঠিক থাকে না। ؟ فهل الى خروج من سبيل

মুহতারাম কাজী মাজহার হুসাইন সাহেব চতুর্থ নম্বর আপত্তিতে যা উল্লেখ করেছেন সে ব্যাপারে আমাদের আরয হলো—সন্দেহ নেই যে, নবীগণের ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়, বরং অসম্ভব তবে এ সম্পর্কে নবীদের সেইসব ফায়সালার সাথে যা তাঁরা কোনো ইজতিহাদী বিষয়ে নিজেদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা সহকারে প্রদান করেন এবং এর সাথে যদি ফিকহী হিকমত সম্পৃক্ত হয়। এমন ইজতিহাদী বিষয়ে শরীয়তী আহকাম উদ্ভাবনের ব্যাপারে নবীদের পক্ষ থেকে যদি ইজতিহাদী ভুল হয়ে যায়, তাহলে

www.pathagar.com

সে ভুলের ওপর তাদের প্রতিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব। কেননা, এটা তাদের ইজতিহাদী বিচ্যুতি। এ ধরনের বিচ্যুতির ক্ষেত্রে নবীগণের সতর্কবাণী পাওয়া জরুরী। কারণ, শরীয়াতের হুকুম-আহকামে তাদের অনুসরণ করা উম্মতের জন্য প্রয়োজন। আর পদস্খলন ঘটেছে এমন বিষয়ে অনুসরণ করা জায়েয নয়। তবে কোনো ব্যাপারে তাদের সংশয় ও সন্দেহ প্রকশা করা যে, ঘটনাটা বোধহয় এরূপ হয়ে যাবে। অথবা কোনো বস্তু সম্পর্কে ধারণা বা সন্দেহ প্রকাশ করা যে, সম্ভবত এটা অমুক বস্তু হবে। তাহলে এসব বিষয়গুলোর মধ্যে মূলত কোনো হুকুম বা ফায়সালা নেই যাকে সঠিক অথবা ভুল বলা যেতে পারে। এ ধরনের ব্যাপারে সতর্কীকরণ বা সংশোধনের প্রয়োজন করে না। খেজুর গাছের পরাগায়নের ব্যাপারে কোন্ অহী নাযিল হয়েছিলো ? অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে আপন ধারণা প্রসূত এমন কথা বলেছিলেন যা উপকারী প্রমাণিত হয়নি। দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব, তার আবির্ভাবস্থল ও কাল সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালামের যতগুলো বাণী রয়েছে তা কোনো আহকাম নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব বিষয়ে কোনো নিশ্চিত ফায়সালাও দেননি যদ্দরুন ভুল হলে সে সম্পর্কে সতর্কীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। বরং তাঁর এসব বাণী নিছক একটি ধারণা ও আশংকামূলক ছিলো। কতিপয় লোকের দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে তিনি শুধু এ কারণে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, দাজ্জালে আকবারের বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে তার বৈশিষ্ট্যের অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। এ সাদৃশ্যের কারণে তিনি সেইসব লোকদের সম্পর্কে ধারণা এবং সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, তাদের মধ্যে কেউ দাজ্জালে আকবার নয়তো ?

দ্বিতীয়ত, দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব তার আবির্ভাবস্থান ও সময় সম্পর্কিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীগুলোকে ফায়সালা ও আদেশসূচক মেনে নিলেও একথা গ্রহণযোগ্য নয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরে এ বিষয়ে সতর্ক বাণী লাভ করেননি। বরং এসব বাণীর পর অহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো যে, 'দাজ্জাল' কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে আত্মপ্রকাশ করবে এবং লুদ নামক স্থানের দ্বার দেশে ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে হত্যা করবেন। আগের বাণীগুলো দেখার পর নবীকে এসব ইল্‌ম দেয়া হলো তাতে যেনো নবীকে এ বিষয়ে জানিয়ে দেয়া হলো যে, দাজ্জালের ব্যক্তিত্ব তার আবির্ভাবস্থান ও কাল সম্পর্কে আপনার আগেকার নির্দেশাবলী ইজতিহাদের মধ্যে গণ্য ছিলো। এবং ইবনে সাইয়াদ প্রভৃতি লোকদের দাজ্জাল হওয়া অথবা আপনার যুগেই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ করা সম্পর্কে আপনার সন্দেহ ও সংশয় সবই ছিলো অগ্রিম চিন্তা।

www.pathagar.com

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, নবী আলাইহিস সালামকে পরে যে ইলম দেয়া হয়েছিলো তা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা নির্দিষ্ট সময় কিংবা নির্দিষ্ট কোনো স্থানের নাম ছিলো। বরং এর তাৎপর্য এটাই যে, নবী আলাইহিস সালামকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো যে, যাদের দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে আপনার ধারণা ছিলো তাদের পরিবর্তে দাজ্জাল অন্য কোনো ব্যক্তি হবে যার সম্পর্কে এখন কারো কিছু জানা নেই। এমনিভাবে তিনি নিজের যামানায় দাজ্জাল বাহির হওয়ার যে বিপদের আশংকা করেছিলেন তাও ছিলো অগ্রিম চিন্তা। কেননা দাজ্জাল কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে আবির্ভূত হবে। তার আবির্ভাবের নির্দিষ্ট সময় ও স্থান কারো জানা নেই।"

পঞ্চম আপত্তি এবং তার জবাব

মুহতারাম কাজী মাজহার হুসাইন সাহেব পরিশেষে পঞ্চম দফায় যাকিছু বলেছেন তা মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বিরুদ্ধে তার মনের আক্রোশ প্রকাশের একটি ঘৃণ্য প্রদর্শনী মাত্র। তার এসব কথার মধ্যে ব্যাখ্যা করার মতো এমন জ্ঞানগর্ভ বিষয় নেই যার পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তবে এদ্বারা দাজ্জাল সম্পর্কে মুহতারাম কাজী সাহেবের আকীদা এই বুঝা যায় যে, তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যে অন্তরীণ ব্যক্তির সাক্ষাত ঘটেছিলো সে-ই দাজ্জালে আকবর। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু তাকেই দাজ্জালে আকবার বলে নিশ্চিত ঘোষণা দিয়েছেন। সতুরাং তাকেই দাজ্জালে আকবার মনে করা ইসলামী আকীদার দিক থেকে ফরয। আর যে তাকে দাজ্জালে আকবার মনে করবে না সে সহীহ আকীদার অনুসারী মুসলমান থাকতে পারে না।"

মুহতারাম কাজী সাহেবের উদ্দেশ্য যদি বাস্তবিকই এটা হয় তাহলে সে সম্পর্কে নিম্ন লিখিত নিবেদনগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং সামান্য কিছু সময় ব্যয় করে আমাদের সান্ত্বনার জন্যে সন্তোষজনক পদ্ধতিতে এগুলোর জবাব প্রদান করুন।

(ক) গোটা আলেম সমাজ সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করেছেন যে, কোনো বিষয়ে ইসলামী আকীদা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এমন সব দলীল কার্যকরী হতে পারে যা অকাট্য ও নিশ্চিত। যন্নী বা ধারণা প্রসূত দলীল দ্বারা ইসলামী আকীদা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হতে পারে না। আর এ অকাট্যতা ও নিশ্চয়তা কুরআনের অকাট্য নির্দেশসূচক আয়াত হতে পারে অথবা অকাট্য নির্দেশসূচক মুতাওয়াতের হাদীস হতে পারে কিংবা তৃতীয় পর্যায়ে সাহাবায়ে কিরামদের সেইসব ইজমা যা 'নস' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং সাহাবীদের যামানা

www.pathagar.com

থেকে আমাদের যামানা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে (মুতাওয়াতের) পৌঁছেছে। দ্বীপে অবরুদ্ধ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়া প্রমাণ করার জন্যে এ তিন ধরনের দলীলের একটিও পেশ করা সম্ভব নয়। তাহলে তাকে দাজ্জালে আকবার মনে করা কিভাবে ইসলামী আকায়েদের মধ্যে গণ্য হতে পারে ?

রয়ে গেলো হযরত তামীমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েত। মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যানুযায়ী এ রেওয়ায়েতটি খবরে ওয়াহেদ। কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে গরীব ফরদ প্রকৃতির হাদীস বলেছেন। সাহাবীদের স্তর থেকে শুধুমাত্র ফাতেমা বিনতে কায়েস হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। অপর কোনো সাহাবী হাদীসটি আদৌ বর্ণনা করেননি। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ হাদীসটি 'গরীব ফরদ' শ্রেণীর হাদীস নয় তবে এর রাবী চারের বেশী নয়। আর চারজনের রেওয়ায়েত কৃত হাদীস মুতাওয়াতের হতে পারে না। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ

وقد توهم بعضهم انه غريب فردو ليس كذالك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس ابو هريرة وعائشة وجابر رضـ

"কোনো কোনো মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে 'গরীব ফরদ' মনে করেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ, হাদীসটি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুও রেওয়ায়েত করেছেন।"

(খ) তাছাড়া দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়ার ব্যাপারে হাদীসটি অকাট্য নির্দেশসূচক নয়। অন্যথায় যদি এটা অকাট্য হতো তাহলে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু এ হাদীসটির রাবী হওয়া সত্ত্বেও ইবনে সাইয়াদের দাজ্জালে আকবার হওয়ার জন্যে জিদ করতেন না। অথচ ইতিপূর্বেই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি ইবনে সাইয়াদকেই দাজ্জালে আকবার মনে করতেন।

ফাতেমা বিনতে কায়েসের বর্ণিত হাদীস যখন খবরে ওয়াহেদ বলে প্রমাণিত হলো এবং তা অকাট্য নির্দেশসূচক নয় ; তখন দ্বীপে অবরুদ্ধ ব্যক্তি দাজ্জালে আকবার হওয়ার আকীদা পোষণ করা পরিশেষে কিভাবে ইসলামী আকীদারূপে প্রমাণিত হতে পারে ?

(গ) যদি আপনি এ হাদীসটিকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত বলে স্বীকারও করেন, তাহলে মেহেরবাণী করে হাদীসের এমন কোনো শব্দের কথা বলুন যাদ্বারা দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়া অকাট্যভাবে

www.pathagar.com

প্রমাণিত হয়। পরন্তু বলুন যে, হাদীসটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে দাজ্জালে আকবার হওয়ার কথা প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করলেন কিসের ভিত্তিতে এবং তার মুকাবিলায় ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জালে আকবার হওয়ার জন্যে কেন বড় পীড়াপীড়ি করেছেন ? অথচ হাদীসের রাবী সাহাবীর জন্যে হাদীসের বিরোধিতা করা কোনোক্রমেই জায়েয নেই।

(ঘ) আপনি কি বলতে পারেন যে, কুরআনের অমুক জায়গায় একটি আয়াত আছে যা দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত করে ? অথবা একথা বলার সাহস করতে পারেন যে, দ্বীপে অন্তরীণ ব্যক্তি দাজ্জালে আকবার হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীদের যুগে ইজমা হয়েছে যা 'নস' ছিলো এবং মুতাওয়াতেরভাবে বর্ণিতও হয়ে এসেছে ? যদি বলতে না পারেন এবং কস্মিনকালেও পারবেন না তাহলে দ্বীপে অবরুদ্ধ ব্যক্তির দাজ্জালে আকবার হওয়াকে আপনি কিসের ভিত্তিতে ইসলামী আকীদার মধ্যে গণ্য করেন ?

মেহেরবানী করে আমাদের পেশকৃত বক্তব্যের ওপর সহানুভূতির দৃষ্টিতে মনোযোগ দিয়ে আমাদের সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করবেন। যাতে আমরা বুঝতে পারি যে, দাজ্জাল সম্পর্কে আপনার মত ও দৃষ্টিভংগী নির্ভুল আর মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দৃষ্টিভংগী ভুল।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—১

অভিযোগ ও জবাব সম্পর্কীয়

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে আমার রচিত "মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়ে জনসাধারণের সামনে আসলে জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদীর সাথে মতপার্থক্য পোষণকারী কিছুসংখ্যক শিক্ষিত লোকের জন্যে উদ্বেগের কারণ হবে এবং তাদের পক্ষ থেকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুও হবে। বইটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই আমি এ সত্য থেকে মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হইনি। কেননা, বিষয়বস্তুর দিক থেকে বইটি বেশ আকর্ষণীয় ও বৈচিত্রময়। যার কারণে দেশে বইটির ওপর উত্তপ্ত আলোচনা হচ্ছে এবং স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানাজনের নানা মতামত প্রকাশ পাচ্ছে।

তাছাড়া বইখানিতে 'ইসমতে আম্বিয়া বিষয়' আলোচনা কালে হযরত মাওলানা মাদানী রাহামাতুল্লাহ আলাইহি মাওলানা মওদূদী রাহামতুল্লাহ আলাইহির তাফহীমাত গ্রন্থের বাক্যের ওপর যে সমালোচনা করেছেন তার জবাব দেয়া হয়েছে। এ জবাবও সেসব ভদ্র মহোদয়গণের জন্য কম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ হবে না যারা হযরত মাদানীর শিষ্য অথবা ভক্ত হওয়ার কারণে তার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও গভীর ভালোবাসার আবেগে আবদ্ধ। এমন আবেগ প্রবণ বিষয় সম্পর্কেও গ্রন্থ রচনা করা যায় এবং হযরত মাদানীর মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দীনি নেতা, আলেম ও পথপ্রদর্শকের সমালোচনার জবাবও দেয়া হবে। অথচ তার কোনো সমালোচনা করা কিংবা ব্যাখ্যা দেয়া হবে না। একথা কোনোক্রমেই এক সাথে চলত পারে না। উপরন্তু এটাও স্বীকৃত সত্য যে من صنف فقد استهدن যে গ্রন্থ রচনা করলো সে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল হলো। সুতরাং আমার বইয়ের কোনো ব্যাখ্যা কিংবা সমালোচনা লেখা কিছুমাত্র অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। এতে আমার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে না। বরং বেশী সম্ভাবনা এটাই যে, ইল্‌মী সমালোচনা আমার জন্য খুশীর ও পথ নির্দেশনার কারণ হবে। তবে যারা গালি-গালাজকে তানকীদ অথবা পর্যালোচনা নাম দেয় তাদের সমালোচনা একজন ভদ্রলোকের জন্যে আনন্দের কারণ হতে পারে না।

একটি দীনি মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস সাহেব সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে একটি প্রবন্ধ লেখা শুরু করেছেন যার প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে। এটা ছাড়া আমার বইয়ের আর কোনো সমালোচনা আজও আমার নজরে পড়েনি।

www.pathagar.com

এ প্রবন্ধের জবাব লিখে প্রকাশ না করাই খেয়াল ছিলো। কারণ, প্রবন্ধ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত প্রীতি ছিলো এই যে, এ দ্বারা বইয়ে উল্লেখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে না এবং বিগত ভ্রান্তিরও পুনরাবৃত্তি হবে না। কিন্তু এখন জানতে পারলাম যে, এর মাধ্যমে পুরনো ভ্রান্তিরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। সুতরাং প্রথম কিস্তির জবাব লিখে প্রকাশ করা জরুরী মনে করলাম যাতে ভ্রান্তির অপনোদন হয় এবং অতিরিক্ত ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয়।

পর্যালোচনা শিরোনামে যে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার দু'টি অংশ। একটি অংশ আমার বিরুদ্ধে অপবাদ এবং আমার বইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। অপর অংশ তাফহীমাতের বাক্যের একটি ব্যাখ্যা সম্বলিত। এ ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উভয় অংশের জবাব পেশ করা হচ্ছে।

প্রথম অংশের বিশ্লেষণ

প্রবন্ধের প্রথম অংশ সম্পর্কে চিন্তা করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সামনে আসে।

(ক) ইলমী জায়েযায়' তাফহীমাতের বাক্যের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা আহলে ইলমদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ হলো, এ ব্যাখ্যা সঠিক হওয়া সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কোনো সত্যায়ন স্বাক্ষর নেই। অথচ তিনি এখনো জীবিত আছেন। অবশ্য তিনি জীবিত না থাকলে এ ব্যাখ্যা হয়তো বা গ্রহণযোগ্য হতো।

এ বাক্যে যেন এ নীতির গোড়াপত্তন করা হলো যে, কোনো জীবিত আলেমের বাক্যাবলীর ব্যাখ্যা ও বিবরণ তখনই নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণীয় হবে যখন তার সঠিক হওয়া সম্পর্কে উক্ত আলেমের সত্যায়িত দস্তখত থাকবে, অন্যথায় তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।

জবাব

জ্ঞান ও ইতিহাসের আলোকে যখন আমরা নীতিটিকে প্রত্যক্ষ করি তখন তা কয়েকটি কারণে সঠিক বলে মনে হয় না ঃ

প্রথমত, এর পক্ষে কোনো আকলী (বুদ্ধিবৃত্তিক) ও নকলী (বর্ণনামূলক) দলীল পেশ করা হয়নি। আর দলীল ছাড়া কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিও এ ধরনের পার্থক্য মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারে না। কারণ, কোনো আলেমের কোনো বাক্যে কোনো ব্যাখ্যা যদি অগ্রহণযোগ্য হয় তাহলে ইল্‌মী দিক থেকে তার ব্যাখ্যা শুধু এটাই যে, উক্ত বাক্যের এ ব্যাখ্যাটি ছাড়াও অন্য কোনো ব্যাখ্যার সম্ভাবনাও আছে। আর সম্ভাবনার সম্পর্ক যে খোদ বাক্যটির সাথে তা বলাই বাহুল্য। আলেম সাহেবের জীবন ও মৃত্যুর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এখন কোনো সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি একথা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে, উক্ত আলেমের জীবিত থাকা বা মৃত্যু হওয়া উভয় অবস্থাতেই বাক্যের মধ্যে সমভাবে সন্দেহ বিদ্যমান অথচ সন্দেহযুক্ত দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে একটি ব্যাখ্যা এক অবস্থায় বাক্যের লিখকের সত্যায়ন ছাড়া গ্রহণীয় হবে না। আর সেই ব্যাখ্যাটিই আরেক অবস্থায় সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও লেখকের সত্যায়নের কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। বরং সুস্থ বুদ্ধি-বিবেক বলে যে, যখন উভয় অবস্থাতেই দ্বিতীয় ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে তখন উভয় অবস্থাতেই হুকুমও এক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়ত, যদি এটা স্বীকার করেও নেয়া হয় তাহলে নীতিটি যেমনি বান্দার কথা ও বাক্যের মধ্যে বিবেচনা যোগ্য হবে, তেমনি আল্লাহ্ ও রসূলের বাণী ও বাক্যের ক্ষেত্রে এ নীতি প্রয়োগ না হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং এখানেও নীতিটি প্রযোজ্য হবে।

কুরআনের তাফসীরসমূহ

এবার আমি আরজ করবো যে, কুরআনে মজিদ পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার মহাগ্রন্থ। তিনি শুধু জীবিতই নন বরং জীবনের স্রষ্টা হওয়ার কারণে অন্যান্যদের জীবন দানকারীও বটে। يحيى ويميت وهو حى لايموت এ হলো মহান আল্লাহর শান ও মর্যাদা। এ মহাগ্রন্থ আল কুরআনের শত সহস্র তাফসীর লেখা হয়েছে। এসব তাফসীর কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্যের ব্যাখ্যা এবং বাক্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব অসংখ্য তাফসীর গ্রন্থের কোনো একটি তাফসীর সম্পর্কেও এ দাবী করা যায় যে, এর ব্যাখ্যা ও বিশদ বিবরণের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সত্যায়নের সিল মেরে দিয়েছেন। তবে কি এ নীতির নিরিখে কুরআনের তাফসীরসমূহের এ অমূল্য ভাণ্ডার একটি বেহুদা ও নিরর্থক বস্তুর গাদা হিসেবে পরিগণিত হবে? এবং এর সবগুলো এ কারণে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে হবে যে, এগুলোর ওপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সত্যায়িত হয়নি বা এর বিশ্বস্ত হওয়ার সিলমোহর লাগানো হয়নি। না, তা কখনো না।

www.pathagar.com

হাদীস গ্রন্থ ও তার শরাহ

এমনিভাবে আজকের ইসলামী বিশ্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহের সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্যে সব জায়গায় হাদীস গ্রন্থসমূহ রয়েছে। মুহাদ্দিসগণ এসব গ্রন্থের মধ্যে রসূলের বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং অনুচ্ছেদ আকারে সাজিয়ে সেসব বাণীর তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। অনেকে তা থেকে ফিকহী মাসায়েলও উদ্ভাবন করেছেন। সেসব কিতাবের শত সহস্র সংখ্যক ব্যাখ্যা ও টীকা টিপ্পনী লেখা হয়েছে। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহের আরো ব্যাখ্যা এবং তাঁর বাক্যের বিশ্লেষণ ফুটে উঠেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অধিকাংশ উম্মতের মতে জীবিত আছেন। যদিও জীবিত থাকার প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদ অবশ্যই রয়েছে। তাহলে এখানেও কি হাদীসের গ্রন্থরাজি এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা ও টীকার এ সমস্ত মূল্যবান ভাণ্ডার উপরোল্লেখিত নীতির আলোকে শুধু এ কারণে অপ্রয়োজনীয় বলে এবং সমুদ্রে নিক্ষেপযোগ্য মনে করা হবে যে, এগুলোর কোনো একটির মধ্যেও নবী আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে সত্যায়নকারী সিলমোহর নেই। কখনো নয়—তাফহীমাতের বাক্যের যে ব্যাখ্যা আমি করেছি তার মধ্যে পরিশেষে এমন কি বিশেষত্ব আছে যদ্দরুন আহলে ইলমগণের কাছে তা এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, একজন জীবিত আলেমের লিখিত বাক্যের এমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সেই আলেমের সত্যায়নের সিলমোহর নেই।

এ জবাবে বড় জোর একথা বলা যায় যে, কুরআনের তাফসীর এবং হাদীসের ব্যাখ্যাসমূহের এ অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারে আল্লাহ ও রসূলের সত্যায়নের সিলমোহর থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও গোটা আহলে ইসলামের কাছে গ্রহণীয় ও সমাদৃত হয়েছে। কেননা এসব ব্যাখ্যা ও তাফসীরে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের যে তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে তা আরবী প্রচলিত বাকরীতি এবং কুরআন হাদীসের পূর্বাপর সম্পর্ক এবং অপরাপর জায়গার ব্যাখ্যার আলোকে বর্ণিত। এ কারণে গোটা উম্মত এগুলোকে সুদৃষ্টিতে দেখে থাকে। তাফহীমাতের বাক্যাংশের যে ব্যাখ্যা এ গ্রন্থে পেশ করা হয়েছে তার জন্যও একথা বলা যেতে পারে। সে ব্যাখ্যাটিও তাফহীমাতের বাক্যে পূর্বাপর সম্পর্ক বর্ণনা রীতি এবং মওদূদী সাহেবের ব্যাখ্যার আলোকে পেশ করা হয়েছে। ব্যাখ্যাটির সাহায্যার্থে মুহতারাম মাওলানার অন্যান্য লেখা থেকেও হ্রাস বৃদ্ধি ছাড়া উদ্বৃত করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও আহলে ইলম সুধীগণের কাছে ব্যাখ্যাটির বিশুদ্ধতার ওপর মাওলানা মওদূদীর সত্যায়নের সিল না থাকার দরুন গ্রহণযোগ্য না হওয়ার হেতু কি? অথবা মাওলানা এ বইয়ের ওপর কোনো

www.pathagar.com

প্রশংসাও কেন লিখেননি ? পার্থক্য করার জন্যে আমাদের কাছে কোনো সংগত কারণ নেই। ব্যাখ্যাকারী বুযর্গদের চিন্তা-ভাবনায় যদি এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ধরা পড়ে তাহলে সেটা সামনে তুলে ধরা উচিত যাতে আমরা তা থেকে সান্ত্বনা লাভ করতে পারি।

চতুর্থত, বাস্তবতার আলোকেও এ নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, বাস্তবতার নিরিখে এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, অনেক আলেম ও মাশায়েখ দরসে কুরআন ও দরসে হাদীস দেয়ার সময় কুরআনের তাফসীর এবং হাদীসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অনেক বিষয় বর্ণনা করে থাকেন। তারপর তাঁদের জীবদ্দশাতেই তদীয় শাগরেদগণ ঐসব বিষয় সংকলন করে বই আকারে প্রকাশ করেন। আজও এ ধারাক্রম সব জায়গায় সমানভাবে জারী আছে। এসব বিষয় সংকলিত হয়ে যখন ওস্তাদগণের সামনে এসেছে তখন তাঁরা এরূপ কাজ করা অপসন্দ করেননি বা প্রত্যাখ্যানও করেননি। সুতরাং এর ভিত্তিতেই শাগরিদগণ সেসব বিষয়গুলো তাদের সত্যায়নের স্বাক্ষর ব্যতিরেকেই বই আকারে ছাপিয়ে প্রকাশ করেছেন। এসব সংকলন গ্রন্থ সমগ্র ইল্‌মী দুনিয়ায় শুধু গ্রহণযোগ্য হয়নি বরং ইসলামী বিশ্বের আলেম সমাজ থেকে প্রশংসা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এজন্যে যদি দূর অতীতের ইতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে বক্তব্য অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যাবে। এ কারণে শুধু আমি নিকট অতীতের গ্রন্থ রচনার ইতিহাস থেকে ২/৩টি উদাহরণ পেশ করেই ক্ষ্যান্ত হবো। উদ্দেশ্য স্পষ্ট করার জন্যে এ থেকেও যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যাবে।

প্রথম উদাহরণ ঃ তাফসীরুল মানার

এ সত্য সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধে যে, 'আল মানার' তাফসীর গ্রন্থটি মিসরের প্রখ্যাত আলেম মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু (র) দরসে কুরআনের সমষ্টি যা তারই ছাত্র আল্লামা সাইয়েদ রশীদ রেজা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর জীবদ্দশাতেই সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তাফসীরটির কতিপয় লেখা এমন যা তিনি তাঁর উস্তাদ মুহাম্মদ আদুহু রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে কুরআন শিক্ষার সময় শুনেছেন এবং পরে অতিরিক্ত ব্যাখ্যাসহ নিজের কথায় লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার কতিপয় বিষয়ে তিনি নিজের পক্ষ থেকেই তাফসীর করে মরহুম উস্তাদের কাছ থেকে শ্রুত বিষয়ের সাথে একত্রিত করে এক সাথে বিন্যস্ত করেছেন। আল্লামা রশীদ রেজা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাবের প্রারম্ভে একথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, গ্রন্থটি প্রকাশ পাওয়ার আগে অথবা পরে ওস্তাদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তা পাঠ করেছেন এবং কোনো ধরনের প্রতিবাদ তিনি করেননি। ওস্তাদ থেকে শ্রুত ব্যাখ্যামূলক বিষয়গুলো তার সাথে সম্পর্কিত করার জন্যে এ বিষয়টিকেই আমি যথেষ্ট মনে করেছি। তিনি লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

"প্রথমত যেসব লেখা ছাপার জন্যে তৈরী হতো সেগুলো সুযোগ পেলেই আমি সে সম্পর্কে ওস্তাদকে অবহিত করতাম। তিনি কখনও পাণ্ডুলিপি দেখতেন, কখনও প্রুপ দেখে অনেক সময় কম বেশী সংযোজন করে সংশোধন করে দিতেন। যেসব লেখা তাঁর দেখার আগেই ছাপা হয়ে যেতো সেগুলোর কোনোটি সম্পর্কে কোনো প্রকার সমালোচনা করেছেন বলে আমার স্মরণ নেই। বরং তিনি ছাপানো বিষয় সম্পর্কেও সম্মতি দিয়েছেন।"

"যেহেতু মরহুম ওস্তাদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অধিকাংশ সময় ছাপার আগে এবং কোনো কোনো সময় ছাপার পরে আমার লিখিত সমুদয় পাণ্ডুলিপি পড়তেন তাই সেসব লেখা তাঁর সাথে সম্পর্কিত করা আমি ক্ষতিকর বলে মনে করিনি। অর্থাৎ যা আমি তাঁর আলোচনা থেকে বুঝেছি, কিন্তু দরসের সময় তা লিপিবদ্ধ করিনি। কারণ, দেখার পর হযরত ওস্তাদ যখন সেসব লেখা বহাল রেখেছেন এবং কোনো প্রকার রদ-বদল করেননি তখন আমার বুঝার বিশুদ্ধতা এবং তাঁর সাথে এগুলোকে সম্পর্কিত করা বিষয়টি আরো বেশী জোরদার ও শক্তিশালী হয়ে যায়।"-(তাফসীরে মানার খঃ ১ পৃঃ ১৫)

উপরোক্ত বাক্যাবলী এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কোনো আলেমের রচনার ব্যাখ্যা কিংবা বিশদ বিশ্লেষণের ওপর তার সন্তুষ্ট থাকা অথবা তার সাথে কোনো লিখিত বিষয়কে সম্পর্কিত করার জন্যে এতোটুকু কথাই আলেমগণ যথেষ্ট মনে করেছেন যে, আলেম সাহেব লেখাটি ছাপার আগে বা পরে পাঠ করেছেন। পাঠ করার পরে মৌন রয়েছেন, কোনো রদবদল করেননি। আমার বইয়ের ব্যাপারেও সে নীতি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। রয়ে গেলো সত্যায়নের দস্তখত। এটা জরুরী নয়। অন্যথায় ব্যাখ্যামূলক লেখাগুলো মুহাম্মদ আবদুহু রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সাথে সম্পর্কিত করা সহীহ হবে না। কারণ, উল্লেখিত কিতাবের কোথাও কোনো লেখার ওপর তাঁর সত্যায়িত দস্তখত নেই।

দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ ফয়যুল বারী

অনুরূপভাবে এ সত্য ও আহলে ইলমদের অজানা নয় যে, ফয়জুল বারী হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী সাহেবের বক্তৃতা ও আলোচনার সমষ্টি যা তিনি বুখারীর পাঠদানের সময় মাঝে মধ্যে করেছেন। মাওলানা বদরে আলম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেব শাহ সাহেবের জীবদ্দশাতেই সেগুলো একত্রিত করে সংকলন করেন। আমার জানা মতে সংকলনটি হযরত শাহ সাহেবকে দেখানোও হয়েছিলো। দেখার পর শাহ সাহেব যেহেতু মৌন রয়েছেন এবং কোনো প্রকার রদবদল করেননি। এজন্যে ছাপা হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত দেওবন্দী

www.pathagar.com

হযরতগণ এটাকে শাহ সাহেবের বিবৃতির সমষ্টি মনে করেন এবং শাহ সাহেবের দিকে সংকলনটির সম্বোধন করাকে সঠিক হিসাবে গ্রহণ করেন। অথচ কিতাবের কোথাও কোনো লেখার ওপর শাহ সাহেবের সত্যায়নের দস্তখত নেই। মনে হয় উপরোল্লেখিত নীতিটি আজ পর্যন্ত কোনো আলেমের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

তৃতীয় উদাহরণ ঃ আল আরাফিশ শাজী

'আরাফিশ শাজী'ও হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী সাহেবের তিরমিযী হাদীস গ্রন্থ শিক্ষাদান কালীন সময়ের বক্তব্য ও আলোচনার সমষ্টি। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ চেরাগ সাহেব শাহ সাহেবের জীবদ্দশাতেই সেগুলো একত্রিত করে বই আকারে প্রকাশ করেন। অন্তত পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের সীমানা পর্যন্ত গ্রন্থখানা ইলমী মহলে খুবই সমাদৃত হয় এবং দীনি মাদ্রাসা-গুলোর হাদীসের উস্তাদগণ এ কিতাব দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। অথচ এ ক্ষেত্রেও কোনো লেখার ওপর হযরত শাহ সাহেবের কোনো সত্যায়নের দস্তখত নেই। বরং তিনি তা দেখেছেন এবং মৌন রয়েছেন।

তাহলে উপরোল্লেখিত নীতির আলোকে ফয়জুল বারী এবং আরাফিশ শাজী এ উভয় কিতাব হযরত শাহ সাহেবের আলোচনা সমষ্টির সংকলন নয় একথা বলা কি আমাদের জন্যে ঠিক হবে ? অথবা এসব লেখা ও ব্যাখ্যা বিবৃতির ওপর হযরত শাহ সাহেবের সত্যায়নের দস্তখত না থাকার দরুন গ্রন্থদ্বয় গ্রহণযোগ্য নয় এবং সমস্ত দেওবন্দী আলেমগণ এ কিতাব দু'খানাকে হযরত শাহ সাহেবের সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন তা ভুল ! না, কখনো নয়। তবে উপরোল্লেখিত নীতিটি যেহেতু সত্য ও বাস্তবতার একেবারেই বিরোধী। সুতরাং সেটা আমার নিজের মতেও আহলে ইলমদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না অথবা ইনসাফ প্রিয় আলেমগণ এর সাথে একমত হতে পারেন না।

একটি অবরোহমূলক সমাধান

পঞ্চমত, অল্প সময়ের জন্যে যদি এ নীতি মেনেও নেয়া হয় যে, কোনো জীবিত আলেমের রচনার ব্যাখ্যা অথবা বিশদ বিশ্লেষণ তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তার উপর ঐ আলেমের সত্যায়নের দস্তখত থাকবে, তাহলে এটা আরয করার অবকাশ থাকে যে, এ নীতি ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা অথবা ভুল ও নির্ভুল পরিমাপের জন্যে মাপকাঠি হিসেবে যেভাবে নির্ভরযোগ্য হবে সেভাবে অভিযোগ ও প্রতিবাদের জন্যেও তা নির্ভরযোগ্য না হওয়ার কোনো কারণই নেই। বরং কুরআনের পেশকৃত আইনের فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ এবং لَاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ নিরিখে অভিযোগ ও প্রতিবাদ সম্পর্কে

www.pathagar.com

উপায়টির বিবেচনা করা আরো অধিক জরুরী বরং ফরয হওয়া উচিত। কেননা এতে মুসলমানদের মান-ইজ্জতের ওপর অবৈধভাবে আক্রমণ করার সম্ভাবনা থাকে যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে হারাম ঘোষিত হয়েছে ঃ

اِنَّ دماء كم واموالكم واعراضكم عليكم حرام -(الحديث)

"নিশ্চয় তোমাদের জান-মাল, মান-ইজ্জত তোমাদের জন্য হারাম।"

–(আল হাদীস)

এ সংশোধনের পর পর্যালোচনাকারী বুযর্গের পেশকৃত নীতি সামনে রেখে একথা আরয করা যায় যে, এ সত্য আজ আর গোপন নয় যে, হযরত মাওলানা মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেব থেকে মরহুম মাওলানা আহম্মদ আলী সাহেব এবং মৌলভী গুলবাদ শাহ তুরভী সাহেব থেকে গোলাম গাওস হাজরাভী পর্যন্ত যতো হযরতগণ আছেন সকলেই মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বাক্যের ওপর ভিত্তি করে মাওলানা ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে পনর বছর যাবত বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উত্থাপনে লিপ্ত আছেন। স্বয়ং হযরত মাদানী সাহেবের কতিপয় লেখায় জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদীকে খারেজী, মুতাযেলী, ইসমতে আম্বিয়া অস্বীকারকারী এমনকি বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্তকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের কোনো একজন সম্পর্কেও কি এ প্রমাণ দেয়া সম্ভব যে, তিনি মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এসব জঘন্য অভিযোগ আরোপ করার আগে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, আপনার অমুক অমুক বাক্যের কারণে আমি আপনার, আপনার জামায়াতের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ উত্থাপন করছি। কিন্তু যেহেতু আপনি জীবিত আছেন, সুতরাং আমি আল্লাহভীতি মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শরীয়তী নির্দেশ মুতাবিক এবং فَتَبَيَّنُوا। বিধানের আলোকে আপনার কাছে এর ব্যাখ্যা তলব করছি যে, আপনার এসব বাক্যের আমি যে অর্থ বুঝেছি সেটাই কি আপনার উদ্দেশ্য, না এগুলো দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য অন্য কিছু ? এবং এ প্রশ্নের জবাবে মাওলানা একথা বলছেন যে, আমার বাক্যাবলীর দ্বারা আপনি যাকিছু বুঝেছেন সেটাই আমার উদ্দেশ্য ? সত্যায়ন করা তো দূরের কথা, অভিযোগ আরোপকারী মহোদয়গণের মধ্যে কোনো বুযর্গ সম্পর্কে এ ধরনের ব্যাখ্যা তলব করার প্রমাণ যোগাড় করা সম্ভব হলে স্বীকার করবো যে, অভিযোগ আরোপকারীগণ আলোচ্য নীতিটি বিবেচনা করেছেন। অতএব, এ সমস্ত অভিযোগ সবই সত্য। অন্যথায় উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি নিজেকে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী মনে করবো যে, এসব অভিযোগ সবই ভ্রান্তিপূর্ণ এবং নিসন্দেহে অগ্রহণযোগ্য। যদি বলা হয় যে, আলোচ্য নীতি শুধুমাত্র হযরত মাদানী সাহেবেরই সব

www.pathagar.com

অভিযোগ নয় বরং অপরাপর সমস্ত বুযর্গদের সব অভিযোগ ও অপবাদকেও ভুল এবং অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করত দ্বন্দ্বের চির অবসান ঘটালে তা অনর্থক হবে না। কিন্তু যদি নীতিটি কেবলমাত্র ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং অভিযোগ ও অপবাদসমূহকে এ থেকে বাদ দেয়া হয় এবং এর আওতা বহির্ভূত মনে করা হয় তাহলে সবিনয়ে আরয করবো, এমন পার্থক্যের জন্য যদি কুরআন হাদীস অথবা শরীয়াতের স্বীকৃত মূলনীতিসমূহ থেকে কোনো যুক্তিসংগত দলীল পেশ করা হয়, তাহলে তা হবে অনুগ্রহ। আমার মতো লোকের জন্যে হবে পরম সান্ত্বনার কারণ এবং দয়া ও অনুগ্রহও বটে।

ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অংশ

(খ) "ইলমী জায়েযার রচয়িতা (মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ) মাওলানা মওদূদীর অযাচিত ওকালতির স্রোতে এমনভাবে ভেসে গেছেন যে, তিনি এমন সব বুযর্গদের ত্রুটি উল্লেখ করতে গিয়ে এ খেয়াল পর্যন্ত রাখলেন না যে, তাঁদের ইলম ও জ্ঞানের গভীরতা শুধু মিত্ররা নয় শত্রুরাও অস্বীকার করতে পারেনি।"

জবাব

পর্যালোচনার এ অংশে একদিকে আমাকে অযাচিতভাবে ওকালতী করার অপবাদ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে আমার প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে যে, আমি মাওলানা মাদানী মরহুমকে অবৈধভাবে দোষারোপ করেছি। নিম্নে দু'টি অভিযোগের জবাব যথাক্রমে পেশ করছি ঃ

আমার মতে আমার রচিত গ্রন্থটি ভালোভাবে পাঠ না করা এবং সঠিকভাবে তার মূল্যায়ন না করার কারণেই এ অপবাদ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় আমি নিশ্চিত যে, এ ধরনের অপবাদ আমাকে কখনো দেয়া হতো না। নীচে গ্রন্থটির সঠিক মর্যাদা পেশ করা হচ্ছে। বিষয়টি ভালোভাবে চিন্তা করে দেখা আপনার জন্য যথার্থ হবে।

গ্রন্থখানার সঠিক মর্যাদা

আমার গ্রন্থখানার সঠিক মর্যাদা হলো যে, একদিকে তা বর্তমান যুগের একজন মযলুম সত্য ও ন্যায়ের অকুতোভয় আহ্বানকারী (দায়ী) এবং শ্রেষ্ঠ আলেমে দীনের প্রতিরক্ষা, অন্যদিকে দীনকে সাহায্য ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করার সামান্য প্রায়াস। গ্রন্থখানাতে এমন কতিপয় অভিযোগের জবাব দেয়া হয়েছে যা দীনের বিভিন্ন বিষয় প্রসংগে এমন একজন আলেমের লিখিত বাক্যসমূহের ওপর আরোপ করা হয়েছে যার সম্পর্কে ন্যায় নিষ্ঠা সবাই ভালো করেই জানে যে, তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েম করার আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যয়িত হয়েছে বরং তজ্জন্য উৎসর্গিত

www.pathagar.com

রয়েছে। আমার মতে এসব অভিযোগ একদিকে যেহেতু একজন মুসলমান আলেমে দীন এবং ইসলামের একজন একনিষ্ঠ সেবকের দীনি মর্যাদার ওপর অনর্থক আক্রমণের বেশী কিছু নয়, অপরদিকে এসব অযথা অভিযোগ দ্বারা ইকামাতে দীনের মতো মহান কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টিরও আশংকা ছিলো। তাই পরিণতির পরওয়া না করে এবং সব ধরনের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দীনে হকের সহযোগিতা করার অভিপ্রায় ইসলামের একজন একনিষ্ঠ খাদেম, আলেমে দীন এবং ইসলামী আন্দোলনের একজন নিপীড়িত নির্যাতিত নেতার প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য এ কিতাবটিতে আমি সেইসব অভিযোগের জবাব লিখেছি যা কতিপয় ইলমী মহল থেকে তাঁর ওপর আরোপিত হয়েছে। উলামায়ে আহলে সুন্নাতের ইলমী বিশ্লেষণের আলোকে বিতর্কিত বিষয়গুলোর তাৎপর্য উদ্ঘাটন করেছি। আমি যখন আমার এ প্রতিরক্ষার শরীয়তী মর্যাদা সম্পর্কে চিন্তা করি তখন নবীর বাণীসমূহের আলোকে আমি বুঝি যে, এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ দীনি কর্তব্য যা অন্যান্য সত্য ও ন্যায়বান উলামায়ে দীনের মতো আমার দায়িত্বও আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত হয়েছে। সত্য গোপন করার বিপজ্জনক পরিণতি থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে এ কিতাব লিখে কিছুটা দায়িত্ব আদায় করেছি বলে মনে করি।

কিতাবের এ মর্যাদা সামনে রেখে যখন আমি অযাচিত ওকালতী করার অপবাদ সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন এ ব্যাপারে আমার খুবই আফসোস হয় যে, আমার কিতাবের অধ্যয়ন দ্বারা সঠিক প্রভাব গ্রহণ করা হয়নি যা কিতাবটির সঠিক মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ ছিলো।

এখানে যাকিছু পেশ করা হলো নিম্নলিখিত হাদীসগুলো তার প্রমাণ। তবে আফসোস যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানের মান-মর্যাদার হিফাজত

মুসলমানের ইজ্জত এর ওপর অযথা হামলা করা অথবা তার ধারণা প্রসূত দোষসমূহ সবার সামনে উৎসাহের সাথে পেশ করা—কিংবা বদনাম করে জনসমক্ষে তাকে অপদস্থ করা আল্লাহ ও রসূলের দৃষ্টিতে একটি নিকৃষ্টতম অপরাধ এবং মুসলমান ভাইয়ের ওপর মস্তবড় যুলুম এর স্বপক্ষে অনেক রেওয়ায়েত এবং হাদীসমূহ পেশ করা জরুরী নয়, বরং একটি হাদসীই যথেষ্ট। হাদীসটি হলো ঃ

ان دماء كم واموالكم واعرامنكم عليكم حرام

তবে মুসলমানের ইজ্জত রক্ষার যে শরীয়তী মর্যাদা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করার জন্যে কিছু রেওয়ায়েত পেশ করা যথাযথ হবে। যাতে জানা যায় যে,

www.pathagar.com

মুসলমানের ইজ্জতের ওপর হামলা প্রতিহত করা প্রতিটি মুসলমানের দীনি দায়িত্ব কর্তব্য। আর এ দায়িত্ব পালন করার জন্য ওকালতী করার সনদ হাসিল করা জরুরী নয়। বরং অবাঞ্ছিতভাবে ওকালতী করে তা পালন করা যায়। আর এটা এমন কোনো কাজ নয় যে জন্য অন্য কাউকে অপবাদ দেয়া শরীয়ত ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে প্রশংসাযোগ্য কিংবা অনুমোদনযোগ্য হতে পারে।

এক ঃ

(١) عن اسماء بنت يزيد قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من ذب عن لحم اخيه بالمغيبة كان حقا على اللّه ان يعتقد من النار - بيهقى

"আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কোনো মুসলমান নিজের মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জতের ওপর হামলাকে (অবাঞ্ছিতভাবে ওকালতি) প্রতিহত করে, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা আল্লাহর উপর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।"

দুই ঃ

(٢) ما من مسلم يرد عن عرض اخيه الا كان حقا على اللّه ان يرد عنه نار جهنم يوم القيمة -

"কোনো মুসলমান এমন নেই যে, নিজের মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জতকে অপরের হামলা থেকে রক্ষা করলো অথচ আল্লাহ তায়ালার জন্য কিয়ামত দিবসে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা অপরিহার্য হবে না।"

তিন ঃ

(٣) ما من مسلم ينصر مسلما فى موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه الا نصره اللّه فى موطن يحب فيه نصرته -

"কোনো মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে যখন এমন ক্ষেত্রে সাহায্য করে যেখানে সে অপদস্থ ও বে-ইজ্জতি হয় তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন ক্ষেত্রে অবশ্যই সাহায্য করবেন যেখানে সে নিজের জন্য সাহায্য পেতে আগ্রহী হবে।"-(আবু দাউদ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সমস্ত বাণীর আলোকে যদি কোনো ন্যায়পরায়ণ বুযর্গ আমার পক্ষ থেকে মাওলানা মওদূদীর প্রতিরক্ষাকে শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করেন তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি

www.pathagar.com

ন্যায় ও ইনসাফের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অসুবিধা অনুভব করবেন না এবং অযাচিতভাবে ওকালতী করার যে অপবাদ আমার প্রতি আরোপ করা হয়েছে তারও কোনো মূল্য অনুমিত হবে না।

ত্রুটি অনুসন্ধান করার অভিযোগের জবাব

আমার পক্ষ থেকে এ অভিযোগের দু'টি জবাব আছে। একটি অস্বীকৃতি-মূলক অপরটি স্বীকৃতিমূলক। নীচে দু'টি জবাবই যথাক্রমে আলোচিত হলো ঃ

এক ঃ অস্বীকৃতিমূলক জবাব

আমার রচিত গ্রন্থ ইলমে জায়েযায় আমি কোনো বিষয়ে অবৈধভাবে মাওলানা মাদানী সাহেবের ত্রুটি সন্ধান করেছি বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা আমার মতে ঠিক নয় বরং সত্যের অপলাপ। ইলমী জায়েযায় হযরত মাওলানা মাদানী সাহেবের সমালোচনার জবাব আমি অবশ্যই দিয়েছি। তবে এ উদ্দেশ্যে আমি যা লেখেছি তার মধ্যে মাওলানার এমন কি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছি যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে নাজায়েয তা আমি বুঝতে পারছি না। সম্মানিত পর্যালোচক যেহেতু শব্দগুলো চিহ্নিত করেননি। সুতরাং আমি নিজেই সম্ভাব্য কতিপয় কথা চিহ্নিত করছি। সম্ভবত এসব কথাকেই তিনি ত্রুটি সন্ধানী বলে লক্ষ্য করে থাকবেন।

এক ঃ তন্মধ্যে প্রথম কথা—ইলমী জায়েজার ৪৯ পৃষ্ঠায় (তাত্ত্বিক পর্যালোচনা—৪২ পৃষ্ঠায়) আমি লিখেছি—

> "তবে পরিতাপের বিষয় হলো, আজকের দুর্ভাগ্য যুগে নিছক ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কেন্দ্র করে সাথে একে অপরকে ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ করে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। আরো মজার ব্যাপার হলো একেই দীনের সর্বোত্তম খেদমত বলে মনে করা হয়।"

অবৈধভাবে ত্রুটি সন্ধান বলতে যদি একথাটিই উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমি আরয করবো যে, এখানে তিনটি কথার উল্লেখ আছে। (ক) আজকের যুগের দুর্ভাগ্য হওয়া (খ) পদস্খলন বা ত্রুটি-বিচ্যুতির সাথে সম্পর্কিত করলেই একে অপরকে ইসলামী গণ্ডির থেকে বের করে দিতে চেষ্টা করা। (গ) আর একে দীনের খেদমত মনে করা। এ তিনটি কথার মধ্যে কোন্ কথাটি মাওলানা মাদানী সাহেবের ত্রুটি চর্চার সংজ্ঞায় পড়ে তা আমাকে বলে দিন। আজকের যুগ যদি কুলক্ষণের না হয় তবে কি এটা নেকী ও সৌভাগ্যের যুগ ? হযরত মাদানী সাহেবের ত্রুটি চর্চার কোন্ বিষয়টি এর মধ্যে আছে ? হযরত মাওলানা মাদানী সাহেব তার সমালোচনামূলক লেখায় কি মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে

www.pathagar.com

ইসলামীকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দিতে চেষ্টা করেনি ? তারপর একথাও বুঝতে পারছি না যে, এসব দীনের খেদমত করার অনুপ্রেরণায় যদি না করা হয়ে থাকে তাহলে আর কি অনুপ্রেরণা আছে যা মাওলানা মাদানী মরহুম সাহেবের মতো উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন লোককে এসব করতে অনুপ্রাণিত করে ?

দুই ঃ ইলমী জায়েজার ৬৮ পৃষ্ঠায় (তাত্ত্বিক পর্যালোচনা–৫৫ পৃঃ) অপর কথাটির উল্লেখ এভাবে হয়েছে ঃ

> "আলেমদের বিরোধিতা ও বৈরিতা থেকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হিফাজতে ও আমানতে রাখুন। এসব ভদ্রলোকগণ, যখন কারো বিরোধিতা ও শত্রুতায় কোমর বেঁধে লাগে তখন ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে ইমামগণও তাদের ফাসেক ও গোমরাহ হওয়ার ফতওয়া থেকে নিষ্কৃতি পান না।"

একথাগুলোতে যাকিছু উল্লেখ করা হয়েছে যদি ত্রুটি সন্ধান দ্বারা একথাগুলোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে আমার নিবেদন হলো—বাক্যে যেসব সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে তা আমার মতে ঐতিহাসিক সত্য। যারা উলামায়ে দীনের পারস্পরিক মতভেদের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক অবগত তারা একথা কস্মিনকালেও মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার দুঃসাহস করবে না। বর্তমান যুগে সৃষ্ট এসব মতভেদের বিস্তারিত বর্ণনা যদি কাগজের পাতায় লিখিত আকারে আসে তাহলে একটি মোটা গ্রন্থ তৈরি হয়ে যাবে। পরন্তু এ ধরনের মতপার্থক্যের দ্বারা দ্বীনের যতটা ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে অন্য কোনো ইসলাম বিরোধী পরিকল্পনা দ্বারা এতটা ক্ষতি হয়নি এবং কখনও হতে পারে না। আমি এটাও বুঝতে পারছি না যে, একথার মাধ্যমে আমি মাওলানা মাদানী সাহেবের কোন্ ধরনের নাজায়েয ত্রুটি চর্চা করেছি ?

তিন ঃ তৃতীয় কথাটি হলো গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠায় (তাত্ত্বিক পর্যালোচনা-৬০ পৃঃ) আমি ইসমতে আম্বিয়া সম্পর্কে লিখেছি—"ইসমতে আম্বিয়া প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে আলোকে যখন আমরা মাওলানা মরহুমের এ সমালোচনার ওপর চিন্তা-ভাবনা করি তখন আমরা এটাকে মাওলানার একটি কলমী লেখার ক্ষেত্রে পদস্খলন বলে মনে করি। এ ক্ষেত্রে তিনি নিজে মাসুমও ছিলেন না।"

এ বাক্যে আমি মরহুম মাওলানার সাথে একদিকে কলমী পদস্খলনের সম্পর্কিত করেছি এবং অপরদিকে তিনি নিজে তা থেকে নিরাপদ ও মাসুম ছিলেন না তা বলেছি। যদি নাজায়েয ত্রুটি চর্চা দ্বারা এ বিষয়টি বুঝানো হয়ে থাকে যেমন বাহ্যিকভাবে এটাই মনে হয়, তাহলে অনুরোধ হলো হযরত মাদানী সাহেব কি এ ধরনের পদস্খলন থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন, না এ

www.pathagar.com

ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি তার থেকে হওয়া সম্ভব ছিলো ? যদি মুক্ত ছিলেন বলে দাবী করা হয় তাহলে নিম্ন বর্ণিত প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়া অত্যন্ত জরুরী।

(ক) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত আকীদা হলো 'ইসমত' নবীগণের বিশেষ গুণ। অন্য কোনো মানুষ এ ব্যাপারে তাদের মতো নয়। এমনকি নবীর কোনো উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীও নয়। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ ধরনের পদস্খলন থেকে মাসুম ছিলেন, তার সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা আহলে হকদের সর্বসম্মত আকীদার পরিপন্থী নয় কি ?

(খ) তাছাড়া আহলে হকদের ব্যাখ্যানুযায়ী নবীদেরও ইজতিহাদী পদস্খলন হয়েছে যদিও সে পদস্খলন তাদের ইসমতের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এমতাবস্থায় হযরত মাদানী সাহেবকে কলমী পদস্খলন থেকে মাসুম বলে বিশ্বাস করা কি প্রকৃতপক্ষে তাকে নবীদের ওপর মর্যাদা দেয়ার নামান্তর নয় ?

(গ) তাঁর সম্পর্কে এরূপ আকীদা পোষণ করা কি আহলে হকদের এ সিদ্ধান্তের পরিপন্থী নয়। المجتهد يخطى وقد يصيب। মুজতাহিদ কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হন আবার কখনো ব্যর্থ হন অথবা হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে কি একথা বুঝতে হবে যে, তিনি উম্মতের সমস্ত মুজতাহিদের তুলনায় এমন উচ্চমর্যাদায় সমাসীন ছিলেন যে, তার দ্বারা কখনো কোনো ইজতিহাদী ও কলমী পদস্খলন সম্ভব ছিলো না ?

কিন্তু যদি তিনি এ ধরনের পদস্খলন থেকে মুক্ত না থাকেন তাহলে কলমী পদস্খলনের সাথে সম্পর্কিত করে এবং মাসুম মনে না করে আমি তার কোন্ ধরনের নাজায়েয দোষ চর্চা করেছি ? আর আমার এ কাজগুলো নাজায়েয দোষ সন্ধানের গণ্ডিতে কিভাবে আসতে পারে ? যদি এগুলোকে নাজায়েয দোষ চর্চা বলে সাব্যস্ত করা হয় তাহলে মুজতাহিদদের সাথে ভুলের সম্পর্ক দেখানো কিভাবে জায়েয মনে করা হবে ? পরন্তু নবীগণের ইজতিহাদী ভুল ও পদস্খলন হতে পারে এমন কথা যেসব আলেম পরিষ্কারভাবে লিখেছেন তাঁদের সম্পর্কে কি মত পোষণ করা হবে ? আমি স্বীকার করি হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেবের ভক্ত অনুরক্তগণ তাঁর সম্পর্কে ভালো ধারণার গভীর আবেগে আপ্লুত এবং এমনটি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমি (লেখক) নিজেও তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করার ক্ষেত্রে কারো চেয়ে পেছনে নেই। কিন্তু সুধারণা ও সম্মান প্রদর্শনের আবেগেরও একটি সীমা ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে যা অতিক্রম করা আল্লাহ ও রসূলের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র গর্হিতই নয় বরং ধ্বংসাত্মক এবং মারাত্মকও বটে। সুতরাং তাঁকে অতিমাত্রায় তাযীম করা

www.pathagar.com

ও মাত্রাতিরিক্ত মহব্বতের এমন প্রদর্শনী করা যে, তাঁকে কলমী ও ইজতেহাদী পদস্খলন থেকেও মাসুম ও নিরাপদ হিসেবে মেনে নেয়া—স্বয়ং তাঁর ভক্ত অনুরক্তদের জন্যেও কল্যাণকর নয়। বরং ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। এ কারণে এরূপ মাত্রাতিরিক্ত ও অতি মহব্বত ও তাযীম পরিহার করা অত্যন্ত জরুরী কাজ।

দুই ঃ স্বীকৃতিমূলক জবাব

কিন্তু তারপরও যদি দোষ চর্চার অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করা হয় তাহালে আমি বুযর্গদের খেদমতে আরয করবো যে, ধরে নিন আমি হযরত মাদানী রাহামাতুল্লাহ আলাইহির কোনো ত্রুটি বের করার জন্য চেষ্টা করেছি কিন্তু হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর দীনি তৎপরতা ও ইলমী খেদমতের বদৌলতেও যেভাবে আহলে ইসলামের কাছে সম্মানের যোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তেমনি মাওলানা মওদূদীও নিজের দীনি কর্মতৎপরতা ও ইলমী খেদমতের বদৌলতে আহলে ইসলামের কাছে কিছুমাত্র কম সম্মানের যোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তাহলে মাওলানা মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একটি সাধারণ ত্রুটি উল্লেখ করা যেমনি বুযর্গদের কাছে বরদাশতের মত নয় তেমনি ইনসাফের দাবী হলো মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ক্ষেত্রেও খারেজী, মুতাযেলী, ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী, বিভ্রান্তকারী ইত্যাকার জঘন্য অপবাদের লক্ষ্যস্থল না হওয়া উচিত। বরং ন্যায়পরায়ণ আলেম ও মাশায়েখদের নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য হওয়া উচিত ছিলো এ ধরনের অপবাদ বরদাশত না করা। এখন যেসব বুযর্গ হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ওপর আমার সামান্যতম ত্রুটি আরোপের (স্বকপোলকল্পিত) দরুন মনে নিদারুণ আঘাত, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পেয়েছেন তারা আমাকে একথা জিজ্ঞেস করতে অনুমতি দিবেন কি যে, মাওলানা মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মাওলানা মওদূদীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহির প্রতি যে জঘন্য অপবাদ আরোপ করেছেন এবং তা অদ্যাবধি তাঁর লেখায় বিদ্যমান এবং এর ভয়াবহতা আমার ত্রুটি ধরার চেয়ে সহস্রগুণ বেশীও বটে। এমতাবস্থায় এসব বুযর্গ কি সারা জীবনে কখনো একটি মুহূর্তের জন্যেও চিন্তা করে দেখেছেন যে, হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আরোপিত অপবাদ ও অভিযোগগুলো সত্যিই ঠিক না বেঠিক। এমনিভাবে তাদের মন-মস্তিষ্কে ঘুণাক্ষরেও কি এ চিন্তা কখনো এসেছে যে, এ ধরনের জঘন্য অপবাদ ইসলামের একজন খাদেম এবং আলেমে দীনের ইজ্জতের ওপর অন্যায় হামলা বৈ আর কিছুই নয় এবং এরূপ তৎপরতার দ্বারা স্বয়ং দীন ও আহলে দীনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকে। তারপর এরূপ জঘন্য অপবাদের পর্যালোচনা তো দূরের কথা দীনের স্বার্থের খাতিরে অথবা

www.pathagar.com

মুসলমানের ইজ্জতের শরীয়তী মর্যাদা রক্ষার খাতিরে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাহেবের কাছে এ বিষয়ে কখনো কিছু লেখার কষ্ট স্বীকার করেছেন কি ? যদি এসব প্রশ্নের উত্তর না-বোধক হয় এবং অবশ্যই না-বোধক, তাহলে অবশেষে আমার এ সাধারণ ঠোঁট নাড়ায় অথবা আপনাদের কথানুযায়ী ত্রুটি সম্পর্কে লম্বা লম্বা ব্যাখ্যা বিবৃতি লেখার কষ্ট স্বীকার করার হেতু কি ? কর্মপদ্ধতির এ বৈপরীত্য কোনো সচেতন লোকের কাছে গোপন থাকতে পারে কি ? কোনো একজন কবির একটি কবিতা এখানে খুবই মানান সই হবে ঃ

আমি 'আহ্' করলেই হয়ে যাই বদনাম,
তিনি 'কতল' করলেও হয় না তার চর্চা।

বুযর্গের কাছে ইনসাফের দাবী যদি এভাবে উপেক্ষিত হতে থাকে তাহলে অন্যদের দ্বারা ইনসাফ পদদলিত হলেও কোনো অভিযোগ না করা উচিত। তারপর যখন আল্লাহর নিরপেক্ষ ইনসাফ ভিত্তিক আদালত কায়েম হবে যেখানে كُوْنُوا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ এবং لَايَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلٰى اَنْ لَاتَعْدِلُوْا আয়াতদ্বয়ের অধীনে যেসব মহোদয়কে অত্যন্ত কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, জানি না, আমাদের এসব মহারথীগণ তখন তার কি জবাব দিবেন ?

এতোক্ষণ পর্যন্ত যাকিছু পেশ করা হয়েছে তা আমার বইয়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অথবা আমার প্রতি আরোপিত অপবাদের ব্যাখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট। নিম্নে তাফহীমাতের যে বাক্যের ওপর অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে তার জবাব পেশ করছি। এটাকে আমি ব্যাখ্যার তৃতীয় অংশ শিরোনাম উল্লেখ করবো।

ব্যাখ্যার তৃতীয় অংশ

তাফহীমাতের বাক্যের 'ইলমী জায়েজায়' পেশকৃত ব্যাখ্যা যেমন হতে পারে তেমনি এমন ব্যাখ্যাও করা সম্ভব যার ভিত্তিতে একজন সত্যিকার আশেকে রসূলের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদীকে শিষ্টাচার বর্জিত ও ধর্মীয় বিধিবন্ধন থেকে মুক্তও মনে করা যাবে।

ব্যাখ্যাটিকে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

ব্যাখ্যা

তাফহীমাতের বাক্যে 'ইসমত' শব্দ দ্বারা মাওলানার উদ্দেশ্য হলো কুফর, মিথ্যা এবং সমস্ত কবীরা ও সগীরা গোনাহ থেকে পবিত্র থাকা। লগজিশ শব্দ দ্বারা সমস্ত কবীরা গোনাহকে বুঝানো হয়েছে। এমন কি সাধারণ মন্দ কাজ-

www.pathagar.com

সমূহও এর অন্তর্ভুক্ত। মাওলানার মতে এ ধরনের ইসমত নবুয়াতের জন্যে অপরিহার্য। এবং সূক্ষ্ম বিষয় হিসেবে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবী থেকে এ ইসমত সাময়িকভাবে উঠিয়ে নিয়ে তাঁর থেকে দু' একটি লগজিশ বা পদস্খলন ঘটার অবকাশ দিয়েছেন। যেহেতু বিচ্যুতির মধ্যে কুফর, মিথ্যা এবং সমস্ত কবীরা ও সগীরা গোনাহও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এর অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে এই যে ঃ

(ক) "প্রত্যেক নবী সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর আকীদা হলো নবুয়াতের পর তাদের দ্বারা কুফরী, মিথ্যা, সব রকমের কবীরা ও সগীরা গোনাহ্ কেবল সংঘটিত হতে পারে তাই না বরং দু' এক বার সংঘটিত হয়েছেও (নাউযুবিল্লাহ)। এমন আকীদা পোষণ করা অবশ্যই ইলহাদ বা নাস্তিকতার নামান্তর এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতের সরাসরি খেলাফ।"

(খ) অধিকন্তু এ ইসমত যেহেতু নবুয়াতের অপরিহার্য দিক। সুতরাং দু' একবার এ ইসমত লোপ পাওয়াতে নবুয়াতের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকবে না। কেননা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের অবর্তমান বিশেষ বৈশিষ্ট্যও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। কিংবা ইসমত প্রমাণিত হবে। কারণ, বিশেষ অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্বও প্রমাণিত হবে। এভাবে পদস্খলন হওয়ার সময় দু'টি পরস্পর বিরোধী বস্তুর একত্রিত হওয়া (নবুয়াত থাকা এবং না থাকা, অথবা ইসমত হওয়া না হওয়া) আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আর এটা বুদ্ধিমান লোকদের কাছে অসম্ভব ব্যাপার।

জবাব

ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির তাফহীমাত গ্রন্থের একটি বিরুদ্ধ বাক্যের আরোপিত অভিযোগ। এ দ্বারা মাওলানা মওদূদীকে ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী রূপে প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য বলে বাহ্যত মনে হয়। অথবা যেসব ব্যক্তিবর্গ মাওলানার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আরোপ করেছেন তাদের এ অভিযোগ সঠিক প্রমাণ করার একটা প্রয়াস মাত্র। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজে এর জবাব পেশ করেছেন সেটিই এর সঠিক ও যুক্তিসংগত জবাব। কেননা, কথায় বলে ঃ صاحب البيت ادرى بما فيه ঘরের অবস্থা ঘরের মালিকই ভালো জানে। আলেম মহলে প্রথম থেকেই সর্বজন স্বীকৃত একটি রীতি প্রচলিত আছে। তাহলো শিক্ষাদানকালে প্রত্যেক গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বক্তব্যের পূর্বাপর প্রসঙ্গ, গ্রন্থকারের নিজের ব্যাখ্যা এবং আরো অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ের সাহায্য নেয়া হয়ে থাকে। এসব বিষয়কে সামনে রেখেই শিক্ষাদানের

www.pathagar.com

সময়ে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। অতএব, আমিও এসব বিষয় সামনে রেখেই তাফহীমাতের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে থাকি যে, এ ধরনের বিশ্লেষণের অবকাশ এ বাক্যে আরো আছে কিনা। এর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন কতটুকু যথার্থ হতে পারে ?

এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে যেসব বিষয় উল্লেখ করে যে ফলাফল গ্রহণ করা হয়েছে তার ভিত্তি হলো এই যে, ইসমত শব্দের অর্থ ধরে নেয়া হয়েছে কুফর, মিথ্যা এবং সমস্ত কবীরা ও সগীরা গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়া এবং লগজিশ বা বিচ্যুতি শব্দ দ্বারা কুফর, মিথ্যা অথবা কবীরা ও সগীরা গোনাহ। এজন্যে আমি আমার জবাবে এসব মৌলিক অনুমান সম্পর্কে আলোকপাত করবো এবং ইসমতও লগজিশ শব্দদ্বয়ের এ আনুমানিক অর্থ হতে পারে কিনা। তাফহীমাতের বাক্য দ্বারা এ অর্থ বুঝানো হয়নি—একথা যদি দলীল দ্বারা প্রমাণ করতে পারি তাহলে স্বতই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, মাওলানার আকীদা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা ঠিক নয় বরং সম্পূর্ণ ভুল।

নিম্নে অনুমানের দু'টি জবাব পেশ করা হচ্ছে ঃ একটি পাল্টামূলক অপরটি ব্যাখ্যামূলক।

পাল্টা অভিযোগমূলক জবাব

উপরোল্লেখিত আনুমানিক ব্যাখ্যার জবাবে প্রতমত আরয হলো যেসব বুযর্গান এ ব্যাখ্যা দিয়েছে তাঁরা নিজেরাও আমার ব্যাখ্যার মতোই মাওলানা মওদূদীর বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যা করার জন্যে মাওলানা তাদেরকে উকীলও বানাননি এবং স্বাধীনতাও দেননি। আমার বর্ণিত ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মাওলানার সত্যায়নের সিলমোহর না থাকার কারণে তাঁরা যেভাবে ব্যাখ্যাটিকে আহ্‌লে ইলমদের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন, ঠিক সেভাবেই তাদের ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কেও মাওলানা মওদূদী সাহেবের সত্যায়নের সিলমোহর না থাকার কারণে সেটাকেও আহলে ইলমদের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য বলে কি ঘোষণা করা যায় না ? পার্থক্য করার জন্য কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকলে তা অবহিত করবেন।

তারপর অযাচিতভাবে ওকালতী করা কিভাবে তাদের জন্যে জায়েয হতে পারে যখন তাদেরই ফায়সালা অনুযায়ী আমার জন্য এ ধরনের ওকালতী করা জায়েয নয় বরং ভৎর্সনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ? যে কাজ আমার জন্য মুসলমানের মান-ইজ্জত রক্ষার উদ্দেশ্যে হয়েও অপসন্দনীয় ছিলো সে কাজটিই বুযর্গদের জন্যে পীরের অপবাদকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য কেবল পসন্দনীয় বলেই গণ্য হয়নি বরং ইবাদাত ও সওয়াবের কাজ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

www.pathagar.com

এর তাৎপর্য কি এটাই বুঝতে হবে ? তোমার অলক স্পর্শে ধন্য হলেই তার উত্তরণ ঘটে অনুপম সৌন্দর্য হিসেবে, আর সেই বস্তুই আমার বেলায় হবে কুৎসিত কদর্য জানি না এটাই ইনসাফের দাবী কিনা ? নাকি এসব কিছু শুধু মনের আবেগ শান্ত করার অভিপ্রায়ে করা হচ্ছে না কি কারো সন্তুষ্টি অর্জনের উপকরণ মাত্র ?

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা তাফহীমাতের বাক্যের যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে মাওলানা মওদূদীর আকীদার ওপর জঘন্য হামলা করেছেন, আহলে সুন্নাতদের ইসমতে আম্বিয়া সম্পর্কিত কিতাবসমূহের সমস্ত বাক্যেরও হুবহু এরূপ ব্যাখ্যা করা যায়। এর ওপর ভিত্তি করে মাওলানা মওদূদীকে আকীদার ওপর যেভাবে হামলা করা হয়েছে সেভাবে আহলে সুন্নাতদের আকায়েদের ওপরও হামলা করা যায়। কথাটিকে এভাবে পরিষ্কার করা যায়। গোটা আহলে সুন্নাত মহল একদিকে ইসমতকে আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের বিশেষ গুণে এবং নবুয়াতের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে এ আহলে সুন্নাতগণই নবীগণ কর্তৃক লগজিশ বা ত্রুটি হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন ঃ وفيها قسم اخر يسمى بالزلة (এর মধ্যে আর এক প্রকার ত্রুটি আছে যাকে যাল্লাত বা পদস্খলন বলে) তাফহীমাতের বাক্যের মতো এখানেও বলা যায় যে, ইসমত দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো কুফর, মিথ্যা এবং অন্যান্য কবীরা গোনাহ থেকে ইসমত। লগজিশ শব্দ দ্বারাও উদ্দেশ্য সাধারণভাবে কুফর ও মিথ্যার লগজিশ অথবা কবীরা ও সগীরা গোনাহর লগজিশ হতে পারে। আর একথা দিবালোকের মতো সত্য যে, পদস্খলন হওয়ার সময় ইসমত অবশিষ্ট থাকতে পারে না। যার অনিবার্য ফল এখানেও এটাই হবে। পদস্খলন হওয়ার কথা স্বীকার করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ নবীগণ কর্তৃক কুফর, মিথ্যা এবং সব ধরনের কবীরা গোনাহ হওয়া স্বীকার করে নিয়েছেন। অথচ এমন কথা ইসমতের ব্যাপারে খোদ তাঁদের মতেরও প্রকাশ্য বিরোধী। পরন্তু এটা নাস্তিকতারও বহিঃপ্রকাশ। তবে কি ব্যাখ্যাকারী বুযর্গ এখানেও তাফহীমাতের বাক্যের ব্যাখ্যার মতো ব্যাখ্যা গ্রহণ করে আহলে সুন্নাতদের নাস্তিক হওয়ার ফতওয়া দিবেন ? নাকি এ ফতওয়া বিশেষভাবে শুধু মাওলানা মওদূদীর জন্যেই তৈরি হয়েছিলো ?

অধিকন্তু তাদের মতেও যখন ইসমত নবুয়াতের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এবং পদস্খলন ঘটলে সে ইসমত থাকে না তখন তা তাদের স্বীকৃত যুক্তিতেও স্ববিরোধিতার (নবুয়াত হওয়া না হওয়া অথবা ইসমত হওয়া না হওয়া) সমানভাবে বিদ্যমান থাকে যা সকল জ্ঞানীর কাছেই অসম্ভব ব্যাপার।

انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم ، يا ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم

www.pathagar.com

অতএব, যে জবাব আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে হবে মাওলানা মওদূদীর পক্ষ থেকেও সেই একই জবাব হবে।

বিশ্লেষণমূলক জবাব

উল্লেখিত বিশ্লেষণের জবাব হলো, তাফহীমাতের বাক্যের এ ধরনের ব্যাখ্যা করার কোনো অবকাশ আদৌ নেই এবং বাক্যেকে এ অর্থের ধারক হিসেবে কখনো গ্রহণ করা যায় না। এ দাবীর সমর্থনে আমাদের কাছে নিম্ন বর্ণিত দলীলগুলো আছে ঃ

(১) তাফহীমাতের বাক্যে উল্লেখিত লগজিশ প্রকৃতপক্ষে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের একটি ত্রুটির সাথে সংশ্লিষ্ট যা মাওলানা মওদূদীর ভাষ্যানুযায়ী শুধু এতোটুকু যে, তিনি একটি লোকের স্ত্রীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার প্রস্তাব করেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এ ধরনের প্রস্তাব করা সাধারণভাবে কোনো দোষণীয় ব্যাপার হিসেবে মনে করা হতো না। ইতিহাস থেকেই এ বিষয় জানা যায়। এ ত্রুটিকেই তাফহীমাতের গ্রন্থের লগজিশ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। ইসমতের সম্পর্কও এ ধরনের ত্রুটি এবং লগজিশের সাথেই। এ সত্য সামনে রেখে কোনো ন্যায়পরায়ণ লোক কিভাবে একথা বলতে পারে যে, তাফহীমাতের বাক্যের ইসমত ও লগজিশ শব্দদ্বয়কে কুফর, মিথ্যা অথবা অন্যান্য কবীরা গোনাহের সাথে সম্পর্কিত করতে পারে তা বুঝতে পারছি না। এ ইসমত যখনই কোনো নবী থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে তখনই তাঁর থেকে কুফর, মিথ্যা এবং অন্যান্য গোনাহ অনিবার্যরূপে সংঘটিত হয়ে থাকবে। কেননা, এটা ইসমতের একটা সাময়িক রহিতকরণ যার কারণে নবীগণ কর্তৃক শুধুমাত্র উত্তম কাজ পরিত্যাগ করার ত্রুটি সংঘটিত হয়। ইসমতের সঠিক সার্বিক রহিতকরণ নয় যার পরিণতিতে (মায়াযাল্লাহ) কুফর, মিথ্যা অথবা অন্যান্য কবীরা গোনাহ সংঘটিত হতে পারে। সুতরাং তাফহীমাতের বাক্য দ্বারা স্পষ্টভাবে এ বিষয়টি জানা যায় যে, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের এটা একটা বিচ্যুতি এবং উত্তম কাজ পরিহার করা ভুল প্রকৃতির একটি লগজিশ যা মানবসূলভ স্বভাবের কারণে তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো। আম্বিয়ায়ে কিরাম যদিও সাধারণভাবে এ ধরনের বিচ্যুতি থেকেও মুক্ত তথাপি কোনো কোনো সময় এ ইসমত রহিত হওয়ার পরিণতিতে এ ধরনের দু' একটি পদস্খলন ঘটে যায় যাতে লোকেরা তাদের আল্লাহ মনে না করে। এমনিভাবে লগজিশ বা বিচ্যুতি শব্দ দ্বারা উত্তম কাজ না করার পদস্খলন উদ্দেশ্য হবে, কুফর অথবা কবীরা গোনাহ করার পদস্খলন নয়। অনুরূপভাবে ইসমত শব্দ দ্বারাও উত্তম কাজ পরিহার করা থেকে ইসমত বুঝাবে। অতএব, লগজিশ দ্বারা কুফর মিথ্যা এবং অন্যান্য কবিরা গোনাহ করা

www.pathagar.com

লগজিশ উদ্দেশ্য হওয়ার যে দাবী ব্যাখ্যাকারী করেছেন তা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে ইসমত শব্দ দ্বারা নবীদের থেকে দু' একবার এ ইসমত উঠিয়ে নিলে পরিণামে তাদের দ্বারা কুফর, মিথ্যা অথবা অন্যান্য কবিরা গোনাহ অপরিহার্যরূপে সংঘটিত হওয়ার অর্থ গ্রহণ করা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। তাফহীমাতের উদ্দেশ্য এটা হতে পারে না।

ইসমত রহিত করার প্রয়োজনীয়তা

মুহতারাম বুযর্গের বাণী হলো, উত্তম কাজ পরিহার তো নবুয়াতের পরিপন্থী নয়। তবুও 'ইসমত' উঠিয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয়তাই বা কি ? জবাবে আরয করবো যে, ইসমতে আম্বিয়ার ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর উচ্চ চিন্তাধারা মূলত হৃদয়ংগম করতে সক্ষম না হওয়ার কারণেই তাদের এ সন্দেহের উদ্রেক করেছে। অন্যথায় এ ধরনের সন্দেহের সম্মুখীন তারা কখনো হতো না। ইসমতে আম্বিয়া সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উন্নত ধারণা তাঁর লেখনীর আলোকে যা জানা যায় তাহলো মাওলানা রাহামাতুল্লাহ আলাইহির নবীদেরকে উত্তম নয় এমন কাজে থেকেও সর্বাবস্থায় মাসুম বলে বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, নবীদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কড়া প্রহরায় রাখা হয় যে, তাদের দ্বারা অধিকাংশ সময় উত্তম কাজ বিরোধী কোনো কাজ সংঘটিত হতে পারে না। তবে কখনো এ প্রহরা তুলে নেয়া হলে মানবসূলভ স্বভাবের কারণে হঠাৎ এ ধরনের কাজ তাদের দ্বারা ঘটে যায়। ইসমতের এ আংশিক রহিত করণের প্রয়োজনীয়তা এজন্যে দেখা দেয় যে, এটা রহিত হওয়া সত্ত্বেও উত্তম কাজ বিরোধী কোনো কাজও তাদের দ্বারা ঘটতে পারে না যেমনি অন্যান্য গোনাহের কাজ তাদের দ্বারা আদৌ হতে পারে না। পরস্পর বিরোধী দু'টি জিনিস একত্র হওয়ার জটিলতার কথা বলা হয়েছে তার জবাব হলো ইসমত দু' রকম। একটি হলো কুফর, মিথ্যা এবং অন্যান্য কবীরা গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে লাভ হয়। দ্বিতীয়টি সাধারণ উত্তম কাজগুলো পরিত্যাগ করা থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে হাসিল হয়। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে নবুয়াতের জন্যে প্রথম প্রকারের ইসমত হওয়া অপরিহার্য এবং তিনি এ ধরনের ইসমত উঠে যাওয়ার সমর্থক আদৌ নন। তাই পরস্পর বিরোধী জিনিস একত্রিত হওয়ার জটিলতাও দেখা দেয় নাই, যে ইসমত দু' একবার উঠিয়ে নেয়া হয়েছে তা দ্বিতীয় প্রকারের ইসমত। এ ধরনের ইসমত কেবলমাত্র মাওলানা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতেই নয় বরং গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতেও নবুয়াতের জন্য অপরিহার্য নয়। (অর্থাৎ এ ধরনের ইসমত নবুয়াতের অবিচ্ছিন্ন অংগ নয়)। পরিশেষে ভাববার কথা হলো, একদিকে যখন গোটা আহলে সুন্নাতগণ ইসমতকে নবুয়াতের

অপরিহার্য এবং নবীগণের বিশেষ গুণ হিসেবে গ্রহণ করেন, অন্যদিকে তাঁদের কাজে পদস্খলন (যাল্লাত) আছে একথাও স্বীকার করেন। وفيها قسم اخر يسمى بالزلة ইসমত দ্বারা যদি তার উদ্দেশ্য হয় সাধারণ ইসমত কিংবা 'যাল্লাত' থেকে ইসমত তাহলে তিনি এর সমর্থক কিভাবে হবেন যে, নবীদের কাজে লগজিশ পাওয়া যায় ? কেননা, পদস্খলন হওয়ার সময় ইসমত উঠে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। তখন তাদের সে কথারও পরস্পর বিরোধিতা (নবুয়াতের হওয়া না হওয়া অথবা ইসমত হওয়া না হওয়া) অনিবার্যরূপে দেখা দিবে যা জ্ঞানবানদের কাছে অসম্ভব। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে, যে ইসমত তাঁর মতে নবুয়াতের জন্যে অপরিহার্য তাহলো কুফর, মিথ্যা এবং সাধারণভাবে কবীরা ও সগীরা গোনাহ্ থেকে পবিত্র থাকা এবং এ ইসমত তাঁর মতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। আর যে ইসমত পদস্খলন হওয়ার সময় উঠে যায় তা উত্তম বিরোধী কাজ থেকে মুক্ত থাকা এবং এ ধরনের ইসমত নবুয়াতের জন্যে অপরিহার্য নয়। অতএব, পরস্পর বিরোধী বিষয় একত্রিত হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

দ্বিতীয় দলীল

পর্যালোচনাকারী বুযর্গের ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমাতের বাক্যের অবকাশ না থাকার দ্বিতীয় দলীল হলো মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির নবুয়াতের পদমর্যাদা এবং রিসালাতের তাৎপর্য সম্পর্কে নিজের যে পবিত্র ও উন্নত ধারণা পেশ করেছেন এবং ইলমী জায়েযার ৯৬ পৃষ্ঠা থেকে ১০৫ পৃষ্ঠা তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ৭১পৃঃ-৭৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে বিস্তৃত বক্তব্য ছড়িয়ে আছে সেগুলো সামনে রেখে কোনো সত্যপ্রিয় ও নিষ্ঠাবান আলেম মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে এ ধারণা পর্যন্ত মনে স্থান দিতে পারেন না যে, তিনি কোনো নবীকে (মায়াজাল্লাহ) কুফর, মিথ্যা অথবা কোনো প্রকার কবীরা ও সগীরা গোনায় লিপ্ত বলে মানতে পারেন অথবা (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই) কোনো নবীর মন্দকাজে লিপ্ত হওয়ার কথা বলতে পারেন। নবীগণ জন্মলগ্ন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ পর্যবেক্ষণের অধীনে থাকেন এবং তাঁর বিশেষ তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ লাভ করেন, এমনকি নবুয়াতের মর্যদায় অভিসিক্ত হওয়ার আগেই তাঁরা নৈতিক দোষ-ত্রুটি গোমরাহী এবং ভুল কাজ থেকে নিরাপদ থাকেন এবং তাঁদের পা সত্য পথ থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুতি হতে পারে না। নবীদের সম্পর্কে যিনি এমন আকীদা পোষণ করেন তার সম্পর্কে একজন আল্লাহ ভীরু মু'মিন এবং ন্যায়-পরায়ণ মানুষ কেমন করে এমন চিন্তা করতে পারেন যে, তিনি (মায়াজাল্লাহ) নবীগণকে কুফর, মিথ্যা অথবা অন্যান্য কবীরা ও সগীরা গোনায় লিপ্ত বলে

www.pathagar.com

মনে করেন ? আমার মতে এমন একজন আলেমে দীন যাঁর সারা জীবন ইসলামের খেদমত এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্বের হিফাজত এবং তাদের মিশনকে সফল করার আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যয় হয় অথবা সে উদ্দেশ্য উৎসর্গীকৃত তাঁর বিরুদ্ধে এ অপবাদ আরোপ করা তো দূরের কথা একজন নগণ্য মুসলমানের বিরুদ্ধেও এ ধরনের অপবাদ আরোপ করা মা-বোনকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয়ার চেয়েও জঘন্য। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ভীতি আছে এবং সাথে সাথে এ সত্যের ওপরও বিশ্বাস আছে যে, দুনিয়ার দিন কয়েকের জীবন আসল জীবন নয় বরং ক্ষণস্থায়ী এবং এখানে মানুষ যাকিছু করবে মৃত্যুর পর আল্লাহর দরবারে সে জন্য পুরাপুরি জবাবদিহি করতে হবে, তাদের কাজ এমন ধরনের হতে পারে না। তবে যারা প্রথম থেকেই মনস্থির করে নিয়েছে যে, আমাদের নিজেদের উস্তাদ ও পীর বুযর্গগণ কর্তৃক আরোপিত অপবাদ ও ফতওয়া যে ধরনেরই হোক না কেন সেগুলোকে সঠিক প্রমাণ করে দেখাবার জন্যে আমরা সদা সচেষ্ট ও ব্যতিব্যস্ত থাকবো যদিও তাতে আমাদের নিজেদের এবং আমাদের প্রিয় দীনের অপূরণীয় ক্ষতি হয় তাহলে তারা অসহায় ও অপরাগ। পর্যালোচনাকারী বুযর্গ সম্পর্কে যেহেতু আমি ভালো করে জানি যে, তিনি একজন আল্লাহভীরু মানুষ এবং প্রথম শ্রেণীর লোকদের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই তার এ ধরনের কথা আমি তার মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে করি। যদি তিনি খারাপ মনে না করেন, তাহলে তার প্রতি আমার পরামর্শ হলো তিনি যেন নিজের পবিত্রতাকে অন্যান্য লিডার প্রকৃতির লোকদের মতো এ ধরনের কথা দ্বারা কুলষিত না করেন এবং মাশায়েখদের ব্যাপারে কুরআনের এ অমূল্য নসীহত মেনে চলেন।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

তৃতীয় দলীল

তাফহীমাতের বাক্যে এ ধরনের ব্যাখ্যার অবকাশ না থাকার তৃতীয় দলীল হলো মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইসমতে আম্বিয়া সম্পর্কে তার বিভিন্ন লেখায় এ আকীদা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, নবীগণ মাসুম এবং ইসমত তাদের বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য আর প্রথম থেকেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ আকীদা পোষণ করে আসছে। মাওলানা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে সবাই জানে যে, তিনি লিডার প্রকৃতি সম্পন্ন আলেমদের মতো নন যে, এক জায়গায় এক রকম বলেছেন এবং অন্য জায়গায় আরেক রকম বলেছেন। অথবা আজ কোনো মাসয়ালার রায় একভাবে

www.pathagar.com

পেশ করেছেন কাল কোনো চাপের মুখে কিংবা কোনো লোভ কিংবা কোনো স্বার্থের খাতিরে সে মাসয়ালার ব্যাপারে ভিন্ন রকম রায় পেশ করেছেন। সুতরাং ইসমতে আম্বিয়ার ব্যাপারে যখন তিনি এক বার গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইজমা ভিত্তিক ও সর্বসম্মত আকীদা মুতাবিক নিজের সার্বিক আকীদার ঘোষণা করলেন তখন তাফহীমাতের আলোচ্য বাক্যের মধ্যে এমন ব্যাখ্যার অবকাশ কিভাবে থাকতে পারে যাতে ইসমতে আম্বিয়া প্রসংগে মাওলানার আকীদা তাদের আকীদার পরিপন্থী প্রমাণিত হবে যা এ মাসয়ালায় মাওলানা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

অতএব, পর্যালোচনাকারী বুযর্গের এ উদ্ভাবন সঠিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। তিনি উদ্ভাবন করেছেন যে, এ ব্যাখ্যার ফলশ্রুতিতে মাওলানা মওদূদী সাহেবের মতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যতো নবীর আগমন ঘটেছে (নবী আলাইহিস সালামসহ) তাদের প্রত্যেকের থেকে কোনো না কোনো সময় আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করে নিজ হিফাজতে উঠিয়ে নিয়ে দু' একটি কবীরা গোনাহ সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।-(পৃঃ ৬৪) এটা কোনো সঠিক উদ্ভাবন নয়। অনুরূপভাবে এ উদ্ভাবনী থেকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ফল তো হতে পারে কিন্তু তাফহীমাতের বাক্যে যে সঠিক ব্যাখ্যা রয়েছে তার ফল কখনো নয়। ওপরে বর্ণিত তিনটি দলীল থেকে এ বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

উল্লেখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বুনিয়াদ

তাছাড়া উল্লেখিত সিদ্ধান্তের ভিত্তি যেসব বস্তুর ওপর রাখা হয়েছে তা সবই কল্পনাপ্রসূত এবং এগুলোর নিজস্ব কোনো ভিত্তি নেই। তন্মধ্যে প্রথম বস্তু হলো তাফহীমাতের "প্রত্যেক নবী থেকে" শব্দ যাকে উল্লেখিত সিদ্ধান্তে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। অথচ আরবী পরিভাষায় ইস্তিগরাক যেভাবে কখনো প্রকৃত অর্থে হয়ে থাকে তেমনি পারিভাষিক অর্থেও হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে উর্দু ভাষার পরিভাষাও এর দু'টি প্রকার না হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরঞ্চ হাকীকি হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অতএব, প্রত্যেক নবী থেকে শব্দ দ্বারা ইস্তেগরাকে ওরফীর রীতি অনুযায়ী সেসব নবীগণ উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব যাদের পদস্খলনের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত নবীগণ নয়। উপরন্তু ইস্তিগরাকে হাকীকি উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভবও নয়। কেননা, ইস্তিগরাকে হাকীকির নিয়মানুযায়ী সমস্ত নবীদের লগজিশ বা ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সঠিক ও গ্রহণযোগ্য কোনো মাধ্যম পাওয়া সম্ভব নয়। এর জন্যে যদি কোনো সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হয় তাহলে সেটা একদিকে হতে পারে আল কুরআন, অপর দিকে রসূলের সুন্নাত। কিন্তু কুরআন মজিদে সমস্ত নবীদের উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

www.pathagar.com

مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ তাহলে কুরআনের মাধ্যমে সমস্ত নবীদের পদস্খলনসমূহ কিভাবে অবহিত হওয়া সম্ভব ? ঠিক তেমনি রাসূলের সুন্নাতও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। তাহলে সমস্ত নবীদের পদস্খলন সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী কিভাবে এ অবগতি লাভ করলেন ? সুতরাং প্রত্যেক নবী থেকে শব্দ দ্বারা ইস্তিগরাকে ওরফীর নিয়মানুযায়ী সেই নবীগণকেই বুঝানো হয়ে থাকে যাদের পদস্খলনের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। ইস্তেগরাকে হাকীকির নিয়মানুযায়ী সমগ্র নবীগণ নয়। এভাবে সমস্ত নবীদের প্রতি কবীরাহ গোনাহ সম্পর্কিত করা তো দূরের কথা পদস্খলনের সম্পর্ক প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। অপর যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো লগজিশ বা বিচ্যুতি শব্দ। এ বিষয়ে পূর্বেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পর্যালোচনাকারী বুযর্গ লগজিশ বা বিচ্যুতি শব্দটিকে সাধারণ অর্থে প্রয়োগ করেছেন যার কারণে কুফর, মিথ্যা এবং অন্যান্য সমস্ত কবীরাহ ও সগীরা গোনাহ শব্দটির অর্থের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে। অথচ আমরা প্রথমেই দলীলসহ প্রমাণ করেছি যে, লগজিশ শব্দটিকে সাধারণভাবে প্রয়োগ করার কোনো অবকাশ নেই। সতুরাং তাফহীমাতের বাক্যে ইস্তিগরাকে হাকিকীর নিয়মানুযায়ী সমস্ত নবী কর্তৃক দু' একটি কবীরা গোনাহ হয়ে যাওয়াকে সম্পর্কিত করার দাবী কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সর্বশেষ বিষয় ও তার জবাব

সমালোচক বুযর্গ তার অভিযোগের তালিকায় সর্বশেষ বিষয় হিসেবে যা সংযোজন করেছেন তাহলো ঃ

"মাওলানা মওদূদী প্রত্যেক নবী থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ইসমত ও হিফাজত উঠিয়ে নিয়ে দু' একটি পদস্খলন হওয়ার যে বিষয়টির স্বীকৃতি দিয়েছেন তাতে উদ্দেশ্য হলো এভাবে লোকেরা নবীদেরকে আল্লাহ মনে করবে না।" অথচ এ উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়নি। কেননা খৃস্টানগণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ ও আল্লাহর বেটা হিসেবে মেনে থাকে আর ইহুদীরা বলে উযাইর আলাইহিস সালাম আল্লাহর বেটা।

এ অভিযোগের সারকথা হলো, মাওলানা মওদূদীর এ ব্যাখ্যা ঠিক নয়। কারণ, পদস্খলন হওয়ার যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তা এভাবে অর্জিত হয়নি। কেননা, কোনো কোনো নবীকে আল্লাহ মনে করা হয়েছে যেমন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং উযাইর আলাইহিস সালামকে।

১. তাদের মধ্যে অনেকের কাহিনী আপনাকে বলা হয়েছে আর অনেকের কাহিনী বলা হয়নি।

www.pathagar.com

এটা কোনো নূতন অভিযোগ নয় বরং অনেক পুরাতন এবং বিরুদ্ধাচরণের প্রাথমিক যুগে অভিযোগকারীদের লেখায় এ অভিযোগ দেখা গেছে। কিন্তু যেহেতু এ ধরনের অভিযোগে কোনো ইলমী গুরত্ব অনুভূত হয়নি তাই আজ পর্যন্ত তার জবাবও দেয়া হয়নি। এখন যখন বিষয়টি আবার উত্থাপিত হলো তখন এর জবাব দেয়াও জরুরী বলে মনে হচ্ছে।

প্রথম জবাব

এ অভিযোগের জবাবে প্রথমত আরয হলো—কোনো কাজের জন্য যদি কোনো বস্তুকে চূড়ান্ত কারণ এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয় তাহলে তার অর্থ এ নয় যে, সেই বস্তুটি ঐ কাজের ব্যাপারে অনিবার্যরূপে বাস্তবেও কার্যকরী হবে। অন্য কথায় বলা যায় যে, বর্ণিত কারণ সঠিক হওয়ার জন্য উদ্দেশ্য অনুপাতে তা কার্যকরী হবেই এটা জরুরী নয়। উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হলে বর্ণিত কারণও ঠিক নয়। একথা বলা যাবে না। অন্যথায় কুরআনের অনেক কারণই সঠিক প্রমাণিত হবে না বরং বাতিল মনে হবে। নিম্নের দু'টি উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

এক ঃ কুরআনে নবী প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁদেরকে পুরোপুরি অনুসরণ করা হবে।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ-

"আমি রসূলদেরকে শুধু এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি যাতে আল্লাহর হুকুমে তাদের আনুগত্য করা হয়।" অথচ এ কারণ সম্পর্কে কেউ এ দাবী করতে পারবে না যে, রসূলদের প্রেরণের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা প্রত্যেক যুগে সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয়েছে। এবং সমস্ত আদম সন্তান প্রত্যেক যুগে নিজ নিজি রসূলদেরকে পরিপূর্ণ আনুগত্য করে চলেছে। কেউ কখনো তাদের বিরোধিতা করেননি। তবে কি কুরআনের এ কারণ বর্ণনা শুধুমাত্র এ জন্য ভ্রান্ত বলা হবে যে, এতে রসূল প্রেরণের বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি?

দুই ঃ একইভাবে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহর আহকাম ও নিদর্শনসমূহ বর্ণনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে যে, এভাবে লোকেরা হেদায়েত লাভ করবে এবং গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাবে।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ-

"এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য নিজের নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তারা হিদায়াত লাভ করতে পারে।"

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ لاَّتَضِلُّوْا

www.pathagar.com

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তাঁর আহকাম বর্ণনা করেন যেনো তোমরা গোমরাহ না হয়ে যাও।" এখানেও আহকাম বর্ণনা করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কেননা, অনেক লোক আল্লাহর ফরমান শুনবার পরও গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত আছে। হেদায়াতের আলো পায়নি। তাহলে কি কোনো ঈমানদার ব্যক্তি এ কারণ বর্ণনা সম্পর্কে একথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে যে, যেহেতু আহকাম বর্ণনা করার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো তা অর্জিত হয়নি। সুতরাং এ কারণও সঠিক নয় ? তাহলে তাফহীমাতে যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যে, এতে পদস্খলন সংঘটিত হওয়ার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো কোনো নবীর বেলায় সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে তাকে অনিবার্যরূপে ভ্রান্ত ঘোষণা করতে হবে ?

এর জবাবে বড়জোর যে কথা বলা যায় তাহলো—লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমস্ত লোক দ্বারা সাধিত হওয়া জরুরী নয় বরং সেসব লোকের জন্য জরুরী যারা সত্য গ্রহণ এবং হিদায়াত লাভ করার স্বাভাবিক যোগ্যতাকে নষ্ট করেনি এবং এসব লোক কখনো কোনো নবীকে খোদা বা খোদার বেটা বলে ঘোষণা করেননি বরং সমস্ত নবীকে তারা আল্লাহর বান্দা ও রসূল বলে বিশ্বাস করেছে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রেও তাফহীমাতের বর্ণিত কারণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে। অতএব কুরআনের এসব কারণ বর্ণনার মতই তাফহীমাতের কারণ বর্ণনাও আপত্তিযোগ্য হতে পারে না। ঠিক একথাটিই তাফহীমাতের কারণ নির্দেশের বেলায়ও বলা যায়। এতে একথাও বলা যায় যে, মাওলানার মতে সেসব লোক উদ্দেশ্য যাদের হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট হয়ে যায়নি। এবং এ প্রকৃতির লোকগণ কখনো কোনো নবীকে আল্লাহ বা আল্লাহর বেটা বলেননি। বরং সকল নবী সম্পর্কে তাদের আকীদা হলো ঃ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ "তারা আল্লাহর বান্দা ও রসূল।" তাহলে এ ধরনের লোকদের বেলায়ও তো তাফহীমাতের কারণ নির্দেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। অতএব, কুরআনে কারণ বর্ণনা মতো তাফহীমাতের কারণ বর্ণনাও আপত্তিকর হতে পারে না।

দ্বিতীয় জবাব

যেসব বুযর্গ তাফহীমাতের কারণ নির্দেশ সম্পর্কে উপরোক্ত অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তারা কখনো একথা চিন্তা করেননি যে, তাফহীমাতের বাক্যে পদস্খলন সংঘটিত হওয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাই উদ্দেশ্য কেবল সেইসব নবীর বেলাই প্রযোজ্য হবে যাদের পদস্খলন বা বিচ্যুতি হয়েছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও হযরত উযাইর আলাইহিস সালাম দ্বারা

www.pathagar.com

কখনো কোনো পদস্খলন হয়েছিলো সঠিকভাবে জানা যায়নি। অতএব, তাদের বেলায় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কেন এবং কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে?

শাফায়াতে কুবরার হাদীস

মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে শাফায়াতে কুবরা (হাশরের মাঠের সুপারিশ) সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বাহ্যতঃ মনে হয় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কোনো পদস্খলনই ঘটেনি। কারণ, এ হাদীসটিতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের একটি প্রতিনিধি দল নবীগণের দ্বারে দ্বারে ধরণা দিয়ে হিসাব শুরু করার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার আবেদন করবে। তখন আদম আলাইহিস সালাম থেকে আরম্ভ করে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত উলুল আযম নবীগণের সকলেই একের পর এক নিজ নিজ পদস্খলন ও ভুলের কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে ওজর আপত্তি পেশ করবেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একমাত্র নবী যিনি নিজের কোনো পদস্খলন হওয়ার ওজর পেশ না করে প্রতিনিধিকে এ বলে পরামর্শ দেবেন যে, لست هناكم ولكن ايتوا محمدا صلى الله عليه وسلم। "আমি শাফায়াত করার মতো মর্যাদা ও যোগ্যতার অধিকারী নই। আপনারা বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যান।"

এ হাদীসে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কোনো পদস্খলন বা বিচ্যুতির কথা বলা হয়নি। এর আপাত কারণ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, তাঁর দ্বারা কোনো বিচ্যুতি বা পদস্খলন সংঘটিত হয়নি। তাহলে অন্য নবীদের মত তিনিও তা উল্লেখ করতেন। তিনি যখন তা উল্লেখ করেননি তখন জানা গেলো যে, তার দ্বারা কোনো বিচ্যুতি সংঘটিত হয়নি। কিন্তু খৃষ্টানরা যেহেতু ভ্রান্ত কথা তার সাথে সম্পর্কিত করেছিলো। তাই তিনি এটিকে লজ্জাকর মনে করে শাফায়াত করতে অক্ষমতা প্রকাশ করবেন। এ বাস্তবতার আলোকে সমালোচক হযরতগণ যদি তাদেরই আপত্তি ঃ

"তাফহীমাতের বক্তব্য পদস্খলন ও বিচ্যুতির যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে তা হযরত ঈসার ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়নি।" সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন তাহলে হয়তো তারা নিজেরা দেখতে পাবেন যে, তাদের আপত্তি ও সমালোচনার কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ, তার যখন কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতিই হয়নি তখন তাঁর ক্ষেত্রে পদস্খলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

هذا ما عندى والعلم بالحقيقة لله العليم الخبير-

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—২

আপত্তি ও জবাবসমূহ প্রসংগ

এর আগে ১নং পরিশিষ্টটিতে ব্যাখ্যার প্রকাশিত অংশের জবাব লেখা হয়েছে। জবাবটি হলো ১৯৬৮ সনের জানুয়ারি সংখ্যায় তরজুমানুল কুরআনে 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে আমার রচিত "মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা" গ্রন্থ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জবাবে মাওলানা মওদূদী সাহেবের একটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ হঠাৎ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটি পাঠে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, "তাত্ত্বিক পর্যালোচনাতে" তাফহীমাতের বাক্যে আমার দেয়া ব্যাখ্যাকে মুহতারাম মরহুম মাওলানা সাহেব স্পষ্টরূপে অনুমোদন করেছেন। কারণ, মরহুম মাওলানা সাহেব আমার গ্রন্থের সাধারণ ব্যাখ্যা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে লিখেছেন ঃ "তাত্ত্বিক পর্যালোচনা" গ্রন্থের লেখক আমার লিখিত বাক্যের পূর্বাপর যে দলীল পেশ করেছেন এবং যেভাবে আমার বাক্য সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে আমার উদ্দেশ্য আয়নার মতো স্বচ্ছ হয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

তারপর সেই বিশ্লেষণ সম্পর্কে যে বিবৃতিদাতা বুযর্গ নিজের পক্ষ থেকে তাফহীমাতের বাক্য পেশ করে মুহতারাম মাওলানা সাহেবের ওপর অভদ্রতা, মযহাবের বন্ধন থেকে মুক্ত এবং ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী হওয়ার অপবাদ দেয়, একটি প্রশ্নের জবাবে ইসমতে আম্বিয়া প্রসংগ শিরোনামে রাসায়েল ও মাসায়েলের বিভাগে ১৯৬৮ সনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় তরজুমানুল কুরআনে মরহুম মাওলানা সাহেব এ বিষয়ে আরো অতিরিক্ত ব্যাখ্যাদান করেন। তাতে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হলো যে, অভিযোগকীরাগণ তাফহীমাতের বাক্যের ওপর আজ পর্যন্ত যতগুলো ধারণাপ্রসূত ব্যাখ্যা পেশ করে মুহতারাম মাওলানা সাহেবের ওপর অপবাদ আরোপ করেছেন তার সবগুলোই ভুল ও অনভিপ্রেত। আর "তাত্ত্বিক পর্যলোচনা" বইয়ের পেশকৃত ব্যাখ্যাই সঠিক ও নির্ভুল। মরহুম মাওলানা দু'টো জবাবেই এ ব্যাখ্যাকে অনুমোদন করেছেন। এখন আমরা দেখবো, যেসব ভদ্রমহোদয় তাদের সমালোচনামূলক লেখায় বার বার এ ধারণা ব্যক্ত করেন যে, "যদি মাওলানা মওদূদী সাহেব ইসমতে আম্বিয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতানুযায়ী নীতি গ্রহণের ঘোষণা করেন অথবা অন্ততঃ 'তাত্ত্বিক পর্যালোচনা' গ্রন্থে পেশকৃত তাফহীমাতের বাক্যের ব্যাখ্যাকে অনুমোদন করেন তাহলে জামায়াতে ইসলামী, মাওলানা মওদূদী ও ওলামায়ে কিরামের মধ্যে বিরাজমান

www.pathagar.com

মতভেদের চির অবসান ঘটবে অথবা যথেষ্ট পরিমাণে মতভেদ কমে যাবে।" তারা তাদের নিজেদের এ ধারণা প্রকাশে কতটুকু আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান এবং মাওলানা মওদূদী সাহেবের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার পরও তাদের ভবিষ্যত নীতির মধ্যে কি পরিবর্তন এসেছে ?

নিম্নে তরজুমানুল কুরআনের উদ্ধৃতিসহ মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেবের দু'টি জবাবই পেশ করা হচ্ছে।

একজন প্রশ্নকর্তা 'তাত্ত্বিক পর্যালোচনা' গ্রন্থ সম্পর্কে মুহতারাম মাওলানা সাহেবকে নিম্নোক্ত প্রশ্নটি করেন ঃ

প্রশ্ন

"মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের লিখিত সদ্য প্রকাশিত 'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা' গ্রন্থখানি আমি অধ্যয়ন করেছি। আল্লাহ চাহেত গ্রন্থটি সর্বদিক থেকে দলীল ভিত্তিক। যারা দৈবাৎ কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির মুখোমুখী হবে এতে তাদের ভুলের অবসান ঘটবে। কিন্তু একগুয়ে ও গোঁড়ামী লোকদের চিকিৎসা করা বড় মুশকিল। আমি কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে বইটি পড়ার জন্য দেই, তারা বইটি পড়ে আশ্বস্ত হয়। একজন মাওলানা সাহেব বইটি পড়ার পর বললেন, আমার সান্ত্বনা হয়ে গেছে; তবে একটি সন্দেহ রয়ে গেলো। সন্দেহটি হলো, মুফতী সাহেব যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাওলানা মওদূদী সাহেব তাঁর সাথে একমত নন। সে কারণেই তিনি বইয়ের কোনো অভিমত বা সত্যায়ন করেননি। আমি বললাম, যদি তার সম্মতি না থাকতো তাহলে প্রকাশক কেন বইটি প্রকাশ করলেন এবং বইটির ভূমিকাও লিখলেন ? অধিকন্তু তরজুমানুল কুরআন, এশিয়া সাময়িকীতে আইন গ্রন্থটির বিজ্ঞাপন দেয়া হলো কেন ? কিন্তু লোকটি বড়ই একগুয়ে। তার কথা, মাওলানা সাহেবের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও জামায়াতের কতিপয় লোকের ইচ্ছায় এটা হয়েছে। মাওলানা মওদূদী সাহেবের নিজের ইচ্ছা এটা ছিলো না। মৌলভী সাহেবের জিদ হলো, আপনার কথা ঠিক হলে চিঠি দ্বারা জেনে নিন। সুতরাং তার পীড়াপীড়ির কারণে এ কয়টি কথা লিখে আপনার খেদমতে পাঠালাম। এ ধরনের লোকদের আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে আপনি কয়েক লাইন লিখে দিলে ভালো হতো।

মুহতারাম মাওলানা সাহেব এ প্রশ্নের যে জবাব লিখে পাঠান তা আমরা নিম্নে পত্রস্থ করলাম ঃ

জবাব

যেসব মৌলভী সাহেব আপনাকে বলেছেন যে, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব তার গ্রন্থে আমার বাক্যাবলীর যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন

আমি নিজে তা অস্বীকার করেছি। এ কারণে আমি তার গ্রন্থের ভূমিকা লিখিনি এবং অনুমোদন দেইনি এবং বইখানার প্রকাশনা আমার অমতে হয়েছে। তারা আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। বিস্ময়ের কথা হলো, এমন স্পষ্ট ও সর্বৈব মিথ্যা কথা বলতে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা আবার আরবী মাদ্রাসায় আছে এবং আলেমদের দলভুক্ত হয়ে আছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তারা এসব কথা কোন্ উপায়ে জানতে পারলো ? আপনি যদি মুফতী সাহেবের গ্রন্থটি মনোযোগ দিয়ে পড়তেন তাহলে আপনাকে আমার কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হতো না। বরং মৌলভী সাহেবদের কাছ থেকে শোনা কথা যে মিথ্যা ও বানোয়াট তা আপনি নিজেই বুঝতে পারতেন। মুফতী সাহেবের গ্রন্থটিতে আমার সত্যায়নের প্রয়োজন আদৌ ছিলো না। একথাও আপনি জ্ঞাত হতে পারতেন। মুফতী সাহেব আমার কোনো বাক্যের ব্যাখ্যা ও নিজের পক্ষ থেকে করেননি। প্রত্যেকে ব্যাখ্যায় তিনি আমারই অপরাপর বাক্যাবলী এবং এসব বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা প্রমাণ করেছেন। এবং সেসব বাক্য পুরোপুরি বর্ণনা করেছেন যাদ্বারা আমার আসল উদ্দেশ্য স্বতঃই আয়নার মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে। এ প্রমাণ ও দলীলের পর আমার সত্যায়নের প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র দু' ধরনের লোকই অনুভব করতে পারে। এক, যারা কোনো জ্ঞানগর্ভ আলোচনা বুঝতে অক্ষম। দুই, যারা সুস্পষ্ট দলীল-প্রামণ দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরেও সত্য কথা মানতে চায় না এবং ফিতনা সৃষ্টির বাহানা খুঁজে বেড়ায়। যদি গ্রন্থখানা আমার কাছে গ্রহণীয় হতো তাহলে গ্রন্থখানা সম্পর্কে আমি প্রশংসাপত্র লিখছি না কেন ? একথটি মৌলভী সাহেবদের জঘন্য মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ বৈকি ! তাদেরকে বলে দিন, নিজের সমর্থন ও প্রশংসা করিয়ে গ্রন্থ লেখানো এবং নিজেই আবার প্রশংসা পত্র লেখা ছোট লোকদের কাজ। আমি কখনো মুফতী সাহেব কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে আমাকে সমর্থন করে কোনো বই লেখার আশা করিনি। মুফতী সাহেব নিজেই তার দায়িত্ববোধ ও সত্য প্রীতির দ্বিবিধ আকর্ষণে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমি মনে করি, তাঁর কথা যদি দলীল-প্রমাণের নিরিখে মূল্যবান হয় তাহলে তা স্বতঃই শিক্ষিত মহলে নিজস্ব প্রভাব সৃষ্টি করবে। আমার প্রশংসা পত্রের প্রয়োজন হবে না।

আসল ব্যাপার হলো মুফতী সাহেবের এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর সেইসব ভদ্র লোকদের সততা সন্দেহ যুক্ত হয়ে পড়েছে যারা জেনে বুঝে আমার কথা বিকৃত করতে এবং জোর করেই তাতে কুফরী, নাস্তিকতা ও গোমরাহীর অর্থ প্রবিষ্ট করতে ব্যস্ত আছেন। আমি কখনো তাদের এ বাড়াবাড়ির পরোয়া করিনি। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিথ্যার বেসাতি বেশীদিন চলতে পারে না এবং আল্লাহ তায়ালা একদিন তাদের এ মুখোশ অবশ্যই খুলে দেবেন। এবার

www.pathagar.com

যখন তাদেরই মধ্যকার একজন ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যানুরাগী ব্যক্তির দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন তখন তারা রাগে রোষে এবং হিংসা ও আক্রোশে ফুসছে অথচ তাদের এ শেষ তৎপরতা ও তাদেরকে আরো বেশী অপদস্ত করবে। ধরে নিলাম যদি মুফতী সাহেবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে আমার পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন অনুমোদন কিংবা বিরোধিতা কিছুই না থাকে এবং মুফতী সাহেবও আমার বক্তব্যসমূহ দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার পরিবর্তে তার নিজের পক্ষ থেকেই আমার কথার এমন বিশদ ব্যাখ্যা পেশ না করে যা বিরোধিদের পক্ষ থেকে আমার ওপর আরোপিত অভিযোগের অপনোদন হয়ে যায়, তাহলে শরীয়াতের কোন্ বিধানের আলোকে একজন বিবেকবান মানুষ এ নীতি গ্রহণ করতে পারে যে, একজন মুসলমানের বক্তব্যের ভালো-মন্দ দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে সম্ভব যেটি দ্বারা সে অভিযুক্ত হতে পারে, কেবল সেই ব্যাখ্যাটিই গ্রহণ করবে এবং যেটি দ্বারা সে অভিযোগ মুক্ত হয় সেই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। বরং পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকবে। তার এ মানসিকতাই প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ মুসলমানদের সাথে মতপার্থক্য করে না। বরং হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তার বিরোধিতা করে আর এ ধরনের আচরণকেই হাদীসে هى الحالقة বলে অভিহিত করা হয়েছে।-(তরজুমানুল কুরআন, জানুয়ারি, ১৯৬৮)

মুহতারাম মাওলানাকে অপর একটি প্রশ্ন করা হয়েছিলো

প্রশ্ন

"আপনি তাফহীমাতের দ্বিতীয় খণ্ডে দাউদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইসমতে আম্বিয়া সম্পর্কে যাকিছু লিখেছেন তাকে কেন্দ্র করে আলেমদের একটি দল দীর্ঘদিন যাবত আপনাকে ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী বলে চিত্রিত করে আসছে। মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থটিতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার দরুন সমস্ত অভিযোগের খণ্ডন হয়ে যায়। কিন্তু এ গ্রন্থ প্রকাশের এর একটি দীনি মাদ্রাসার শাইখুল হাদীস এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পুনরায় এ অভিযোগ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"এসব বাক্যে এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সন্দেহ-সংশয় অবশিষ্ট আছে যার ভিত্তিতে মাওলানা মওদূদী সাহেব একজন সঠিক মুসলমান এবং রসূলের খাঁটি প্রেমিকের দৃষ্টিতে অভদ্রতার দোষে দোষী এবং ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার বন্ধন থেকে মুক্ত বলে মনে হবে। তারপর তিনি বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

"মাওলানা মওদূদী সাহেবের এ বাক্যের ব্যাখ্যা এভাবে করা জরুরী যে, ইসমত ও হিফাজতের অর্থ হলো কুফর, মিথ্যা সমস্ত কবীরা ও সগীরা গোনাহ এবং নীচু কাজ থেকে পাক-পবিত্র থাকা এবং লগজিশ শব্দটি সাধারণভাবে বিচ্যুতি অর্থে ব্যবহার করা অর্থাৎ কুফরী, মিথ্যা এবং কবীরা ও সগীরা গোনাহ ও নীচু কাজ করার মত লগজিশ বা পদস্খলন নবীদের দ্বারা হতে পারে।"

তারপর তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে ঃ

"হিফাজত উঠিয়ে নেয়ার পর সেইসব কাজ সংঘটিত হবে যা হিফাজত থাকা অবস্থায় সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিলো না। অতএব, ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত হবে তাহলো, মাওলানা মওদূদীর মতে আদম আলাইহিস সালাম থেকে শেষ নবী আলাইহিমুস সালাম পর্যন্ত যতো নবীর আগমন ঘটেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ সমস্ত নবী থেকে আল্লাহ তায়ালা কোনো না কোনো সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আপন হিফাজত উঠিয়ে নিয়ে দু' একটি কবীরা গোনাহ হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। এ সময়ে একটি দু'টি কিংবা দু'শ গোনাহ যাই হয়ে থাক না কেন তিনি আর মাসুম নন। এবং গোনাহ সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে তিনি আর নবুয়াতের গুণেও গুণান্বিত থাকবেন না। কেননা, নবুয়াত ও কবীরা গোনাহ করা এক সাথে থাকতে পারে না। এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জবাব যদি আপনি নিজে দেন তাহলে আশা করি অভিযোগকারীদের যুক্তি-প্রমাণ ধোপে টিকবে না।

মরহুম মাওলানা এ প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব এভাবে দিয়েছেন ঃ

জবাব

[আবুল আলা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির পক্ষ থেকে]

এ বিষয়টির ব্যাখ্যা হলো ঃ আমার যে বাক্যের যে অংশ দ্বারা অভিযোগকারীগণ আমাকে ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী রূপে অভিহিত করেছেন তা এমন কোনো বিষয়ের অংশ ছিলো না যার মধ্যে ইসমতে আম্বিয়ার প্রসংগ নিয়ে ব্যাপক মৌলিক আলোচনা করা হয়েছে বরং তা সূরা সোয়াদের হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কাহিনী সম্বলিত আয়াতসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রসংগক্রমে আনুসংগিকভাবে লেখা হয়েছিলো। এখানে সম্ভাব্য একটি উহ্য প্রশ্নের আমি জবাব দিয়েছি। প্রশ্নটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটি সৃষ্টি হয় এভাবে কুরআন মজীদের কয়েকটি জায়গায় নবীগণ কর্তৃক এমন কিছু কাজ সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে যার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের ভর্ৎসনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ হযরত আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

এক ঃ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন ঃ

দুই ঃ اِنِّىْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

তিন ঃ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

চার ঃ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ

পাঁচ ঃ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ

অনুরূপ আমাদের নবী আলাইহিস সালাম সম্পর্কেও কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

ছয় ঃ مَاكَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى

সাত ঃ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ

আট ঃ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ

নয় ঃ عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى

এ সমস্ত জায়গায় কুরআনের শব্দাবলী ও বর্ণনা ভংগী থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, নবীর দ্বারা এমন কোনো কাজ সংঘটিত হয়েছে যা আল্লাহ পসন্দ করেন না। অপসন্দের প্রকাশ ঘটিয়ে নবীকে সাবধান করে তাঁকে সংশোধন করা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো, ইসমতে আম্বিয়ার সাথে এ বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় কিভাবে ? আমরা কি বুঝবো যে, নবী কর্তৃক এরূপ কাজ সংঘটিত হবে তা আল্লাহ তায়ালা জানতেন না, বরং কাজটি সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তা জানতে পারলেন এবং তখন তিনি নবীকে সাবধান করে দিলেন ? মায়াজাল্লাহ ! যদি একথাই মানতে হয় তাহলে অভিযোগ নবুয়াতের গণ্ডি ছাড়িয়ে আল্লাহর ইলমের গণ্ডি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যদি বলা হয় যে, কাজটি সংঘটিত হওয়ার আগেই আল্লাহ তা জানতেন তাহলে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তবে আল্লাহ তায়ালা প্রথমেই কেন তাদেরকে বিরত রাখেননি ? এর মধ্যে এমন কি যুক্তি ও কল্যাণ নিহিত ছিলো যে, প্রথমেই কাজটি সংঘটিত হতে দিলেন এবং পরে এ কাজের ত্রুটি উল্লেখ করে শুধু সংশোধনই করলেন না

www.pathagar.com

বরং সে ত্রুটির উল্লেখও এমন একটি কিতাবে করলেন যা কিয়ামত পর্যন্ত মু'মিন ও কাফের সকলেই পড়তে থাকবে। কুরআনের এসব জায়গায় এ প্রশ্নটিই দেখা দিতে পারে এটা ধরে নিয়ে আমি নিম্নলিখিত ভাষায় তার জবাব দিয়েছি ঃ

প্রকৃতপক্ষে ইসমত নবীদের ব্যক্তি সত্তার অপরিহার্য বিষয় নয় বরং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নবুয়াতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার উদ্দেশ্যে ভুল-ত্রুটি ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করেছেন। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালার হিফাজত যদি মুহূর্তের জন্যেও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সাধারণ লোকদের মতো তারাও ভুল-ত্রুটি করতেন এবং বিচ্যুত হতে পারেন। এটা একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবী থেকে কোনো না কোনো সময় ইচ্ছাকৃতভাবে হিফাজত উঠিয়ে নিয়ে তাদের দ্বারা দু' একটি ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হতে দিয়েছেন। যাতে লোকেরা তাদের আল্লাহ মনে না করে বসে বরং জানে যে, তারাও মানুষ, আল্লাহ নন।"

এখন লক্ষ্য করুন। সম্পূর্ণ লেখাটির পূর্বাপর সম্পর্ক একথাই বলছে যে, এখানে ইসমতে আম্বিয়া বিষয়ের ওপর সাধারণভাবে আলোচনা করা হচ্ছে না যে, নবীদের দ্বারা কোন্ ধরনের ভুল সংঘটিত হওয়া সম্ভব আর কোন্ ধরনের ভুল সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়, সে বিষয়ে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে এ প্রশ্ন দেখা দেবে। বরং আলোচিত হয়েছে শুধুমাত্র সেইসব পদস্খলন সম্পর্কে যেগুলো কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। আর এগুলো সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে নিছক এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, ইসমত হওয়া সত্ত্বেও এসব পদস্খলন অবশেষে কিভাবে সংঘটিত হওয়া সম্ভব হলো ? এগুলো সংঘটিত হওয়ার আগেই তাদের বাধা দেয়া হলো না কেন ? আবার সংঘটিত হওয়ার পর গোপনে তাদেরকে সাবধান করা যথেষ্ট মনে করা হলো না কেন ? কুরআনে এগুলোর উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হলো কি কারণে ?

কিন্তু অভিযোগকারীগণ প্রথম যুলুম করেছেন এই যে, তারা লেখাটিকে ইসমতে আম্বিয়া বিষয়ের ওপর একটি সাধারণ আলোচনা সাব্যস্ত করেছেন। অথচ এটা ছিলো একটি বিশেষ আলোচনা যা অপর একটি আলোচনার প্রসংগ বা সম্পূরক হিসেবে এসেছিলো। তারপর তারা দ্বিতীয় যুলুম করেছেন এভাবে যে, পদস্খলন হওয়ার সম্ভাবনাকে তারা সব ধরনের অপরাধ ও কবীরা গোনাহ এমন কি কুফরী পর্যন্ত টেনে নিয়েছেন। অথচ আমার লেখায় শুধুমাত্র সেইসব পদস্খলন আলোচিত হয়েছে যেগুলো কুরআনে উল্লেখ আছে। এর চেয়েও যে বড় যুলুম তারা করেছেন তাহলো—ইসমত উঠিয়ে নেয়াকে তারা সম্পূর্ণরূপে

www.pathagar.com

উঠিয়ে নেয়া ধরে নিয়ে, এ সন্দেহের সৃষ্টি করেছেন যে, যখন ইসমত উঠে যায় তখন কুফর, মিথ্যা এবং কবীরা ও সগীরা সব ধরনের অপরাধই সংঘটিত হতে পারে। অথচ একজন সাধারণ শিক্ষিত লোকও একথা বুঝতে সক্ষম যে, আমার বাক্যে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ পদস্খলনের সীমা পর্যন্ত হিফাজতে উঠিয়ে নেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সম্পূর্ণরূপে ইসমত উঠিয়ে নেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি। যেসব মহত ব্যক্তিদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে তর্ক ও দর্শনশাস্ত্র পড়ানোর কাজে তারা ইসমতের আংশিক ও সার্বিক রহিত করণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে সক্ষম নয়, তাদের বেলায় একথা মেনে নেয়া আমার জন্য খুবই কঠিন। সুতরাং এ ধারণা পোষণ করা আমার জন্য অন্যায় যে, তারা জেনে শুনে সজ্ঞানে এ খেলা দেখাচ্ছেন যাতে আমাকে কোনো না কোনো উপায়ে ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারীরূপে চিত্রিত করা সম্ভব হয়। আমার এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরও এসব ব্যক্তি তাদের বক্তব্য ও লেখায় এ অপবাদ আরোপের পুনরাবৃত্তি করতে থাকবেন যেমন বছরের পর বছর ধরে তারা করে আসছেন। এটা কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। প্রকৃত ব্যাপার কোনো ইলমী মতপার্থক্যে নয় বরং হিংসা ও জিঘাংসার, যার মধ্যে আল্লাহভীতি খুব কমই থাকে। আমার বহুবার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, যেসব অভিযোগের বিস্তারিত জবাব দিয়ে আমি তাদের যুক্তি খণ্ডন করেছি তারা সেই অভিযোগ-গুলো এমনভাবে পুনরায় আওড়াতে থাকে যেন সেগুলোর আদৌ কোনো জবাব দেয়া হয়নি। আপনি ইচ্ছা করলে ঐসব শায়খুল হাদীসদের জিজ্ঞেস করুন যে, কুরআনের যেসব আয়াত সম্পর্কে আমি একথা লিখেছি সেই আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন দেখা দেয় কিনা ? যার জবাব আমি একথা বলে দিয়েছি। আর যদি এসব প্রশ্ন দেখা দেয় তাহলে তিনি নিজে তার কি জবাব দিবেন ? আমার জবাব কোনো জ্ঞানীজনের বিচারে ভুল হলে তার কাছে এর যে সঠিক জবাব আছে তা বর্ণনা করা উচিত।-(তরজুমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি-১৯৬৮)

মুহতারাম মাওলানার এসব জবাব সম্পর্কে চিন্তা করলে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, প্রথম জবাবে মুহতারাম মাওলানা ইলমী জায়েজায় তাফহীমাতের বাক্যের যে ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। এর দ্বারা সমালোচক বুযর্গদের সেসব অভিযোগের ও অপবাদের জবাব হয়ে গেছে যা আমার বা আমার গ্রন্থ সম্পর্কে আরোপ করা হয়েছিলো। এতে বলা হয়েছিলো, এ গ্রন্থখানা শিক্ষিত মহলে এ কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যে, এতে তাফহীমাতের বাক্যের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে মাওলানা মওদূদী সে ব্যাখ্যার সত্যায়ন বা সমর্থন করেননি। দ্বিতীয় জবাবে মুহতারাম মাওলানা নিজেই তাফহীমাতের বাক্য দ্বারা আপন উদ্দেশ্য এমনভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে,

www.pathagar.com

একদিকে ইলমী জায়েজায় এ বাক্যের যে ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে তার সত্যায়ন হয়েছে। অপরদিকে, সমালোচক বুযর্গ নিজের পক্ষ থেকে তাফহীমাতের বাক্যের যে ব্যাখ্যা পেশ করে মাওলানাকে অশিষ্ট, নাস্তিক ও ইসমতে আম্বিয়ার অস্বীকারকারী ইত্যাকার অপবাদ দিয়েছিলেন তা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। এভাবে চিরদিনের জন্য এ ধরনের অপবাদের মূলোৎপাটন হয়ে গেছে। এরপরও যদি এ ধরনের অভিযোগ ও অপবাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে তার ফায়সালার জন্য আমরা সেই আদালাত প্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষা করবো যা এ ধরনের বিষয়াদির ফায়সালা করার জন্য অবশ্যই কায়েম হবে।

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِيْمَا كُنَّا فِيْهِ مُخْتَلِفِيْنَ

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়্যারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

www.pathagar.com